182.9b.891.2 V.9
~~182.Qb.891.10.9~~

জন্মভূমি।

নবম ভাগ—নবম বর্ষ।

(১৩০৭ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩০৮ সালের আষাঢ় মাস
পর্য্যন্ত দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।)

Incomplete

কলিকাতা,—৩৯ নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
"জন্মভূমি কার্য্যালয়" হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(5)

কলিকাতা ;
৩৩৬ নং অপার চিৎপুর রোড, 'চৈতন্যপ্রেসে'
শ্রীনীলমণি ধর দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩০৮ সাল।

বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।] ৮ [ডাকমাশুল ।৵০ ছয় আনা। ৯

IMPERIAL LIBRARY

সূচীপত্র।

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক।
১।	অতৃপ্তি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী কবিরত্ন	১৮৭
২।	অনুপমা (গল্প)	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,	১৩৭
৩।	আঁধার মাণিক (কবিতা)	„ শ্রীশচন্দ্র দে	১৫৯
*৪।	আর্য্য-জাতির পশু চিকিৎসা	ব্রজবল্লভ কাব্য তীর্থ কাব্যকণ্ঠ বিশারদ	২১৭
৫।	আরতি (কবিতা)	„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮৭
৬।	আয়ুর্ব্বেদে দোষত্রয়	„ অঘোরনাথ শাস্ত্রী	২৯১
৭।	উমা (সমালোচনা)	„ যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ,	৩৪৫, ৩৬৬
৮।	এ নহে সান্ত্বনা (কবিতা)	„ বিহারীলাল রায় বি, এ,	১৫১
৯।	কবিকেশরী	„ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	১৩৩, ১৮৪, ২৭৫, ৩৩৪, ৩৭৩
১০।	কপালের মণি (কবিতা)	„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২৮
১১।	কাদম্বিনী (গল্প)	„ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩৫৬
১২।	কাল ও আজ (কবিতা)	„ কালিদাস চক্রবর্ত্তী	১৫০
১৩।	কালিন্দী (গল্প)	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,	৭০
১৪।	কিম্ভূত-কিমাকার (নক্সা)	„ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	৫৩, ২৫০
১৫।	কোন কাজ নাই (কবিতা)	„ দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী বি-এ,	১২৩
১৬।	গীত	„ সুরেশচন্দ্র সরকার এম-এ,	১২৩
১৭।	গীত	„ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ,	৩৫১
১৮।	গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ	„ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১১২, ১৪৪
১৯।	গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	২০২, ২৬০, ২৯৬,
২০।	চিতোর	„ রাজকৃষ্ণ পাল	১১৫
২১।	চিন্তা (কবিতা)	„ ভুবনকৃষ্ণ মিত্র	১২৫
২২।	ছায়াসতী (উপন্যাস)	„ মনুজেন্দ্র দত্ত বি, এ,	৩৯, ১২১, ১৪৮, ২১৫, ২৮৩, ৩২৬

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক।
২৩।	জননী	শ্রীযুক্ত সম্পাদক	৩১
২৪।	টাকা (কবিতা)	„ ভুবনকৃষ্ণ মিত্র	২২০
২৫।	ত্রিত্ব—দেবত্বে ও কবিত্বে	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	৪২
২৬।	তুমি (কবিতা)	„ কালিদাস চক্রবর্ত্তী	২২৩
২৭।	তুমি কি ?	„ দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী বি-এ,	৩২
২৮।	তোতাপাখি (গল্প)	„ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৬৭
২৯।	দীনের দুর্গোৎসব	„ জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ	৯০
৩০।	দুঃখ	„ পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়রি-এ,	২৬
৩১।	দোপাটী (গল্প)	„ ঐ	৩১০, ৩২৩
৩২।	নভেলের নায়িকা	„ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩৪২
৩৩।	নরকদর্শন (গল্প)	„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত	২৪৩
৩৪।	নিধিরামের দুর্গোৎসব	„ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮১
৩৫।	পার্ব্বত্যপদাবলী	„ কালিদাস নাথ	৭৭
৩৬।	প্রস্তাবনা	সম্পাদক	১
৩৭।	ফুলকুমারী (গল্প)	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যো বি-এ,	১০০
৩৮।	বর্ষা (কবিতা)	„ কালিদাস চক্রবর্ত্তী	১১
৩৯।	বসন্ত এবং প্লেগের গো বসন্ত-বীজের টীকার উপকারীতা	হেমচন্দ্র সেন এম, ডি,	২৪৬
৪০।	বসন্ত-বাহার (কবিতা)	„ কালীপদ মুখো বি, এ,	৩০২
৪১।	ব্রহ্মোপাসনা কি ?	„ জয়চন্দ্রসিদ্ধান্ত ভূষণ	২২
৪২।	বাঙ্গালাভাষার লেখক	„ হারাণচন্দ্র রক্ষিত ৬০, ৮৮, ১১৯, ১৮১, ২১২, ২৮১, ৩৩৫, ৩৭৬	
৪৩।	বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের ইতিহাস	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ৬৫, ১০৭	
৪৪।	বিক্রয় কাহাকে বলে ?	সম্পাদক	২৮৯
৪৫।	বিজয়া	„ কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম,এ,৯	
৪৬।	বেলুনে যুদ্ধ	„ জলধর সেন ১৭, ৩৩৯	
৪৭।	ভক্তি	„ ক্ষীরোদকুমার দত্তএম-বি,২৫৭	
৪৮।	ভট্ট মোক্ষমুলর	„ অঘোরনাথ শাস্ত্রী	১৫২
৪৯।	ভারত সাররত্ন	„ জয়চন্দ্রসিদ্ধান্ত ভূষণ	৩২১

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক।
৫০।	ভাল কিলো বাসিতে জাননা ?	শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখো বি-এ,	৮
৫১।	ভিক্টোরিয়া জীবনী-প্রসঙ্গ	„ যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ,	২২৫
৫২।	মধুকান	„ কালীপদ মুখো বি-এ,	১৬৬
৫৩।	মনোরমা (গল্প)	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যো বি, এ,	১৭২
৫৪।	মহাম্মদ্ গজনবী	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	১৬১
৫৫।	মুক্তি	„ নীলকান্ত গোস্বামী	১২৯,১৯৮
৫৬।	মৃত্যু (কবিতা)	„ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ,	২৬৫
৫৭।	মেডিকেল কলেজ	„ অঘোরনাথ শাস্ত্রী	৩৩১
৫৮।	৺রজনীকান্ত গুপ্ত	„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১২
৫৯।	শকুন্তলা	„ দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়	২০৯, ৩২৯, ৩৬২,
৬০।	শরৎ (কবিতা)	„ কালিদাস চক্রবর্ত্তী	১২৭
৬১।	সমালোচনা	সম্পাদক	১২৭, ১৬০, ১৯২, ২৮৭, ৩৫৩,
৬২।	"সরস্বতী" স্রোতস্বতী	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	৩৫৩
৬৩।	সংযম	„ ঐ ঐ	২
৬৪।	সুর (কবিতা)	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী	১৮৩
৬৫।	হায় মা ভিক্টোরিয়া	শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৯৩
৬৬।	হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যো বি, এ,	১৩৩
৬৭।	হৃদয়োচ্ছ্বাস—শোক	„ কৃষ্ণগোপাল ভক্ত	৩৭২
৬৮।	হোলী (কবিতা)	„ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১১৬

সূচীপত্র সমাপ্ত।

182.9b.891.2 V.9

~~182.9b.891.10.9~~

জন্মভূমি।

নবম ভাগ—নবম বর্ষ।

(১৩০৭ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩০৮ সালের আষাঢ় মাস
পর্য্যন্ত দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।)

কলিকাতা,—৩৯ নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
"জন্মভূমি কার্য্যালয়" হইতে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা;

৩৩৬ নং অপার চিৎপুর রোড, 'চৈতন্যপ্রেসে'
শ্রীনীলমণি ধর দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩০৮ সাল।

বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।] [ডাকমাশুল ।৵০ ছয় আনা।

IMPERIAL LIBRARY

সূচীপত্র।

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক।
১।	অতৃপ্তি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী কবিরত্ন	১৮৭
২।	অনুপমা (গল্প)	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,	১৩৭
৩।	আঁধার মাণিক (কবিতা)	„ শ্রীশচন্দ্র দে	১৫৯
*৪।	আর্য্য-জাতির পশু চিকিৎসা	ব্রজবল্লভ কাব্য তীর্থ কাব্যকণ্ঠ বিশারদ	২১৭
৫।	আরতি (কবিতা)	„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮৭
৬।	আয়ুর্ব্বেদে দোষত্রয়	„ অঘোরনাথ শাস্ত্রী	২৯১
৭।	উমা (সমালোচনা)	„ যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ,	৩৪৫, ৩৬৬
৮।	এ নহে সান্ত্বনা (কবিতা)	„ বিহারীলাল রায় বি, এ,	১৫১
৯।	কবিকেশরী	„ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	১৩৩, ১৮৪, ২৭৫, ৩৩৪, ৩৭৩
১০।	কপালের মণি (কবিতা)	„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২৮
১১।	কাদম্বিনী (গল্প)	„ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩৫৬
১২।	কাল ও আজ (কবিতা)	„ কালিদাস চক্রবর্ত্তী	১৫০
১৩।	কালিন্দী (গল্প)	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,	৭০
১৪।	কিম্ভূত-কিমাকার (নক্সা)	„ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	৫৩, ২৫০
১৫।	কোন কাজ নাই (কবিতা)	„ দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী বি-এ,	১২৩
১৬।	গীত	„ সুরেশচন্দ্র সরকার এম-এ,	১২৩
১৭।	গীত	„ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ,	৩৫১
১৮।	গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ	„ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১১২, ১৪৪
১৯।	গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	২০২, ২৬০, ২৯৬,
২০।	চিতোর	„ রাজকৃষ্ণ পাল	১১৫
২১।	চিন্তা (কবিতা)	„ ভুবনকৃষ্ণ মিত্র	১২৫
২২।	ছায়াসতী (উপন্যাস)	„ মনুজেন্দ্র দত্ত বি, এ,	৩৯, ১২১, ১৪৮, ২১৫, ২৮৩, ৩২৬

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক।
২৩।	জননী	শ্রীযুক্ত সম্পাদক	৩১
২৪।	টাকা (কবিতা)	„ ভুবনকৃষ্ণ মিত্র	২২০
২৫।	ত্রিত্ব—দেবত্বে ও কবিত্বে	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	৪২
২৬।	তুমি (কবিতা)	„ কালিদাস চক্রবর্ত্তী	২২৩
২৭।	তুমি কি ?	„ দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী বি-এ,	৩২
২৮।	তোতাপাখি (গল্প)	„ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৬৭
২৯।	দীনের দুর্গোৎসব	„ জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ	৯০
৩০।	দুঃখ	„ পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়রি-এ,	২৬
৩১।	দোপাটী (গল্প)	„ ঐ	৩১০, ৩২৩
৩২।	নভেলের নায়িকা	„ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩৪২
৩৩।	নরকদর্শন (গল্প)	„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত	২৪৩
৩৪।	নিধিরামের দুর্গোৎসব	„ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮১
৩৫।	পার্ব্বত্যপদাবলী	„ কালিদাস নাথ	৭৭
৩৬।	প্রস্তাবনা	সম্পাদক	১
৩৭।	ফুলকুমারী (গল্প)	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যো বি-এ,	১০০
৩৮।	বর্ষা (কবিতা)	„ কালিদাস চক্রবর্ত্তী	১১
৩৯।	বসন্ত এবং প্লেগের গো বসন্ত-বীজের টীকার উপকারীতা	হেমচন্দ্র সেন এম, ডি,	২৪৬
৪০।	বসন্ত-বাহার (কবিতা)	„ কালীপদ মুখো বি, এ,	৩০২
৪১।	ব্রহ্মোপাসনা কি ?	„ জয়চন্দ্রসিদ্ধান্ত ভূষণ	২২
৪২।	বাঙ্গালাভাষার লেখক	„ হারাণচন্দ্র রক্ষিত ৬০, ৮৮, ১১৯, ১৮১, ২১২, ২৮১, ৩৩৫, ৩৭৬	
৪৩।	বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের ইতিহাস	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ৬৫, ১০৭	
৪৪।	বিক্রয় কাহাকে বলে ?	সম্পাদক	২৮৯
৪৫।	বিজয়া	„ কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম,এ,৯	
৪৬।	বেলুনে যুদ্ধ	„ জলধর সেন ১৭, ৩৩৯	
৪৭।	ভক্তি	„ ক্ষীরোদকুমার দত্তএম-বি,২৫৭	
৪৮।	ভট্ট মোক্ষমুলর	„ অঘোরনাথ শাস্ত্রী	১৫২
৪৯।	ভারত সাররত্ন	„ জয়চন্দ্রসিদ্ধান্ত ভূষণ	৩২১

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক।
৫০।	ভাল কিলো বাসিতে জাননা ?	শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখো বি-এ,	৮
৫১।	ভিক্টোরিয়া জীবনী-প্রসঙ্গ	„ যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ,	২২৫
৫২।	মধুকান	„ কালীপদ মুখো বি-এ,	১৬৬
৫৩।	মনোরমা (গল্প)	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যো বি, এ,	১৭২
৫৪।	মহাম্মদ্ গজনবী	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	১৬১
৫৫।	মুক্তি	„ নীলকান্ত গোস্বামী	১২৯,১৯৮
৫৬।	মৃত্যু (কবিতা)	„ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ,	২৬৫
৫৭।	মেডিকেল কলেজ	„ অঘোরনাথ শাস্ত্রী	৩৩১
৫৮।	৺রজনীকান্ত গুপ্ত	„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১২
৫৯।	শকুন্তলা	„ দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়	২০৯, ৩২৯, ৩৬২,
৬০।	শরৎ (কবিতা)	„ কালিদাস চক্রবর্ত্তী	১২৭
৬১।	সমালোচনা	সম্পাদক	১২৭, ১৬০, ১৯২, ২৮৭, ৩৫৩,
৬২।	"সরস্বতী" স্রোতস্বতী	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	৩৫৩
৬৩।	সংযম	„ ঐ ঐ	২
৬৪।	সুর (কবিতা)	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী	১৮৩
৬৫।	হায় মা ভিক্টোরিয়া	শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৯৩
৬৬।	হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যো বি, এ,	১৩৩
৬৭।	হৃদয়োচ্ছ্বাস—শোক	„ কৃষ্ণগোপাল ভক্ত	৩৭২
৬৮।	হোলী (কবিতা)	„ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১১৬

সূচীপত্র সমাপ্ত।

182·৭৮ ৪৭১·2
v.9.
L 230.
9
R. 202
3291
BENGAL LIBRARY 20 SEP ... BUILDINGS

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা।)

নবম বর্ষ। } শ্রাবণ, ১৩০৭ সাল। { প্রথম সংখ্যা।

প্রস্তাবনা।

"মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে, পরমানন্দ মাধব॥"

যাঁহার কৃপায় অন্ধের চক্ষুঃ ফোটে—মূক, বাচাল হয়,—পঙ্গু, গিরি লঙ্ঘন করে,—সেই অপার করুণাময় পরমেশ্বরের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া আমরা "জননী-জন্মভূমির" সেবায় নিযুক্ত হইতেছি। সর্ব্বমঙ্গলা, আমাদিগের মঙ্গল করুন।

"জন্মভূমির" নূতন পরিচয় দেওয়া আর দীপালোকে সূর্য্যদর্শন করা, একই কথা। সেই কারণে "জন্মভূমির" সম্বন্ধে কোন নূতন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, বলিয়া মনে করি। যে উদ্দেশ্যে ও কার্য্যসাধনে প্রণোদিত হইয়া "জন্মভূমি" বিগত ১২৯৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্যেই কার্য্যক্ষেত্রে এই সুদীর্ঘ ৮ (আট) বৎসরকাল অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে,—এ গৌরব ব্যক্তিগত নহে, এ গৌরব, সমগ্র বাঙ্গালীর স্বজাতীয় গৌরব। বিশেষতঃ জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে বিবিধ রত্ন সঞ্চয় করিয়া "জন্মভূমি" আরও বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে "জন্মভূমি" কাহার বিরাগভাজন হয় নাই! "জন্মভূমি" কাহারও প্রতিদ্বন্দ্বিনী নহে। তথাপি বাঙ্গালীর চিরদিনের নিমিত্ত অপর জাতি সাধারণের নিকট এই একটী কলঙ্ক আছে যে, যাহা আমরা আরম্ভ করি, তাহা আর শেষ করিতে পারি না। এই কলঙ্ক অপনোদনের জন্যই

আমরা নবানুরাগে নূতন উৎসাহে, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী", সতত এই মহানীতির অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মপথে বিচরণ করা "জন্মভূমির" জীবনের একমাত্র ব্রত, তাহা যাহাতে অবিকৃতরূপে রাখিতে পারি, সেই বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া জগজ্জননীর শ্রীচরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক নব-বর্ষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

সংযম।

ধর্ম্ম-সাধনই, "ভক্ত-জীবনের" প্রাণ। ধার্ম্মিক হইতে হইলে—ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হওয়ার আবশ্যকতা হইলে—'সংযম' প্রয়োজনীয়। সেই "সংযম" যেমন সংখ্যায় সম্যক্ অধিক, তাহার অন্তিমও, তেমনই বা তদপেক্ষাও মনোরম। আহার, বিহার, ভ্রমণ, কথোপকথন, পান, ভোজন—সর্ব্বত্রই "সংযমের" প্রয়োজন। ভক্ষ্য-পেয়-বিষয়ের সংযমে, খাদ্যাখাদ্য-বিচারের বিশেষ দরকার। সেই কারণেই, এখানে উহার অবতারণা।

বিশেষ বিশেষ তিথিতে, বিশেষ বিশেষ খাদ্য, কেন নিষিদ্ধ, এইখানে তাহারই আলোচনা হইতেছে।

যজমানকে এবং তাঁহার প্রতিনিধি-স্বরূপ কৌলিক-পুরোহিতকে* জীবনের প্রথম ভাগে—অভাবতঃ, দ্বিতীয় ভাগেও—খাদ্যাখাদ্যের প্রতি, প্রতি-পদ-ক্ষেপেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

"কুষ্মাণ্ড-বৃহতীঞ্চৈব পটোলং মূলকং তথা।
শ্রীফলং নিম্বপত্রঞ্চ তালঞ্চাপি তথা শিবং॥
অলাবু-নালিকাঞ্চৈব শিম্বিকাং পূতিকাং তথা।
তিলান্ মাষঞ্চ মাংসঞ্চ প্রতিপদাদিষু বর্জ্জয়েৎ॥"

ইহার বিশদ ব্যাখ্যা, নিম্নে সহজ প্রণালীতে প্রদত্ত হইল। যথা,—

১। প্রতিপদে—'কুষ্মাণ্ড'।

২। দ্বিতীয়ায়—'বৃহতী'।

---

* "অগ্নি" দেবতা, যেমন দেবগণের পুরোহিত এবং প্রতিনিধি-স্থানীয়—কুলপুরোহিতও, গৃহস্থের তদ্রূপ প্রতিনিধি-স্থানীয়।

৩। তৃতীয়ায়—'পটোল'।

৪। চতুর্থীতে—'মূলা'।

৫। পঞ্চমীতে—'শ্রীফল'।

৬। ষষ্ঠীতে——'নিম্ব'।

৭। সপ্তমীতে—'তাল'।

৮। অষ্টমীতে—'শিব' (নারিকেল)।

৯। নবমীতে—'অলাবু' (লাউ)।

১০। দশমীতে—'নালিকা' (কলম্বী শাক)।

১১। একাদশীতে—'শিম্বী' (সিম)।

১২। দ্বাদশীতে—'পূতিকা' (পুঁই)।

১৩। ত্রয়োদশীতে—'বার্ত্তাকু'।

১৪। চতুর্দ্দশীতে—'মাষ-কলাই'।

১৫। { পূর্ণিমায় / অমাবস্যায় }—'মাংস' এবং 'তৈল'।

কয়েকটী প্রচলিত শব্দের অর্থ, পশ্চাৎ নিবদ্ধ হইতেছে। যথা,—

ক। "বৃহতী"—অর্থে 'ছোট বেগুন'।

খ। "তাল" শব্দে—'শ্বেত তাল'।

গ। "নিম্ব" অর্থে—নিম্ব-পত্র ; কিন্তু উহার ত্বক্ বা মূল নয়।

উল্লিখিত তিথিতে উল্লিখিত দ্রব্য-ভোজন কেন ঋষিরা, নিবারণ করিয়াছেন,—কেবল কথায় নিষেধ নয়,—উহা ব্যবহার করিলে, কি কি দোষ ঘটে, স্মার্ত্ত গ্রন্থে ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থে, তাহারও সবিশেষ নিষেধাদেশ, অবলোকিত হয়। যথা,—

"কুষ্মাণ্ডে" চার্থহানিঃ স্যাৎ, "বৃহত্যাং" ন স্মরেদ্ধরিং।
বহুশত্রুঃ "পটোলঃ" স্যাৎ, ধনহানিস্তু "মূলকে" ॥ ১ ॥
কলঙ্কী জায়তে "বিল্বে", তির্য্যগ্‌যোনিশ্চ "নিম্বকে"।
"তালে" শরীরনাশঃ স্যাৎ, "নারিকেলে" চ মূর্খতা ॥ ২ ॥
"তুম্বী" গোমাংসতুল্যা স্যাৎ, "কলম্বী" গোবধান্তিকা।
"সিম্বী" পাপকরা প্রোক্তা, "পূতিকা" ব্রহ্মঘাতিকা ॥ ৩ ॥
"বার্ত্তাকৌ" সুতহানিঃ স্যাৎ, চিররোগী চ "মাসকে"।
মহাপাপকরং "মাংসং" প্রতিপদাদিষু বর্জ্জয়েৎ ॥ ৪ ॥"

ইহার অর্থ এই ;—

"প্রতিপদে অর্থহানি, কুষ্মাণ্ড-ভক্ষণে।
দ্বিতীয়ায় বৃহতীতে বিহীন ভোজনে ॥
শত্রুবৃদ্ধি পটোল খাইলে তৃতীয়ায়।
মূলাহারে চতুর্থীতে ধনহানি পায় ॥
পঞ্চমীতে শ্রীফলে কলঙ্ক অতিশয়।
ষষ্ঠীতে খাইলে নিম্ব, পশুযোনি হয় ॥
তালে শরীরের নাশ সপ্তমীর যোগে।
অষ্টমীতে মূর্খ হয়, নারিকেল-ভোগে ॥
অলাবু, গোমাংস-তুল্য নবমী-তিথিতে।
দশমীতে গোমাংস-সদৃশ কুলম্বীতে ॥
সিমে মহাপাপ, একাদশীর নিয়ম।
দ্বাদশীতে পুঁই-শাকে, ব্রহ্মহত্যা-সম ॥
ত্রয়োদশী-তিথিতে, বার্ত্তাকু যদি খায়।
সন্তানের হানি হয়, বিধানে জানায় ॥
চতুর্দ্দশী-তিথির দিবসে নরগণে।
চিররোগী হয়, মাষ-কলাই ভক্ষণে ॥
অমাবস্যা-পূর্ণিমায়, যদি খায় মাংস।
পূর্ণরূপে মহানামে প্রকাশে পাপাংশ ॥

পূর্ব্বোক্ত-রূপ নিষেধের তাৎপর্য্য কি ? নিষেধাজ্ঞা, প্রগাঢ় না হইলে, তাহা, ফলবতী হয় না বলিয়াই, ঐ ব্যবস্থা, ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিকল্পিত।

ফলতঃ, প্রতিপদে কুষ্মাণ্ডভোজন দোষাবহ ; দ্বিতীয়ায় বৃহতী ভক্ষণ করিতে নাই—ইত্যাদি-স্থলে নিষেধানুমতি, বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক মতের উপর নির্ভর করিতেছে। শ্রুতর্ষি চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিৎ চরক-মুনিও, ভক্ষ্য-পরিবর্ত্তন-কারিণী ব্যবস্থায় সায় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—অমুক অমুক দ্রব্য, সর্ব্বদা খাদ্যরূপে ব্যবহার করা অবিধেয়। যথা,—

"কূচ্চিকাংশ্চ কিলাটাংশ্চ, শৌকরং গব্যমামিষং।
মৎস্যান্ দধি চ মাষাংশ্চ যবকাংশ্চ ন শীলয়েৎ ॥"

—চরক, সূত্রস্থানং, ৫ম অধ্যায়।

ইহার বাঙ্গালায় অর্থ এইরূপ,—

ছানা, ঘনীভূত দুগ্ধ, শূকর মাংস, গো-মাংস, মৎস্য, দধি, মাষ-কলাই, কুলথ কলাই—এই সকল প্রতিনিয়ত ব্যবহার করা অ-বিধি।

এতদ্ব্যতীত অন্যরূপ খাদ্যও, সদাই বর্জ্জনীয়। চরক-মুনি, মাষ-কলাইকে অনিয়মিত ভক্ষ্যের অন্তর্গত করিয়াছেন। স্মৃতি-কর্ত্তারাও, শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়-পক্ষের চতুর্দ্দশীতেও, উহার ব্যবহার নিবারণ করিয়াছেন। সুতরাং, তাঁহাদের মতে মাস-মধ্যে দ্বি-বার, উহা অব্যবহার্য্য হইতেছে। অতএব মাষ-কলাই যে, নিয়মিত খাদ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে না, তাহা, চিকিৎসা-শাস্ত্রীয় ও স্মৃতিশাস্ত্রীয়—এই উভয় মতেই প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে।

হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্বের মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতে হইলে, বিধর্ম্মীরা, তাহাতে কৃতাবসর হইতে পারেন না। কেবল আহার কেন?—পরিচ্ছদ, চিত্তবৃত্তি, প্রকৃতিও হিন্দুর মত না হইলে, হিন্দুধর্ম্ম-মর্ম্মের মনোমত ফল পাইবার আশা কোথায়?

এখানে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া অসম্ভব নয় যে, স্মৃতিকারগণের নিষেধিত খাদ্য-দ্রব্য-গুলির তালিকা (মাষকলাই ভিন্ন), তো চরকীয় ঐ বচনে ধৃত হয় নাই! এই প্রশ্নের মীমাংসায় গুরুতর মস্তিষ্ক-সঞ্চালনের আবশ্যকতা কি? উভয় স্থলেই, একই যুক্তি, একই উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতেছে। প্রত্যহ এক প্রকার আহার্য্য গ্রহণে উপকার কোথায়? তাহাতে বরং অপকারেরই সম্পূর্ণ অস্তিত্ব। উহাতে চিত্তবিকার সংঘটন হওয়া সম্ভব। যাঁহারা মনস্তত্ত্ব-বিদ্যাধ্যায়ী, তাঁহারাই এই কথা বোঝেন। এস্থলে অনুধাবন করিলে প্রতীতি জন্মিবে, স্মৃতি-সংহিতার উদ্দেশ্যই এই যে, ভোজ্য-দ্রব্যের নিত্য-পরিবর্ত্তন, একান্তই আবশ্যক ও কর্ত্তব্য। যে মধু, এত সুমিষ্ট ও মুখরোচক,—নিত্য-ব্যবহারে তাহারও যেন স্বাদুতা কমিয়া যায়। ক্রমে তাহাতেও, অরুচি ও অপ্রবৃত্তি জন্মে। কিছু দিন উপর্য্যুপরি ক্ষীর-ভোজন বা দুগ্ধপান বন্ধ হইবার পরে পুনরায় পরবর্ত্তী কালে সেই দুগ্ধের কতই মিষ্টতা, কতই স্বাদুতা, কতই মনোহারিতা উপলব্ধি হয় ও তৎসঙ্গেই তাহাতে কি অপরূপ তৃপ্তি জন্মে! যাহাতে দেহের স্ফূর্ত্তি-বিধান না করে, তদ্ব্যবহারে ফলোদয় তো নাই; বরং আধি-সম্ভাবনা। না হয়, ব্যাধি-সংঘটনেরও কথা বটে। 'ব্যাধি' অর্থাৎ দৈহিক পীড়া। 'আধি' অর্থে মানসিক রোগ। ঐরূপ

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহামুনি চরক, যে যে পদার্থ, নিত্য আহারীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সহিত স্মার্ত্তগণের নিষেধানুজ্ঞায় মূলতঃ কোনই বৈলক্ষণ্য নাই।

"ষষ্টিকান্ শালি-মুদ্গাংশ্চ সৈন্ধবামলকে যবান্।
আন্তরীক্ষং পয়ঃ সর্পির্জাঙ্গলং মধু চাভ্যসেৎ॥"

—চরক, সূত্রস্থানং, ৫ম অধ্যায়।

উহার তাৎপর্য্যার্থ এই,—

ষষ্টি-ধান্য (ষেটি ধান্য), শালি-ধান্য, মুগ-কলাই, সৈন্ধব-লবণ, আমলকী-ফল, যব, আকাশ-নিপতিত নীর, ঘৃত, বন্য-মধু—এ গুলি নিয়ত ব্যবহার্য্য।

স্মৃতিকারেরা, সকল দিনেই একটা না একটা খাদ্যবস্তু নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি দেখ, ঐ নিয়মের সহিত চরকমুনির ব্যবস্থাপিত বিধির কোন বিরোধ-ঘটনাই হইল না। অতএব দৃষ্ট হইল—আয়ুর্ব্বেদে ও স্মৃতিতে নিষেধ-বিধি, পৃথক্ হইলেও, উহাদের মূলগত কোন পার্থক্যই নাই। উভয় শাস্ত্রমধ্যে কেমন সামঞ্জস্য! তদ্ভিন্ন এ ক্ষেত্রে আরও এক কথা বিবেচ্য। সে কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে। খাদ্যের সঙ্গে ধর্ম্ম-সাধনার উত্তম সম্বন্ধ, ঘনিষ্ট সংস্রব। সেই জন্যই হিন্দু-বিধবার পক্ষে একাদশীর উপবাস, নিরামিষাহার ও একসন্ধ্যা ভোজন ব্যবস্থা। আর, সধবা-বিধবারা বার-ব্রত-নিয়মের কঠোরতা-পালনে ব্যাকুল থাকেন। ইহাতে হিন্দুরমণীকে শনৈঃ শনৈঃ ধর্ম্মমার্গে প্রধাবিত করে।

কেবল বিধবা-সধবাদের বিষয়ই বা বলি কেন? কি পুরুষ, কি রমণী—সকলকেই শ্রাদ্ধাদির পূর্ব্বে সংযম করিতে হয়। নৈষ্ঠিক ক্রিয়াকর্ম্মের পূর্ব্ববাসরে হবিষ্য করা আবশ্যক। অভাবপক্ষে নিরামিষাহার, একাহার বা প্রাতঃস্নান করাও, একান্ত কর্ত্তব্য বটে।

স্মৃতির শাসনানুসারে প্রতিদিন এক একটী খাদ্য বর্জন করিতে করিতে, ক্রমে প্রিয়-বস্তুতে লোভাভাব ঘটে। রবিবারে মৎস্য-মাংসাহার নিষেধের মূলেও ঐ যুক্তি। রবিবারে কেবল মৎস্য-মাংসাহার পরিহার করা আবশ্যক নয়,—আমিষ বলিয়া পরিগণিত মসূরকলাই প্রভৃতিও ত্যাজ্য। মনে করুন, এক ব্যক্তি অতিরিক্ত পটোলপ্রিয়। একজন বা অত্যন্ত মীনাসক্ত। কেহ কেহ হয় তো আলুর প্রতি দয়ালু। উক্ত শ্রেণীর লোকেরা প্রথম প্রথম পটোল,

আদিষ্ট হইলে, বাধ্য হইয়া, দুই চারি বারেই পটোলাদি-পরিহারে তিনি অভ্যস্ত হন। কেবল অভ্যাস নয়, কিন্তু তত্তৎ দ্রব্যে লোভ খর্ব্ব হইবে। অধিক কি, ক্রমে ক্রমে লোভজনক মৎস্যে, মাংসে বা অপরাপর দ্রব্যেও, বিরতি হইয়া আসিলে, হিন্দুর আর কোন ক্লেশই বোধগম্য হয় না। ইহাতে অভ্যস্ত ও প্রস্তুত হইলেই, সাধনার পথ, পরিষ্কৃত হইয়া আসিবে। ভক্ষ্য-পেয়ের সহিত পুণ্যানুষ্ঠানের সম্পর্ক কি, যাঁহারা বলিবেন, তাঁহারা, এক-বার চিন্তা করিয়া দেখিবেন, ধর্ম্মশিক্ষায়—যোগাভ্যাসে—জগতের মধ্যে, ভারতই, চিরাগ্রসর কেন? হিন্দুজাতিই, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা এত দূর ধর্ম্মগত-জীবন কেন? অখাদ্য-ভক্ষণে এবং অপেয়-পানে বিরাগ হইলে, আর ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ থাকিলে, ভারতেতর দেশের এতাদৃশ দুর্দ্দশা ঘটিত কি? চিরজীবন যে ব্যক্তি মাংসাহারী, সে কখনই যোগীর দুর্লভ পদলাভে অধিকারী হয় না। তিথি-বিশেষে একটা দুইটা খাদ্য-বস্তুর পরিবর্জ্জনের প্রসঙ্গ কি বল? যিনি, দুই একটী করিয়া খাদ্য ত্যাগ করিয়া, প্রথমাবধি প্রস্তুত হইতে থাকেন, তিনিই ক্রমশঃ যোগী হইতে পারেন। অভ্যাসের গুণে যোগীকে যথাক্রমে সর্ব্ববিধ খাদ্যেই জলাঞ্জলি দিতে হয়। ভাবিয়া দেখুন, পাঠক! এককালের মহাভোগী কৃতাভ্যাস হইয়া, সর্ব্বত্যাগী যোগী দাঁড়াইলেন। পরিশেষে সর্ব্বত্যাগী যোগী বায়ুভোগীও হইলেন। এই কথাকে এখন আর আজগুবি গল্প বলিয়া, উড়াইয়া দিবার দিন নাই। সে কাল, অধুনা ভূতকালের গর্ভগত। ভূ-কৈলাসের যোগী, রঞ্জিৎ সিঙের দরবারে পরীক্ষিত সন্ন্যাসী হরিদাস সাধুর বর্ণনা, সাহেবেরাও নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিয়াছেন। অধিক আর কি কহিব? বেশী দিনের কথা নয়, সেদিন বর্দ্ধ-মানের রাজা প্রতাপচাঁদও স্বয়ং যোগশাস্ত্রের অদ্ভুত মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ও যোগের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করাইয়া, তাঁহার উকীল সাঁ সাহেবকেও স্তম্ভিত ও মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। উক্ত ইংরেজ, যোগপ্রভাব অস্বীকার করিতে না পারিয়া, নিজে তাহার কার্য্যকারিতা স্পষ্টই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ! খাদ্য-পরিবর্জ্জন ও খাদ্য-পরিবর্ত্তনের মহদভিপ্রায়ের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিলেন কি? সম্মুখে কি নিগূঢ়তম অসাধারণ অভিসন্ধি রাখিয়া, আমাদের মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন আর্য্য-পিতামহগণ, এই গুর্ব্বর্থ-কর উপদেশ বিধান করিয়া গিয়াছেন! ভাই বঙ্গবাসিগণ! আইস, এক একবার প্রগাঢ় মনোনিবেশ সহকারে, ভক্তিভাবে অনুধ্যান করিয়া দেখি

ও তাঁহাদের চরণাম্বুজরেণু বক্ষে ধারণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করি। তাঁহারা যাহা কিছু তাঁহাদের এই অকৃতী অধম সন্তানদের নিমিত্তে বিধান করিয়াছেন, ঐ সকলেরই মূলে জ্ঞান, যুক্তি, উপদেশ, সুশিক্ষা বর্ত্তমান। একবার মাত্র তন্ময়চিত্তে যদি আমরা তাঁহাদের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হই, তাহা হইলেই আমরা চিরশান্তির অধিকারী হইতে পারিব। আর, তাহা হইলেই ভারতে হিন্দুকুলে আমাদের জন্মগ্রহণ সার্থক হইবে। পঞ্জিকার নিষেধ বচন, কোন্ যুক্তির অনুমোদন করিল, পাঠক! এখন তাহা বুঝিলেন কি? ঐ নিষেধটী, কেমন শাস্ত্রসম্মত, স্মৃতি গ্রন্থের অনুগত ও অনুমোদিত, তাহাই দেখান গেল।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

ভাল কি লো বাসিতে জান না?

(১)

এত ভালবাসি তোমা
তুমি ত বাসিলে কই!
মুহূর্ত্তের অদর্শনে
মরমে মরিয়া রই!
না হেরিলে চাঁদমুখ
তিলেক না পাই সুখ,
এ সংসারে প্রিয়তমে!
জানি না যে তোমা বই।
এত ভালবাসি তোমা,
তুমি প্রিয়ে বাস কই?
তাইলো সুধাই তোমা বলনা বলনা,
ভাল কিলো বাসিতে জান না?

(২)

ঘুমায়ে স্বপন দেখি
মুখানি তো হাসি হাসি,
কুমুদে পড়েছে যেন
চাঁদিমা কিরণরাশি!
কি সুন্দর মরি মরি
সে রূপ হৃদয়ে ধরি,
মনে হয় নিরজনে
দেখিগে দিবস নিশি।
তুমি প্রিয়ে বাস কই,
আমি এত ভালবাসি,
তাইলো সুধাই তোমা বলনা বলনা,
ভাল কিলো বাসিতে জান না?

(৩)

তুমি ত ঘুমায়ে থাক
আমি ত জাগিয়ে রই;
সুষুপ্ত সুষমা হেরি
প্রাণে প্রাণহারা হই।

স্তিমিত কমল শোভা
নীলনেত্রে মনোলোভা
দেখিয়ে জীবনে প্রিয়ে
বাসনা মিটিল কই?
এত ভালবাসি তোমা
তুমি প্রিয়ে বাস কই?
তাই লো সুধাই তোমা বলনা বলনা,
ভাল কি লো বাসিতে জান না?

(৪)

ঘামিলে রবির করে
বসনে মুছাই মুখ,
হাঁটিলে চরণে ব্যথা
পাবে বলে পাতি বুক,
বিমনা হেরিলে পরে
চিতবিনোদন তরে
কতই ভাবিয়ে মরি
কিসে তব হবে সুখ।
এত ভালবাসি প্রিয়ে
তবু ত তুমি বিমুখ!
তাই লো সুধাই তোমা বলনা বলনা,
ভাল কি লো বাসিতে জান না?

(৫)

শারদ-গগন-পটে
যবে লো পূর্ণিমা শশী
উদিয়ে কিরণ ধারে
সিক্ত করে দশদিশি;
অমনি প্রেয়সি তোরে
ধরিয়ে হৃদয়'পরে,
অতুলিত সেই শোভা
হেরি গৃহতলে বসি।
তুমি ত বাস না ভাল
আমি এত ভালবাসি।
তাই লো সুধাই তোমা বলনা বলনা,
ভাল কি লো বাসিতে জান না?

(৬)

ফুলের প্রতিমা তুমি
ভালবাস ফুল তাই,
ফুলেতে সাজিতে ইচ্ছা
দেখিতে লো যদা পাই।
তাই ফুল তুলে এনে
গাঁথি মালা সযতনে,
গলায় দোলায়ে দিয়ে
অনিমিখে মুখ চাই।
এত ভালবাসি আমি
তোমা কি বাসিতে নাই?
তাই লো সুধাই তোমা বলনা বলনা,
ভাল কি লো বাসিতে জান না?

(৭)

কত ভালবাসি প্রিয়ে
কত বা কথায় কই,
হাইটী তুলিলে পরে
তুড়িতে ধরিয়া লই;
হাঁচিটী হাচিলে পর
ভীত ভীত এ অন্তর,
শতবার জীব বলি
তবুত শঙ্কিত রই।
এত ভালবাসি আমি
তুমি ত বাসিলে কই?
তাই লো সুধাই প্রিয়ে বলনা বলনা,
ভাল কি লো বাসিতে জান না?

(৮)

নবনীত জিনি প্রিয়ে
সুকুমার তব কায়,
দুগ্ধফেননিভ শয্যা
শয়নে কঠোর হায়!
তাই নব কিশলয়
কুসুমকলিকাচয়
মিশায়ে বিছায়ে পাতি
হৃদয়ে রাখি তোমায়।
আমি এত ভালবাসি
তুমি ত বাস না হায়!
তাই লো সুধাই প্রিয়ে বলনা বলনা,
ভাল কি লো বাসিতে জান না?

(৯)

বহে সুধাধারা প্রিয়ে
অধরে তোমার, হেরি
পিপাসায় ফাটে বুক,
চুমি তাই ধীরি ধীরি,
একটী চুম্বন প্রিয়ে
আদরে ফিরিয়ে দিয়ে
কখন তুষেছ কি না
তোমারে জিজ্ঞাসা করি!
এত ভালবাসি আমি
তোমাতে কিছু না হেরি;
তাই লো সুধাই প্রিয়ে বলনা বলনা,
ভাল কি লো বাসিতে জান না?

(১০)

ধরিয়ে মুখানি তোর
রাখিয়ে হৃদয়'পরে,
মনে হয় সুধা-হ্রদে
ডুবে থাকি চিরতরে।
তোমারে স্মরিয়ে প্রিয়ে
এখনও রয়েছি জীয়ে
জানি না ও নামে বুঝি
সঞ্জীবনী গুণ ধরে।
এত ভালবাসি তোমা
তুমি ত বাসনা মোরে;
তাই লো সুধাই প্রিয়ে বলনা বলনা,
ভাল কি লো বাসিতে জান না?

(১১)

দেখ প্রিয়ে চেয়ে দেখ
ভালবাসা বাসি কত,
প্রকৃতির পটে আঁকা
দেখিয়েও দেখনা ত।
সরসে কুমুদী ভাসে
প্রমোদিনী প্রেমোল্লাসে,
হেরি স্বীয় প্রাণনাথে
সুনীল গগনগত।
এত ভালবাসি তোমা
তুমি ত শিথিলে না ত!
তাই লো সুধাই প্রিয়ে বলনা বলনা,
শিথিতেও চাহ না চাহ না?

(১২)

অই দেখ তরু-গায়
কেমনে উঠেছে লতা,
কেমন কহিছে শুন
কাণে কাণে প্রেম-কথা!
(অই) দেখ পুন মেঘ-পাশে
কেমন বিজলী হাসে,

শিখাইছে লোক-মাঝে
ভালবাসা যথা তথা।
অনাদরে কত কাঁদি
তুমি কি বোঝ না ব্যথা?
তাই লো সুধাই প্রিয়ে বলনা বলনা,
ভালবাসা তবে কি জান না?

(১৩)

ভালবাস নাহি বাস
সে আশা ত আর নাই,
দিন ত ফুরায়ে এল
এবে এই ভিক্ষা চাই;
যবে দেহ তেয়াগিয়ে
যাবে প্রাণ বাহিরিয়ে,
একবিন্দু অশ্রুজল
প্রেয়সি লো যেন পাই,
জ্বলন্ত অনল-রাশি
বুকে বেঁধে চলে যাই।
অশ্রুবিন্দু শান্তিজল যাচিতেছি তাই,
বঞ্চিত করোনা প্রিয়ে কাতরে জানাই।

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়।

বর্ষা।

সুশ্যামবরণী ধনী, বিজলী-তিলকা ভালে,
গম্ভীরা মাধুরীময়ী, ঘন ঘোর শ্যামাম্বরা,
নাশিতে নিদাঘ-তাপ দাঁড়াইয়ে তাপহরা;
গম্ভীর ভ্রূভঙ্গি যেন অরি-হৃদে ভীতি ঢালে!
রথচক্রে ভীমনাদ, রথচূড়ে শঙ্খধ্বনি,
মেঘমন্ত্ররূপে ওই রণের বারতা ঘোষে,
আকাশ আবরি' পলে ধনু হ'তে তীর খসে,
আলোক-আঁধারময়ী পলে তাই এ ধরণী।
তুষিতে বাসব তাই মত্ত সুর-বালিকায়,
শ্যামদেহে শান্তিধারা বরষিছে ক্ষণে ক্ষণে,
বালার অঞ্চল-বারি মিলিতেছে সমীরণে,
প্রকৃতির মাঝে তাই-শান্তি-শীতলতা তায়।
লো সুন্দরি, লো বালিকে, লো ললনে বীরাঙ্গনা!
মরণের পথে দিও ওই শান্তি অতুলনা!

শ্রীকালীদাস চক্রবর্ত্তী।

৺রজনীকান্ত গুপ্ত। *

এ নশ্বর পৃথিবীর সব যায়; থাকে স্মৃতি, থাকে কীর্ত্তি। কিন্তু স্মৃতি—সেও কালস্রোতে ভাসিয়া যায়; কীর্ত্তি অমর—কীর্ত্তি অবিনশ্বর। রজনীকান্ত আজি এই নশ্বর পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছেন; তাঁহার স্মৃতি, তাঁহার কীর্ত্তি পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছেন। অকৃতজ্ঞ আমরা—কালে হয় ত তাঁহার স্মৃতিও বিস্মৃত হইতে পারি; কিন্তু তাঁহার অমর কীর্ত্তিই তাঁহাকে এ মরধামে চির-দেদীপ্যমান রাখিবে। মনুষ্যজীবন দুর্লভ, কীর্ত্তি ততোধিক দুর্লভ। এ জীবন লাভ করিয়া যিনি কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন, তাঁহারই জীবন সার্থক। রজনীকান্তের জীবন সার্থক হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের কোন অজ্ঞাত-পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, রজনীকান্ত সর্ব্বজন-পরিজ্ঞাত হইয়াছেন; অনাদৃতা-অনাথিনী বঙ্গভাষার সেবা করিয়া, রজনী-

* "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে এই প্রবন্ধটী পঠিত হয়।

কান্ত সর্ব্বজন সমাদৃত কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ১২৫৬ সালের ২৯শে ভাদ্র মাণিকগঞ্জ মহকুমার মত্তগ্রামে—মাতুলালয়ে রজনীকান্ত গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ও ৺কমলাকান্ত দাসগুপ্ত। তেওতা তাঁহার পিত্রালয়। বাল্যকালে গ্রামস্থ বাঙ্গালা স্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়া, কলিকাতাস্থিত সংস্কৃত-কলেজে প্রবেশ করেন। তাঁহার অভিভাবকগণ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে প্রেরণ করেন। কিন্তু অভিভাবকগণের সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই; ভগবান তাঁহার দ্বারা আরও অধিকতর উচ্চ উদ্দেশ্যসাধন করিবেন বলিয়াই, অভিভাবকদিগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিলেন। দীনা বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনই তাঁহার সংস্কৃত-চর্চ্চার ভিত্তিরূপে পরিগণিত হইল। পাঠ্যাবস্থায় বাঙ্গালা-সাহিত্যে রজনীকান্তের প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিল। তাঁহার 'জয়দেব-চরিত' ও 'পাণিনী-বিচার' জলন্ত অক্ষরে সে অনুরাগের সাক্ষ্য প্রদান করিল। প্রথম হইতেই বাঙ্গালা ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা এবং ওজস্বিতা সাধনকল্পে রজনীকান্তের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় রজনীকান্তের এই অভিনব লিপিচাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া 'এডুকেশন গেজেটে' তাঁহাকে প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন। এই সূত্রে রজনীকান্তের হৃদয়ে বাঙ্গালা রচনায় উৎসাহবারি সিঞ্চিত হইতে লাগিল। সেই বারিসিঞ্চনে যে বীজ অঙ্কুরিত হইল, বাঙ্গালা-সাহিত্য-উদ্যানে তাহাই ফলপুষ্পসুশোভিত মহান্ মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। সেই মহীরুহের প্রধান কাণ্ড—তাঁহার 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'। 'আর্য্যকীর্ত্তি', 'ভারত-কাহিনী', 'নব্যভারত' প্রভৃতি তাহার শাখা-প্রশাখা। 'প্রবন্ধমালা', 'ভীষ্ম-চরিত' ও 'বোধবিকাশ' প্রভৃতি বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তকসমূহ এই মহীরুহের ফলস্বরূপ।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার সকল গ্রন্থের বিশ্লেষণ-সমালোচনা সম্ভবপর নহে। একখানি গ্রন্থেরও যথাযোগ্য আলোচনা অসম্ভব। এস্থলে কেবল তাঁহার 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। রজনীকান্তের হৃদয়ে কিরূপ স্বদেশানুরাগ দেদীপ্যমান ছিল, এই 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' তাহার জীবন্ত প্রমাণ। প্রথম—নামকরণ। যে সকল আদর্শ অবলম্বন করিয়া তিনি এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশেরই নাম Sepoy Mutiny অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস; কিন্তু তাঁহার

গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন,—'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'। ভ্রমবশতঃই হউক, কিম্বা অজ্ঞানতাজনিতই হউক, স্বধর্ম্মের জন্য, স্বদেশের জন্য, স্বজাতির জন্য, যাহারা অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন দিতে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে তিনি বিদ্রোহ কথা ব্যবহার করিতে আদৌ সঙ্কুচিত হইয়াছেন। কেবল পুস্তকের নামকরণে কেন—আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, গ্রন্থমধ্যে কোন স্থলে রণোন্মত্ত সিপাহীদিগকে তিনি বিদ্রোহী আখ্যাও প্রদান করেন নাই।

বাঙ্গালায় প্রকৃত ইতিহাস নাই; প্রকৃত ইতিহাস-চর্চ্চায় বাঙ্গালী বড়ই বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু রজনীকান্ত বাঙ্গালীর এই কলঙ্ক মোচন করিয়াছেন। তাঁহার 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'—বাঙ্গালায় একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ রচনার জন্য, তাঁহার অধ্যবসায়, পরিশ্রম এবং অর্থব্যয়ের কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' সম্বন্ধে এমন কোনও পুস্তক বা রাজকীয় শাসন পত্র নাই, যাহা তিনি সংগ্রহ করেন নাই। এতদ্ব্যতীত সিপাহী-যুদ্ধ-সংক্রান্ত লৌকিক-বার্ত্তা সংগ্রহেও তিনি অসধারণ যত্ন ও অনুসন্ধিৎসার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' কোনও পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে; উহাকে একখানি নিরপেক্ষ মৌলিক গ্রন্থ বলিলেও বলা যাইতে পারে। আজি ২২ বৎসরের কথা—তিনি 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' লিখিতে প্রথম আরম্ভ করেন, আর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে বিগত বৈশাখ মাসে পাঁচ ভাগে তিনি এই গ্রন্থ শেষ করিয়া গিয়াছেন। এই 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' প্রণয়নই তাঁহার ভারত-ইতিহাস-চর্চ্চার মূলীভূত কারণ। এই উপলক্ষে তিনি ভারত-ইতিহাস সম্বন্ধে যে অসংখ্য পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী গ্রন্থকারের গৌরবের কথা। আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার লাইব্রেরীর মধ্যস্থিত ১০টী প্রকাণ্ড আল্‌মারী, কেবল ভারত-ইতিহাস-সংক্রান্ত গ্রন্থে পরিপূর্ণ। অন্য কোনও গ্রন্থ তাঁহার লাইব্রেরীতে স্থান পায় নাই। কেবল ভারত-ইতিহাস-চর্চ্চাই যে তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত, ইহাই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি অনন্যমনা, অনন্যকর্ম্মা হইয়া, আজীবন কেবল ভারত-ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছেন, ভারত-ইতিহাসেই তাঁহার কৃতিত্ব। বিশাল জ্ঞানতরুর একটী ক্ষুদ্র শাখা অবলম্বন

পুস্তক প্রণয়ন করিতে হইলে—গ্রন্থকার হইতে হইলে যে অনেক অধ্যয়ন, অনেক অনুসন্ধান, অনেক ত্যাগ-স্বীকার, অনেক মস্তিষ্কচালনা, অনেক সাধনা আবশ্যক করে, রজনীকান্তের জীবনই তাহার প্রধান নিদর্শন। 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' অসম্পূর্ণ রাখিয়া, রজনীকান্ত বহু বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে মনোনিবেশ করিতেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ-লেখকের তাহা অসহ্য হইত। প্রসঙ্গক্রমে সময়ে সময়ে ইহার জন্য তাঁহাকে আমি তীক্ষ্ণবাক্যবাণে বিদ্ধ করিতাম। তখন তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিতেন,—"আমি ইচ্ছা করিয়া 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' রচনায় উপেক্ষা করি নাই। এ গ্রন্থ রচনায় অনেক অধ্যয়ন, অনেক চিন্তা এবং অনেক সংগ্রহের আবশ্যক। কাজেই সময় সাপেক্ষ।" 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' প্রণয়নে আশানুরূপ অর্থ সমাগম হইবে না বলিয়াই, যে উহার প্রকাশ পক্ষে বিলম্ব ঘটিয়াছিল, তাহা নহে; ঈদৃশ গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেষ শ্রম, অধ্যয়ন, অনুসন্ধিৎসা আবশ্যক, সেই জন্যই এই বিলম্ব।

সাহিত্যের সহিত মনুষ্যত্বের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, রজনীকান্তের জীবনে তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের এক দিনের একটী ঘটনার উল্লেখ করিলেই, আপনারা বুঝিতে পারিবেন। বুঝিতে পারিবেন—তাঁহার সাহিত্যিক-হৃদয়ে কত উচ্চ মনুষ্যত্বের সমাবেশ ছিল। সন ১২৯৮ সাল, ১৮ই আষাঢ়, শনিবার আমার কন্যার বিবাহ। বিবাহের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। কেবল পাত্রকে দেয় নগদ ৫০১৲ টাকার মধ্যে ৩০০৲ টাকার অভাব। যে আত্মীয়ের নিকট ঐ টাকা পাইবার নির্দ্ধারিত কথা ছিল, তিনি হঠাৎ ঐ টাকা প্রদানের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া গেলেন। সহসা আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল! আমি আমার বাটীর বহির্দ্বারে আসিয়া, মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছি। বেলা প্রায় প্রহরাতীত। এমন সময় রজনীকান্ত আমার সম্মুখে আসিয়া আমায় সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"এত বিষণ্ণমনে কি ভাবিতেছেন?" আমি চমকিয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম। ক্রমশঃ তিনি অধিকতর ব্যগ্রভাব প্রকাশ করায়, আমার বিষণ্ণতার কারণ, তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করিলাম। একজন বন্ধুর এরূপ বিপন্ন অবস্থার কথা শুনিয়া, তাঁহার মনুষ্যত্ব উথলিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ ৩০০৲ শত টাকা প্রদানের জন্য শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে

আমাকে একখানি বরাতি চিঠি প্রদান করিলেন। সে টাকার কোনও রসিদও গ্রহণ করেন নাই; এবং এক বৎসর পরে সে টাকা পরিশোধ করিলেও, তাহার কোন সুদ লন নাই। জীবনের সেই চিরস্মরণীয় ঘটনা, এ জীবনে কি কখনও ভুলিতে পারিব?

বাঙ্গালা ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার বিষয়ে, তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বন্ধু-বান্ধবগণের রচনায় ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষিত না হইলেও, তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিত। সে সম্বন্ধেও এ প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার নিকট অনেক ঋণী। মৎপ্রণীত পুস্তক 'কনে বউ' নামক উপন্যাস যখন এক মাসের মধ্যে প্রথম সংস্করণ সমস্ত বিক্রয় হইয়া গেল, এই নগণ্য লেখকের এক-খানি উপন্যাসের এরূপ সৌভাগ্য দেখিয়া, দ্বিতীয় সংস্করণের সময় তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, পুস্তকখানির ভাষা সম্বন্ধে আমূল সংস্কার করিয়া দিয়া-ছিলেন। এ ঋণও আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।

খাঁটি সাহিত্যের সহিত, গণিতের যেন চির বৈরীভাব। ইংলণ্ডীয় বহু সাহিত্যবীরের জীবনচরিত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, বাঙ্গালারও বহু প্রতিভাশালী পণ্ডিতের নিত্য জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যিনিই সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, গণিতবিষয়ে তাঁহার অপার-দর্শিতা লক্ষিত হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-জীবনে সে দৃষ্টান্ত প্রতি নিয়তই দেখিতে পাওয়া যায়।

রজনীকান্তের জীবনে সে দৃষ্টান্ত পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। রজনীকান্তকে কখনও কোনও হিসাব পত্র রাখিতে দেখি নাই। কোনরূপ হিসাব রাখিতে হইলেই, যেন তাঁহার বিশেষ কষ্টবোধ হইত। কি পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ ও বিক্রয়ের হিসাব, কি সাংসারিক হিসাব, তিনি নিজে কোনও হিসাবই রাখিতে পারিতেন না। তাঁহার বিশ্বস্ত গ্রন্থপ্রকাশক আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ গুরুদাস বাবুর উপর সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

দরিদ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া গ্রন্থকারগণ জীবনযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করিতে পারেন না বলিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা কলঙ্ক আছে,—প্রতিভাশালী রজনীকান্তের দ্বারা সেই দুরপনেয় কলঙ্কের মোচন হইয়াছে। রজনীকান্তের পুস্তকের আয়, বাঙ্গালী গ্রন্থকারের পক্ষে গৌরবের বিষয়। গড়পড়তা তাঁহার মাসিক আয় চারিশত হইতে পাঁচ-শত টাকার ন্যূন নহে। এই আয় হইতে তিনি মাসিক দুইশত টাকা

সাংসারিক ব্যয় করিতেন। উদ্বৃত্ত আয়ে এই কলিকাতা মহা নগরীতে ১০।১৫ হাজার টাকার মূল্যের একখানি বাসগৃহ ক্রয় করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে ১০।১৫ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ রাখিয়া গিয়াছেন, এবং হিন্দু-মেসিন-প্রেসের অর্দ্ধেক সত্বও তাঁহারই উত্তরাধিকারী পাইবেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার ভারত ইতিহাসের পুস্তকালয়ের মূল্য ৫।৬ হাজার টাকার ন্যূন হইবে না। বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীর পক্ষে, ইহা বড় গৌরবের কথা বলিয়া আমরা অহঙ্কার করিতে পারি।

যে রজনীকান্তের এত গুণ,—যে রজনীকান্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব, সে রজনীকান্ত আজ কোথায়? প্রতিধ্বনি বলিতেছে—কোথায়? হায়! আজ সেই গৌরব রবি চির অস্ত গমন করিয়াছেন। যে সাহিত্য-পরিষদ রজনীকান্তের প্রাণ, সেই সাহিত্য পরিষদে সমবেত হইয়া, আমরা আজ রজনীকান্তকে দেখিতে পাইতেছি না। রজনীকান্ত চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্য-গগন আজি রজনীর গাঢ় তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অক্ষয়-কীর্ত্তিমান অক্ষয় কুমার নাই! সাহিত্য-গগনের প্রদীপ্তভাস্কর বিদ্যাসাগর নাই! সাহিত্যকুঞ্জের কলকণ্ঠকোকিল বঙ্কিমচন্দ্র নাই! বলিতে প্রাণ ফাটিয়া যায়—সে তমসাচ্ছন্ন সাহিত্য-গগনের রজনীকান্তও আজ নাই! কে বলে, রজনীকান্ত নাই? যতদিন 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' থাকিবে—ততদিন রজনীকান্তের অস্তিত্ব লোপ হইবে না। আমার হৃদয়ে—এই সমবেত শোকসন্তপ্ত বন্ধু-বান্ধব আপনাদের হৃদয়ে—সমগ্র বঙ্গবাসীর হৃদয়ে রজনীকান্ত চির জাগরূক থাকিবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বেলুনে যুদ্ধ।

পিটার লংম্যান একজন ফরাসী সার্কাসওয়ালা, শরীরে অসুরের মত সামর্থ্য। সিংহ, ব্যাঘ্র, নানাপ্রকার কুস্তীওয়ালা জোয়ান, বিবিধ কৌশল-প্রদর্শিকা রমণী সঙ্গে লইয়া ফরাসীদেশের সহরে সহরে তিনি সার্কাস দেখাইয়া বেড়ান।

একদিন সকাল বেলা সামো সহরে তিনি তাঁহার তাম্বুর সম্মুখে বসিয়া আছেন, মুখখানি কিছু বিমর্ষ, পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে সার্কাসে তেমন

লোক হয় নাই, সামো ছাড়িয়া এবার কোথায় যাইবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছেন। এমন সময় দুইটী আঠারো উনিশ বৎসরের যুবক আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। বলিয়াছি, তাঁহার মনের অবস্থা ভাল ছিল না, তিনি কিছু অপ্রসন্নভাবে বলিলেন,—"তোমরা কি চাও ?"

যুবকদ্বয় সমস্বরে লংম্যানকে বলিল, "আমরা আপনার সার্কাসের দলে ভর্ত্তি হইতে চাই।"

লংম্যান ভ্রু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "বটে !" যুবকদ্বয়ের স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া তাঁহার কিছু বিস্ময় জন্মিয়া থাকিবে, উপেক্ষা ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোন্ কর্ম্মের উপযুক্ত ?"

যুবকদ্বয় অবলীলাক্রমে বলিল, "যে কর্ম্মে লাগাইবেন, সকল কাজই পারিব।"

"তোমাদের সাহস ত খুব দেখা যাচ্ছে! সার্কাসে কাজ কত কঠিন জানিলে এত সাহস করিতে না।" লংম্যান এই উত্তর করিলেন।

যুবকদ্বয় দমিল না। বলিল, "আমাদের একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না। আমরা উপস্থিতই আছি।"

"পরীক্ষা! আচ্ছা, ঐ দেখ, একটা নর্দ্দমার মধ্যে একখান পাথর বোঝাই গাড়ী পড়ে আছে। সকালে গাড়ীখান পড়েছে, দুটো ঘোড়া, আর জন পনের লোক হিমশিম খেয়ে গেছে, গাড়ী তুল্‌তে পারে না। ঐ গাড়ীখান পথের উপর তুল্‌বার ক্ষমতা রাখ ?"

লংম্যানের কথা শুনিয়া যুবকদ্বয় হাঁ বা না কিছুই বলিল না, ডিক নীচের চাকায় গিয়া কাঁধ বাধাইয়া দিল, ডাক গাড়ীর জোঁয়ালটা তাহার অসুরের মত সবল দুই হস্তে চাপিয়া ধরিল, তাহার পর উভয়ে যুগপৎ এমন একটা ধাক্কা দিল যে, পঞ্চাশ মন পাথর সমেত গাড়ীখান চক্ষুর নিমিষে পথের উপর উঠিয়া পড়িল।

রুমালে হাত মুছিয়া ডাক ও ডিক লংম্যানের সম্মুখে আসিল, এই শ্রমসাধ্য কার্য্যে একবারও তাহাদের ঘনশ্বাস পড়িল না। লংম্যান বিস্ফারিত চক্ষে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "হাঁ, দেহে বল আছে, শরীর খেলে কেমন ?"

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ডিক ও ডাক ডিগ্‌বাজী দিয়া লংম্যানের মাথার উপর লাফাইয়া উঠিল, এবং তাহার মস্তক স্পর্শ না করিয়াই শূন্যে আর

এক ডিগবাজী দিয়া তাঁহার পশ্চাতে দশহাত তফাতে পড়িল। একসঙ্গে উঠা, একসঙ্গে পড়া—সমস্ত কাজটা যেন কলে হইয়া গেল। লংম্যান স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন, পাখী ভিন্ন আর কাহারও শরীর এমন করিয়া শূন্যদেশে আশ্রয়হীনভাবে খেলিতে পারে না।

লংম্যান সাব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তোমাদের বিদ্যা আছে বটে, কি বেতন চাও?" লংম্যান নিস্পন্দহৃদয়ে তাহাদের উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

"খোরাক পোষাক, টাকাকড়ি সম্বন্ধে আপনার যাহা বিবেচনা হয়, করিবেন, আমাদের আপত্তি হইবে না।" উভয়েরই এক উত্তর।

এবার লংম্যানের বুকের মধ্যে ধপ্ ধপ্ করিয়া উঠিল! এত সামান্য বেতনে এমন খেলোয়াড় লাভ করা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। যুবকদ্বয় সেই দিন হইতেই সার্কাসের দলে ভর্ত্তি হইল, লংম্যানকে আর সামো-ত্যাগ করিতে হইল না। যুবকগণের খ্যাতির কথা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সহরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, দলে দলে দর্শক আসিয়া সার্কাসের বস্ত্রাবাস পূর্ণ করিতে লাগিল, ক্রমাগত পনের দিন ধরিয়া দর্শকের বিরাম বিশ্রাম ছিল না, হাজার হাজার দর্শক আসিয়া সার্কাস দেখিতে লাগিল, পনের দিনে সহস্র সহস্র স্বর্ণমুদ্রায় লংম্যানের লোহার সিন্দুক ভরিয়া উঠিল।

ডিক ও ডাকের চেহারা অনিন্দ্যসুন্দর। গোঁপের রেখা উঠিয়াছে মাত্র, তাহার উপর পোষাকের শ্রী, ঠিক দেবসন্তান বলিয়া বোধ হয়। দর্শকগণ রঙ্গভূমে বসিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় তাহাদের ক্রীড়াকৌশল নিরীক্ষণ করেন, একটা সূক্ষ্ম সূত্র দুইটী উচ্চ লৌহদণ্ডে আটকাইয়া তাহারা উভয়ে তাহার উপর ডিগবাজী দিয়া খেলা করে। বহু উচ্চ হইতে একটা তার ঝুলাইয়া দাঁতে মাত্র ভর করিয়া উভয়ে অবলীলাক্রমে শূন্যে উঠিয়া যায় এবং প্রায় পঞ্চাশ ফিট উচ্চ হইতে উভয়ে পরস্পরের দেহের উপর নানাপ্রকার ব্যায়াম কৌশল দেখাইতে দেখাইতে ধীরে ধীরে নামিয়া আসে। দর্শক-গণের করতালিতে শ্রবণ বধির হইয়া যায়, দর্শকগণের আনন্দধ্বনিতে দশদিক পূর্ণ হইয়া উঠে।

সার্কাসের দলের সমস্ত লোক, দর্শকগণের সকলে এই রূপবান গুণবান্ যুবকদ্বয়ের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সকলেই তাহাদের

কেবল, একজনের হৃদয় তাহারা হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে নাই, সে একটী বালিকা, বয়স পঞ্চদশ বৎসর, নাম নেটা। নেটা সার্কাসের অধ্যক্ষ মিঃ লংম্যানের একমাত্র প্রিয়তমা দুহিতা। মাতৃহীনা বলিয়া লংম্যান নেটাকে অধিক পরিমাণে আদর দিতেন।

নেটা সুন্দরী, এমন সৌন্দর্য্য সচরাচর চক্ষে পড়ে না। মুখখানি গোলাপ ফুলের মত, সংসার-সূর্য্যের খরতর উত্তাপ তাহা একটুও ম্লান করিতে পারে নাই, চলচল সুনীলনয়ন, প্রশান্ত তড়াগে যেন নীলপদ্ম ফুটিয়া আছে, সেই সুপ্রশস্ত সুনীল, সুগঠিত নয়নদ্বয় সামান্য ভাব স্পর্শে বিস্ফারিত হইয়া হাসিয়া উঠে, যেমন করিয়া উষাগমে অরুণের প্রথম কিরণধারা সম্পাতে অর্দ্ধস্ফুট যুথিকাকুসুম অরণ্যের অন্তরালে বিকাশিত হয়। তরুণী যখন সুদৃশ্য বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে মেঘনির্ম্মুক্ত চঞ্চলা বিদ্যুতের ন্যায় বস্ত্রাবাসের অভ্যন্তর হইতে সহসা দর্শকগণের সম্মুখে বাহির হইয়া আসে, এবং বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সহকারে তাহার অভূতপূর্ব্ব সুন্দর ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করে, তখন বিস্ময়াবিষ্ট দর্শকগণের চক্ষুর সম্মুখে সহসা অপ্সর লোকের এক মোহকর বিচিত্র দৃশ্য উন্মুক্ত হইয়া যায়, সকলে নির্নিমেষলোচনে সেই রূপমাধুরী পান করিতে থাকে, কাহারও ধন্যবাদ প্রদানের পর্য্যন্ত অবসর হয় না।

নেটা প্রথম হইতেই ডিক ও ডাককে বিরক্ত করিতে আরম্ভ করে; তাহার ন্যায় চঞ্চলা প্রগল্‌ভা বালিকার পক্ষে ইহা কিছু অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু ইহার কারণ কেহ আবিষ্কার করিতে পারিত না, কাহারো কাহারো মনে হইত, হয়ত ইহা ঈর্ষামূলক, কিন্তু নেটা কখন তাহাদের অসাক্ষাতে তাহাদের নিন্দা করিত না, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে কোন প্রকার হীনতার ভাব ছিল না, সে সর্ব্বদা তাহাদিগের দূরে বাস করিত, তাহার উপেক্ষাপূর্ণ হাস্য কিরূপ মর্ম্মান্তিক ছিল, তাহা বন্ধুদ্বয় বুঝিতে পারিত, কিন্তু সেজন্য তাহাদিগকে কেহ কখন ক্ষোভ প্রকাশ করিতে দেখে নাই। নেটা সর্ব্বদা এরূপ ভাব প্রকাশ করিত যে, সে সার্কাশের অধ্যক্ষের দুহিতা আর ডিক এবং ডাক তাহার পিতার ভৃত্য মাত্র।

কিন্তু ব্যবসায়ের খাতিরে সময়ে সময়ে ডাক বা ডিককে নেটার সহিত

বীণার তারের ন্যায় তাহারা কম্পিত হইত, তাহাদের ওষ্ঠ বিবর্ণ হইয়া উঠিত, কষ্টে তাহারা আত্মসম্বরণ করিতে পারিত; কিন্তু তাহাদের এই বিহ্বলতা দর্শকগণ অনুভব করিতে পারিত না।

এদিকে লিটার লংম্যান অল্পদিনের মধ্যে অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। তিনি জানিতেন, তাহার এই ভাগ্যপরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ ডাক ও ডিক। ডাক ও ডিক কোন দিন লংম্যানকে অর্থের জন্য পীড়াপীড়ি করে নাই, দুইটি গুণশালী যুবক, যাহারা যে কোন সার্কাসের অধ্যক্ষকে ভাগ্যবান্ করিয়া তুলিতে পারে, কেন যে এত অল্প অর্থে সন্তুষ্ট থাকে, তাহা লংম্যান কিছুতে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না; বুঝিতে না পারিলেও তাঁহার মনে অশান্তির অভাব ছিল না। তিনি তাঁহার তাম্বু প্রায় তিন গুণ বাড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন, ক্রীড়া প্রদর্শনের জন্য তিনি বহুসংখ্যক আরণ্য জন্তু আমদানী করিলেন, ব্যায়াম প্রদর্শকের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি হইল। খরচ পত্র অনেক বাড়িয়া গেল, কিন্তু আশ্চর্য্য! ডাক ও ডিক কোন দিন তাঁহার নিকট দুটাকা বেতন বৃদ্ধির জন্যও প্রার্থনা করিল না। তাহারা এরূপ করিত না বলিয়াই তাহার মনে এত অশান্তি ও ভয়, যদি তাহারা তাঁহার নিকট উপযুক্ত বেতনের দাবী করিত, তিনি আহ্লাদের সহিত তাহাদের প্রার্থনা পূরণ করিতেন।

অবশেষে লংম্যান এক মতলব আঁটিলেন। স্থির করিলেন, তাঁহার সার্কাসে তিনি ডাক ও ডিককে অংশীদার করিয়া লইবেন, তাহা হইলে আর সহসা তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবে না। তিনি একদিন কথা প্রসঙ্গে তাহাদিগের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ডাক ও ডিক উভয়েই ইহাতে কোন উত্তর করিল না, আহ্লাদিত হওয়া দূরের কথা, তাহাদের সম্মতিমাত্র জ্ঞাপন করিল না। মিঃ লংম্যান তাহাদের এই উপেক্ষা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, তাহাদের ব্যবহার তাঁহার নিকট রহস্যময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। চিন্তার সমুদ্রে পড়িয়া তিনি ভাসিতে লাগিলেন, কোথাও কুল দেখিলেন না। ইহারা কি উন্মাদ, অর্থে এমন অবজ্ঞা কেন? অথবা ইহারা কোন ছদ্মবেশী দেবতা তাঁহার শুভগ্রহরূপে তাঁহার স্কন্ধ আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে প্রতিদিন অধিক ধনবান্ করিয়া তুলিতেছে।

সহসা লংম্যানের মনে হইল, হয়ত কিছু সুনাম অর্জন করিয়া ইহারা

এক নূতন সার্কাসের দল খুলিবে। সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে ত তাঁহার পসার প্রতিপত্তি সমস্তই নষ্ট হইবে, কেমন করিয়া তাহাদের এই ভয়ানক সংকল্প লোপ করা যায়। তাহাদের এই অভিসন্ধিতে বাধা দেওয়া যায়। কোনই উপায় নাই, লংম্যান চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। চিন্তার অকূল সমুদ্রে পড়িয়া তিনি একগাছি সূক্ষ্ম তৃণও অবলম্বন করিতে পারিলেন না, তাঁহার মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল, সুখ শান্তি সমস্ত অন্তর্ধান করিল। হায় অর্থ!

(ক্রমশঃ)

শ্রীজলধর সেন।

ব্রহ্মোপসনা কি?

এখনও এমন গোঁড়া হিন্দু বসুন্ধরাতিলক বিরাজমান দেখা যায়,—যাঁহারা "ব্রহ্ম" নাম শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইলেই সূচীবেধ ভাবিয়া চমকিয়া উঠেন, আর ভাবেন, যাঁহারা ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলেন, তাঁহারা যেন ঘৃণার্হ অহিন্দু; তাঁহারা যেন শিবদুর্গা কালী প্রভৃতিকে উৎখাত করিয়া দিতে চাহেন।

আবার অনেক ব্রাহ্মও আছেন, দেববাদী হিন্দুদিগকে "অব্রাহ্ম" এবং অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন এবং কুসংস্কারাপন্ন মনে করেন, ঘৃণার্হ মনে করেন। এই দুই দলের দলাদলি মিটাইবার জন্যই ভগবান্ বিষ্ণু "বিষ্ণুসংহিতায়" সদুপদেশ প্রদানে দুই দলেরই মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন; ইহাই এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইতেছে।—

যাঁহার সকল প্রকার মোহ বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহার বর্ণাশ্রমোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে অন্তরের মালিন্য অপনীত হইয়াছে, যিনি এ জগতে নিত্য বস্তু কি? অনিত্য বস্তুই বা কি? ইহা নিশ্চয়রূপে বুঝিয়াছেন, যিনি ইহলোকে সুকুমার মল্লিকামালার পরিমলে, কুঙ্কুমাক্ত চন্দনগন্ধে বা কোমলাঙ্গী কমলায়তাক্ষী অবলার লাবণ্য বিলোকনে বীভৎস-দর্শন বমি মূত্র বিষ্ঠা বা শ্লেষ্মভক্ষণের ন্যায় বিরক্ত হইয়াছেন, এবং পরলোকে স্বর্গলোকবর্ত্তি নন্দন-কাননভ্রমণে বা উর্ব্বশী রম্ভা মেনকার সহবাসে বমি-

উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইতে পারিয়াছেন, * এবং মুক্ত হইবার জন্য যিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, ঈশ্বর যাঁহাকে কৃপা কটাক্ষে অবলোকন করিয়াছেন, একমাত্র সেই সুধন্য পুরুষই চির সুখ-নিকেতন নিরুপদ্রব, শান্ত, শিব, চিদানন্দ, কেবলানন্দ, অখণ্ডানন্দ, অমিতানন্দ, আনন্দানন্দ, নেত্রের অন্তরে অবস্থিত হইয়াও দর্শন পথের অতীত, করতল-স্পৃষ্ট হইয়াও পরার্দ্ধ পথের অতিক্রান্ত, দুর্লক্ষ্য, হৃদয়ের হৃদয়, নয়নের নয়ন, শ্রবণের শ্রবণ, ঘ্রাণের ঘ্রাণ, প্রাণের প্রাণ, রসনার রসন, ত্বকের ত্বক্, বুদ্ধির বুদ্ধি, মনের মন, জগতের পিতা, জগতের মাতা, ভ্রাতা, সখা, ওঁ তৎসৎ সেই পরব্রহ্মের উপসনা করিতে সমর্থ।

সেই ধন্য উপাসক প্রবরকে ব্রহ্মোপাসনার প্রকার ভগবান্ বিষ্ণু উপদেশ প্রদান করিতেছেন,—

যথা বিষ্ণুসংহিতা ৯৭ অধ্যায়।—

"উরুস্থোত্তানচরণঃ সব্যে করে করমিতরং ন্যস্য তালুস্থাচলজিহ্বো দন্তৈর্দ্দন্তানসংস্পৃশন্ স্বং নাসিকাগ্রং পশ্যন্ দিশশ্চানবলোকয়ন্ বিভীঃ প্রশান্তাত্মা চতুর্ব্বিংশত্যা তত্ত্বৈর্ব্যতীতং চিন্তায়ৎ ॥ ১ ॥"

অর্থ—ব্রহ্মোপসাক দুই উরুতে উত্তানভাবে উভয় চরণ বিন্যস্ত করিয়া বামহস্তের উপরে দক্ষিণহস্ত স্থাপিত করিয়া, তালুতে জিহ্বা নিশ্চলভাবে রাখিয়া, উভয় দন্তপঙক্তি পরস্পর স্পর্শ না করিয়া, স্বকীয় নাসাগ্রমাত্র অবলোকন করিবে, ইতস্ততঃ অবলোকন করিবে না, চিত্তে কোনও ভয় রাখিবে না, † প্রশান্ত চিত্তে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত সেই পরব্রহ্মকে

---

* শম—অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ, দম—বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ, উপরতি—উপরোক্ত শাস্ত্রোক্ত বৈধকর্ম্মের শাস্ত্রানুসারে পরিত্যাগ, তিতিক্ষা—দেহ বিঘটিত না হয় এরূপ প্রকারে শীতোষ্ণাদি যুগল পদার্থ সহ্য করা, সমাধান—ঈশ্বর চিন্তায় নিবিষ্টমন অভ্যাস বশে আবার যদি বিষয়ের প্রতিধাবিত হয়, তখন দোষ বুদ্ধিতে পুনর্ব্বার বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনা, শ্রদ্ধা—গুরুবাক্য ও শাস্ত্র বাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস। (আত্মানত্ম বিবেক)

† ভগবান্ ব্যাসদেব গীতাতে বিষ্ণু সংহিতারই অনুরূপ শ্লোক বলিয়াছেন—যথা—৬। ১৩—১৪।

চিন্তা করিবে অর্থাৎ—পরব্রহ্ম প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, শব্দতন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র নহেন, পরব্রহ্ম মন শ্রবণ ত্বক্, চক্ষু, রসনা, ঘ্রাণ বাক্‌পাণি পদে পায়ু ও উপস্থ এই একাদশ ইন্দ্রিয় নহেন, পরব্রহ্ম ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ও ব্যোম নহেন—পরন্তু তাহার অতিরিক্ত ॥ ১ ॥

"নিত্য মতীন্দ্রিয় মগুণং শব্দস্পর্শ রূপরস গন্ধাতীতং সর্ব্বজ্ঞ মতি স্থূলং ॥ ২ ॥

অর্থ—পরব্রহ্ম নিত্য—তাঁহার ধ্বংস ও প্রাদুর্ভাব নাই, মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, তাঁহাকে জানে না, কেননা তিনি শব্দ স্পর্শ রূপরস বা গন্ধ নহেন, কিন্তু সকলকেই তিনি জানেন, যে হেতু তিনি মহান্ সকলেতেই ব্যাপক রূপে আছেন ॥ ২ ॥

"সর্ব্বগ মতি সূক্ষ্মং" ॥ ৩ ॥

অর্থ—তিনি সকল বস্তুরই অন্তরে বাহিরে অসুস্থ্যত, কেন না তিনি অতি সূক্ষ্ম ॥ ৩ ॥

"সর্ব্বতঃ পাণি পাদং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং সর্ব্বতঃ সর্ব্বশক্তি ॥ ৪ ॥ (*)

অর্থ—তাঁহার সকল দিগে সহস্র সহস্র পাণি, সহস্র সহস্র পাদ, সহস্র সহস্র শির, সহস্র সহস্র চক্ষু ও সহস্র সহস্র মুখ বিস্তারিত রহিয়াছে; সকল দিগেই তাঁহার শক্তি প্রসারিত ॥ ৪ ॥

"এবং ধ্যায়েৎ" ॥ ৫ ॥

অর্থ—এই প্রকারে পরব্রহ্মের ধ্যান করিবে ॥ ৫ ॥

"ধ্যান নিরতস্য সংবৎসরেণ যোগাধির্ভাবো ভবতি" ॥ ৬ ॥

অর্থ—উক্তরূপে ধ্যানে নিরত থাকিলে এক বৎসর কালেই সেই সাধকের যোগ উপস্থিত হয়।

"অথ নিরাকারে লক্ষ্যবন্ধং কর্ত্তুং ন শক্নোতি তদা পৃথিব্যপ্তেজো বায্বাকাশ মনোবুদ্ধ্যব্যক্ত পুরুষাণাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং ধ্যাত্বা তত্র লব্ধলক্ষ্য স্তত্তৎ পরিত্যজ্যাপর মপরং ধ্যায়েৎ ॥ ৭ ॥

অর্থ—যদি নিরকারে লক্ষ্য স্থির করিতে সমর্থ না হও তবে পৃথিবী জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, প্রকৃতি এবং পুরুষের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থগুলিকে ধ্যান করিবে, তাহাতে লক্ষ্য স্থির হইলে সেই সেই

---

* সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তং সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখং
সর্ব্বতঃ শ্রুতি মল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

ধ্যেয় পদার্থগুলি ছাড়িয়া পরের পরের ধ্যেয় পদার্থের ধ্যান করিতে আরম্ভ করিবে, অর্থাৎ স্থূল পৃথিবীর ধ্যান করিতে করিতে ভালরূপে আয়ত্ত হইলে অর্থাৎ যেই নেত্র আমীলন করিলে অমনি পৃথিবীর সম্যক্ রূপ আসিয়া হৃদয়ে প্রতিভাত হইল, এইরূপ পৃথিবীর ধ্যান সড় গড় হইলে, তখন পৃথিবীর ধ্যান ছাড়িয়া জলের ধ্যান করিতে প্রবর্ত্ত হইবে, এইরূপে ক্রমশঃ স্থূল ধ্যান ছাড়িয়া সূক্ষ্মের দিগে অগ্রসর হইবে, এবং ক্রমে প্রকৃতি পর্য্যন্ত ছাড়িয়া পুরুষের ধ্যানে প্রবর্ত্ত হইবে ॥ ৭ ॥

"এবং পুরুষ ধ্যানমারভেৎ" ॥ ৮ ॥

অর্থ—এইরূপে পুরুষের ধ্যান আরম্ভ করিবে ॥ ৮ ॥

"তত্রাপ্যসমর্থঃ স্বহৃদয় পদ্মস্যাবাঙ্মুখস্য মধ্যে দীপবৎ পুরুষং ধ্যায়েৎ" ॥ ৯ ॥

অর্থ—উক্তরূপে আত্মার ধ্যান করিতে অসমর্থ হইলে অধোমুখে অবস্থিত হৃদয় কমলমধ্যে প্রদীপবৎ পুরুষের ধ্যান করিবে।

"তত্রাপ্যসমর্থোঽভগবন্তং বাসুদেবং কিরীটিনং কুণ্ডলিনমঙ্গদিনং শ্রীবৎসাঙ্ক বনমালাবিভূষিতোরস্কং সৌম্যরূপং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্র গদাপদ্মধরং, চরণমধ্য গততুর্য্যং ধ্যায়েৎ" ॥ ১০ ॥

অর্থ—পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে যদি পুরুষের ধ্যান করা দুষ্কর মনে হয়, তবে যাঁহার চরণযুগলে ভগবতী বসুন্ধরা মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রণতা, যিনি চারিহস্তে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়াছেন, অতিশয় সৌম্যমূর্ত্তি, যাঁহার প্রশস্ত বক্ষঃস্থলে বনমালা দোলায়মান, এবং কুটিল রোমরেখা জলাবর্ত্তের মত শোভমান, মুখমণ্ডল কিরীট কুণ্ডলে উদ্ভাসিত, সেই ভগবান্ বাসুদেবের মনোমোহনমূর্ত্তি চিন্তা করিবে। (১)

"যদ্ধ্যায়তি তদাপ্নোতি ধ্যানগুহ্যং" ॥ ১১ ॥

অর্থ—এ প্রকারে যাঁহাকে ধ্যান করা হয়, ধ্যান গম্য সেই পদার্থ লাভ করিতে পারে ॥ ১১ ॥

---

(১) এ স্থানে বাসুদেব কেবল উপলক্ষণমাত্র, কিন্তু বুঝিতে হইবে, আপন আপন অভিমত দেবতা, কোনও একটী দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া ধ্যানের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধনাই উদ্দেশ্য, অন্য কিছু নহে, এজন্যই মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রে কহিয়াছেন, "যথাভিমতধ্যানাদ্বা"। ১।৪০।

অর্থ—যে কিছু অভিমত বস্তুর ধ্যানের দ্বারাই চিত্তের একাগ্রতা

"তস্মাৎ সর্ব্বমেব ক্ষরংত্যক্ত্বা অক্ষরমেবঁ ধ্যায়েৎ ॥ ১২ ॥

উক্ত প্রকারে স্থূল মূর্ত্তিতে লক্ষ্য স্থির হইলে তৎপরে স্থূল পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র অক্ষর পরব্রহ্মকেই ধ্যান করিবে ॥ ১২ ॥

"ন চ পুরুষংবিনা কিঞ্চিদস্মস্তি" ॥ ১৩ ॥

অর্থ—এ জগতে সেই পরব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই অক্ষর অচ্যুত পদার্থ নাই ॥ ১৩ ॥

"তংপ্রাপ্য মুক্তো ভবতি" ॥ ১৪ ॥

অর্থ—তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলেই সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, অন্যথায় আর কিছুতেই নিস্তার নাই ॥ ১৪ ॥

ইহাই আর্য্য শাস্ত্রানুমোদিত ব্রহ্মোপাসনা, ইহারই জন্য আর্য্যগণ স্থূলোপাসনার পথ উদ্ভাবিত করিয়াছেন, এরূপ স্থলে অভ্যাস লাভ করিয়া শত জন্মান্তেও যদি অখণ্ডানন্দস্বরূপ সেই পরম পুরুষকে লাভ করা যায়, আর্য্যসাধক তাহাতেও কৃতার্থতা লাভ করিবে।

শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

দুঃখ।

দুঃখই সংসারের একমাত্র বিভীষিকা। যত কিছু উদ্যোগ, চেষ্টা, ভাবনা, উদ্বেগ এবং পরিশ্রম সকলই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য। মনুষ্য অসাধ্যসাধন করিতেছেন, গিরি তুলিতেছেন, সাগরের তলস্পর্শ করিতেছেন, কেবল দুঃখকে দূরে রাখিবার জন্য। "চিরদুঃখী হও" ইহার ন্যায় মর্ম্মভেদী অভিসম্পাত মনুষ্য সমাজে আর নাই; মহা শত্রু না হইলে এমন গালি দেয় না। মৃত্যু এত আশঙ্কার ব্যাপার হইত না, যদি উহাকে আমরা মহাদুঃখ—মহাভয় বলিয়া না জানিতাম। কিন্তু দুঃখ কি, কাহাকে দুঃখী বলিতে পারি? কি জানি কি? তুমি, আমি দেশশুদ্ধ লোক এক সময়ে না এক সময়ে দুঃখের আস্বাদ পাইয়াছি, দুঃখী হইয়াছি; পরন্তু সাধারণতঃ দুঃখ পদার্থ কি, তাহা বলা অতি কঠিন। যে দেশে দুঃখ নাই, যে রাজ্যের প্রজা দুঃখ কাহাকে বলে জানে না, কখনও কোন দুঃখী হতভাগাকে ও দেখে নাই, তাহাদের কেমন করিয়া বুঝাইব, দুঃখ

কি! যাহা হইলে তুমি নিজকে দুঃখী মনে কর, হয়ত আমি তেমনটি হইলে মহাসুখী হই, আবার তোমার সুখের উপাদানকে অন্যে ঘৃণ্যকারজনক বলিয়া ত্যাগ করিতে পারে। ধনী শীতকালকে সুখের—বিলাসের সময় বলিয়া মনে করে, দুঃখী দরিদ্র গ্রীষ্মসমাগমে নিশ্চিন্ত হয়, তখন আর বস্ত্রাচ্ছাদনের জন্য উদ্বিগ্ন হইতে হয় না। চাষা বুক্‌ড়ী চালের ভাত খাইয়া, গুড়ুক টানিয়া আমগাছের তলায় মহাসুখে নিদ্রা যায়, আর লক্ষপতি দুগ্ধফেননিভ কার্পাস-শয্যায় শয়ন করিয়া অনিদ্রায় উষ্ণমস্তিষ্ক হইয়া শিরঃ-পীড়ায় ব্যথিত হয়েন। কিন্তু লক্ষপতি ধনীকে যদি বলা যায় যে, আপনি প্রগাঢ় নিদ্রার প্রার্থনা করেন, আপনি চাষার ন্যায় লুণ মাখিয়া বুক্‌ড়ী চালের ভাত খাইয়া, গুড়ুক টানিয়া এই বৈশাখ মাসের রৌদ্রে আমের শীতলছায়ায় গিয়া শয়ন করুন, আপনার দুঃখ দূর হইবে, আপনি নিদ্রিত হইবেন। তাহা হইলে হয় ত তিনি আত্মহত্যা করা সহজ মনে করেন, এবং এমন ভীষণ চিকিৎসা দূরে নিক্ষেপ করেন। যাহা চাষার পক্ষে সুখ অথবা সুখের কারণ, তাহা ধনীর ভীষণ দুঃখ। তবে কি বলিব, যাহাতে লোকে অসুখী হয়, তাহাই দুঃখ। গৌতমের ন্যায় সূত্রে আছে যে, "বাধনা লক্ষণং দুঃখমিতি" [১ম অ, ১ আ ২১সূ] দুঃখের লক্ষণই বাধা। গতি এবং প্রবৃত্তি এবং অন্যবিধ শারীরক ও মানসিক চেষ্টা বাধিত অথবা রুদ্ধ হইলে দুঃখ হয়। আমি যাহা চাই, তাহা যদি না পাই, অথবা ইপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তির পথে যদি কিছু বাধা কিম্বা বিপদ ঘটে, তবেই আমি দুঃখিত হই, মর্ম্মাহত হই। শিশু জল কাদা লইয়া খেলিতে চায়, প্রাপ্তিমাত্রেই সকল পদার্থই বদনে দেয়, বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের দুই একখানি পাতা চিবাইয়া ভোজন করিবারও এক একবার চেষ্টা করে; কিন্তু তুমি তাহার পিতা, বালকের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহাকে এই সকল কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত কর; কিন্তু সে তাহা বুঝে না, মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হয়। শেষে মনের বেগ না সাম্‌লাইতে পারিয়া কাঁদিয়া ফেলে। ভিতরে যখন কোন একটা চেষ্টা হয়, যখন আত্মার শক্তি সকল বহির্ম্মুখী হয়, প্রত্যেক স্নায়ুতে একটা যেন তড়িদ্বেগ প্রবাহিত হইতে থাকে, আবেগ এবং উদ্বেগজনিত উৎকণ্ঠায় মন সদাই চঞ্চল থাকে, আশার সামগ্রী পাইবার জন্য আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়া আমরা কার্য্য করিতে থাকি। মন, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি যেন তদাকারাকারিত হইয়া যায়, তখন যদি কোন

অননুভূত অজ্ঞেয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়া আমাদের আশাপথে কণ্টক হইয়া দাঁড়ায়, আর যদি বুঝিতে পারি যে, শতচেষ্টা করিলেও কার্য্যসিদ্ধি হইবে না, তাহা হইলেই যে সকল আত্মশক্তি আমাদের স্নায়ুমণ্ডলকে প্রকম্পিত করিয়াছিল, যে চেষ্টার জন্য আমরা উৎকণ্ঠার ঘোরে আত্মহারা হইয়াছিলাম, তাহারা যেন স্তম্ভিত হইয়া যায়। যাহারা বাহিরের কার্য্যে শতমুখী হইয়া প্রধাবিত হইয়াছিল, তাহারা হঠাৎ প্রতিরুদ্ধ হওয়াতে শরীরেতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। শরীর এবং মন, কিন্তু এই সংপ্রবাহিত বেগকে মধ্যপথে সম্বরণ করিতে পারে না। স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, শক্তি শক্তিদ্বারাই স্তম্ভিত এবং পরাভূত হইয়া থাকে। সুতরাং এই কার্য্যশক্তিকে আত্মস্থ করিতে হইলে, আত্মার আর এক স্বতন্ত্র শক্তি প্রযুক্ত করিতে হইবে। প্রথম চেষ্টায় এবং উদ্যমে শরীরের অন্য শক্তি শ্লথ এবং হীন হইয়াছিল, হঠাৎ এক নূতন এবং বিপরীত শক্তির উদ্ভাবনায় যে আয়াসটুকু করিতে হয়, তাহাতে আরও যেন মন ও স্নায়ুমণ্ডলী এলাইয়া পড়ে। এই বাধাগ্রস্ত এবং শক্তিহীন অবস্থাই দুঃখ। প্রবাসী বাঙ্গালী বাবু ছুটী লইয়া বাটী আসিবেন। অনেক দিনের পরে দেশে ফিরিতেছেন, তাই তথাকার নানাবিধ নূতন সামগ্রী সকল ক্রয় করিতেছেন, সুবর্ণ গহনাও দুই একখানা প্রস্তুত করিতে দিয়াছেন, স্বর্ণকারের বাটীতে প্রতিদিন যাতায়াত করিতেছেন, এবং একখানি ছুটীর দরখাস্ত করিয়াছেন, বড়বাবু সুপারিস করিয়া বড় সাহেবের নিকট উহা পাঠাইয়া দিয়াছেন, সাহেবও প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন। যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা সকলি সংগ্রহ করা হইয়াছে, উৎকণ্ঠায় আবেগে বাবু এখন যাইবার দিন গণিতেছেন, ক্রমে অবসরের দিনও নিকট হইল, বাবু বন্ধু-বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াও বিদায় লইয়া আসিলেন। এমন সময়ে যদি তাঁহার জ্বর হয় এবং ডাক্তারে বলে যে, তিনি কোন ক্রমেই দেশে যাইতে পারিবেন না, তাহা হইলে বোধ হয়, যেন তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, দুঃখে হতাশে শরীর যেন অসাড় নিস্পন্দ হইয়া পড়ে, চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুবিন্দু পড়িতে থাকে। এই বাধিত অবস্থাই দুঃখ। স্বেচ্ছা এবং প্রবৃত্তির বিপরীত যাহা, তাহাই দুঃখ। অর্থাৎ স্বেচ্ছা এবং প্রবৃত্তির বেগ অপ্রতিহত থাকিলে লোকে সুখী হয়। সুখ জীবনের সহজাবস্থা, দুঃখ বাধিত এবং বিরুদ্ধাবস্থা। তাই বলিয়া

জিজ্ঞাসা করি, যদি প্রবাহিনী সমতল ক্ষেত্রমধ্য দিয়া, সহজে বিনা বাধায় বহিয়া সাগরে গিয়া পড়িত, তাহা হইলে উহা বেগবতী হইত কি না? তাহা হইলে উহা গভীর খাদ বাহিয়া গ্রাম, নগর পল্লী সকলকে সঞ্জীবন প্রদান করিয়া, স্নেহস্নিগ্ধ করিয়া উত্তাল তরঙ্গে ছুটিতে পারিত কি না? মনে হয়, পারিত না। শক্তি বাধা না পাইলে সঞ্চিত হয় না, আবার সঞ্চিত শক্তি ব্যতীত বেগবান অন্য কিছুই নাই। সুতরাং গতি, বাধিত শক্তিতেই জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ যে শক্তি সংবদ্ধ, রুদ্ধ, সংপিষ্ট অথবা দুঃখিত তাহাই প্রবল প্রকাশশালিনী, এবং প্রবলতা না থাকিলে শক্তি কার্য্যহীন স্থাণু। তবেই বলি না কেন, দুঃখ না পাইলে শক্তি প্রকাশিতা হয়েন না। বিন্দু বিন্দু জল পর্ব্বতপঞ্জরে সঞ্চিত হইয়া ধীরে ধীরে পাথর-চাপা বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রজত সূত্রধারে গলিয়া পড়িতে লাগিল, তাহারা উপলখণ্ডের উপর পড়িয়া উল্‌টি পাল্‌টি খাইতে লাগিল, দুঃখে যেন শুকাইয়া যাইতে লাগিল; শেষে পরামর্শ করিয়া দশজনে এক হইয়া প্রস্তর রাশির উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। কত বাধা বিপত্তি উত্তীর্ণ একটু সমতলক্ষেত্রে অনায়াসে বহিয়া যাইতে পাইল, আবার বাধা, আবার বন্ধুর ভূমি, কত স্থানে বিশ্রাম হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়া স্থির হইয়া ব্যয়িত শক্তি পুনঃ সঞ্চয় করিল, এত পরিশ্রম চেষ্টা, উদ্যম, চিন্তা, ব্যথা, উৎকণ্ঠা কাটাইয়া, তোমার আমার ন্যায় তৃষিত কাঙ্গালগণকে স্নিগ্ধতা বিলাইয়া, নির্ম্মল পানীয় দান করিয়া, সঞ্জীবিত করিয়া দুঃখে কষ্টে তরঙ্গিণী তবে মহতের—বিশালের অঙ্গে মিশাইয়া যায়। তবে কি দুঃখই নদী সকলের উপাদেয়তার আদি কারণ?

তোমার আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনেও কি এই মহাভয়ের উপকারিতা দেখা দেয় না? দেয় বৈ কি! সে জীবন জীবনই নহে, যাহা দুঃখের—দারিদ্র্যের অগ্নি পরীক্ষায় নির্ম্মলীকৃত না হইয়াছে। সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে, যে সদা সুখের ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত নিদ্রিত থাকে। সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে, যাহা অভাবের পেষণে সুশাণিত না হইয়াছে। যেমন নদীজল বাধা পাইয়া, প্রণালীবদ্ধ হইয়া গভীরতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি মনুষ্য-প্রকৃতি দুঃখ দৈন্য দরিদ্রতার বিষম বাধা পাইয়া, প্রণালীবদ্ধ হইয়া গভীরতা প্রাপ্ত হয়। গভীর নদী পূতসলিলা, গভীর প্রকৃতি পুণ্য পরিমলযুক্তা। মনুষ্য

ছড়াইয়া পড়ে, স্থানে অস্থানে চলিয়া যায়, গোষ্পদ-গভীর হয় মাত্র। যেখানে গভীরতা নাই, প্রণালীবদ্ধ কার্য্য নাই, বেগ নাই, অধ্যবসায় নাই, সেখানে উদ্দেশ্য সাধন হয় না, সেখানে বাস করিলে মনুষত্ব হারাইতে হয়, সে দেশ যবন দেশ, নরকজ্ঞানে উহা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। দুঃখ আমাদের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেয়, সংসারের অসারতা অলীকতা দেখাইয়া মহান্ বিশাল প্রকাণ্ড অনন্তের মধ্যে ডুবিতে ইঙ্গিত করে। সংসারে কত বাধা পাও, কত ব্যথা পাও, যাতনায় মুখে রক্ত উঠিতে থাকে, দশদিক্ শূন্য দেখ, তবুও যেন মনে হয়, কে বুঝি কানের কাছে চুপি চুপি বলিতেছে, যাহা খুঁজিতেছ, তাহা এই অনতিদূরেই অবস্থিত। দুঃখের বিরাট জ্বালায় যখন প্রবৃত্তি ও বাসনাবিলাস পুড়িয়া থাক্ হইয়া যায়, তখন কে যেন স্বপ্নের ঘোরে বুঝাইয়া দেয় যে, আমার শীতল সাগর-সঙ্গম এই দৃষ্টির ভিতরে আসিয়াছে। বীরত্ব, মহত্ত্ব, আত্মত্যাগ, বৈরাগ্য, সাহস, উদ্যম এবং ভরসা কোথায় পাইতাম, যদি সংসারের দুঃখ না থাকিত, যদি লোকে দুঃখের বজ্রসূচী বিদ্ধনে উন্মত্ত উদ্‌ভ্রান্ত না হইত। যদি বুঝি আমরা দুঃখী, তবেই স্থির জানিও, সুখের ঊষা ফুট ফুট হইয়াছে। আমাদের দুঃখের উপাদানের অভাব নাই। যাতনাদায়ক অনুপান সংগ্রহ হইয়াছে, এখন বুঝিতে হইবে, প্রাণে প্রাণে ব্যথিত হইয়া, মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত পাইয়া অনুভব করিতে হইবে আমরা দুঃখী, চিরদুঃখী মহাদুঃখী। তীব্র অনুভূতি হইলেই প্রবাহ আসিবে। সে কোটাল বাণে সব ভাসিয়া যাইবে, জীবনদী উজান বহিবে, মহাসাগরের শীতল জলে দুঃখদাবদগ্ধ হিন্দুহৃদয় কৃতার্থ হইবে। তবে কেন দুঃখকে ভয় করি, কেন দুঃখী দেখিলে সরিয়া দাঁড়াই। এস দুঃখ! ভারতের আপদমস্তক তোমার বিষম বিষ-বেদনায় ব্যথিত করিয়া দেও, তোমার তাড়নায় লোকে যেন অস্থির উন্মত্ত হইয়া উঠে। এস তুমি সর্ব্বমঙ্গলবিধাতা, সর্ব্বসম্পৎদাতা! ভারতের গৃহে গৃহে আসিয়া দেখা দেও। রাজা, মহারাজা, নবাব, উজীর, ছোট, বড়, ধনী, নির্ধন সকলকে তোমার তড়িৎশক্তি দ্বারা বিকম্পিত করিয়া দেও। এ অসাড় নিষ্পন্দ জাতিকে উদ্যম দেও, উত্তেজনা দেও, উন্মত্ততা দেও।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

জননী।

পাঠক! পীড়ায় জর্জ্জরিত হইয়া অনেক ঔষধ সেবন করিয়াছ, কিন্তু মাতার সেবাশুশ্রূষার মত শান্তি ঔষধ পাইয়াছ কি? অসহ্য যন্ত্রণা পাইয়া, উন্মাদের ন্যায় রোদন করিতে করিতে "মা" বলিয়া ডাকিলে, যেমন মন প্রাণ শীতল হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। কারণ, মাতার নিমিত্ত আমরা যেরূপ ব্যাকুল, মাতা সন্তানের জন্য ততোধিক কাতরা। জননীর গর্ভ হইতে এই মরণশীল জগতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, আমাদিগের নয়ন থাকিলেও কিছুই চিনিতে পারিতাম না। কর্ণ থাকিলেও শব্দের ঘাত-প্রতিঘাত গ্রাহ্যের মধ্যে আসিত না। নাসিকা থাকিলেও কোন দ্রব্যের সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ কিছুই অনুভব করিতে পারিতাম না। কিছুদিন পরেই আর আমাদিগের সে অবস্থা থাকে না। এক দুই করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, স্রোতস্বতীর জলপ্রবাহের মত গত হইতে থাকে, আর প্রাণীমাত্রেই পরিবর্ত্তনশীল জগতে ক্রমে ক্রমে এক অভিনব রাজ্যে পদার্পণ করিতে থাকে; তখন আমরা যাঁহার উদরে দশ মাস দশ দিন বাস করিয়াছিলাম, যিনি শরীরের রক্তধারা পীযূষরূপে দান করিয়া আমাদের এই অমূল্য জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন; যিনি রজনীতে অনিদ্রায় ও সন্তানের অবস্থাবিশেষে অনাহারে থাকিয়া সন্তানের মঙ্গল-কামনা করিতেন, এবং যিনি অসহ্য কষ্টে পতিত হইয়াও সন্তানের মুখকমল দর্শন করিয়া সমুদয় ক্লেশ ভুলিয়া যাইতেন; যিনি সন্তানের পীড়া হইলে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার দেখিতেন এবং সন্তানের সুখে যিনি স্বর্গ-সুখ লাভ করিতেন; সেই স্নেহময়ী প্রেমময়ী জননীকেই আমরা প্রথমে "মা" বলিয়া ডাকিতে শিখি। সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার এরূপ সৃষ্টিকৌশল ভেদ করিতে কেহই সক্ষম নহেন।

সকলে স্পষ্টই দেখিতেছেন যে, মাতা সন্তানের নিমিত্ত স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত; মাতার অপত্যস্নেহের সদৃশ স্বর্গীয় সুখকর সামগ্রী এ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। মাতা অপেক্ষা পরম পূজনীয় পবিত্র বস্তু পৃথিবীতে আর কোথাও পাইবে না। স্বর্গ যে এত বড় উচ্চ স্থান, যাহার পবিত্রতার সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না, মাতা তদপেক্ষা উচ্চ ও

তুমি কি ?

(কভু) ছুটাছুটি কর হাসি কলরবে
আঁচল উড়ায়ে পবনে,
গোলাপ গুঁজিয়া সুঠাম খোঁপায়,
আল্‌তা পরিয়া চরণে।

(২)

(কভু) আলু'য়িত কেশ লুঠিত আঁচল
গভীর বদন নেহারি,
মুখে কথা নাই চোখে হাসি নাই
চরণ চলে না তোমারি।

(৩)

তুমি কি বালিকা—কুসুম কলিকা
ভাবনা যাতনা জান না ?
সংসারের অলি কতই গুঞ্জরে
সে দিকেও কাণ পাত না ?

(৪)

কিবা চিন্তাশীলা সুগুরু হৃদয়া
আশা নিরাশার কিঙ্করী,
রাগ বিরাগের, সুখের দুখের
এখনি গো তুমি সুন্দরি ?

(৫)

ভালবেসেছিলে ভালবাসে নাই
দুখ দিয়া গেছে পরাণে,
তাই কি ভাব গো কখনো কখন
বিষাদ-বিরস বদনে ?

(৬)

এ বিশ্বমণ্ডলে কে আছে অধম
তোমাকে হেলে যে ললনে,
আশীষের ফুল শিরে না পরিয়া
দূরে কে ঠেলে গো চরণে ?

(৭)

নিরাশ প্রেমের অনল নিশ্বাস
ও কোমল হৃদি দহে না,
পারিজাত ভরা নন্দনকাননে
শিরকোর কভু বহে না।

(৮)

তবে যে কালিমা কভু দেখা যায়
ও মুখে তোমার প্রেয়সি,
(সে) কমলে শৈবালে বিধির বিধানে
মাধুরী বাড়ে গো রূপসী।

(৯)

(তুমি) বালিকা, প্রবীণা চপলা, সুধীরা,
হাসিমুখী কভু মলিনা ;
(আমি) নানারূপে তোমা আরাধনাকরি
প্রেমযোগে কভু টলি না।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী।

BENGAL LIBRARY
NOV. 19
WRITERS BUILDINGS
321
1900

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক পত্র।)

নবম বর্ষ। } ১৩০৭ সাল, আশ্বিন। { ৩য় সংখ্যা।

বাঙ্গালা-সংবাদ-পত্রের ইতিহাস। *

(পঞ্চদশ প্রস্তাব।)

৬৪। কৌস্তুভকিরণ।

(১২৫৫ সাল—১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ)

ঘোষ মহেশচন্দ্র, "কৌস্তুভ" বক্ষে ধারণ করিয়া, দিন-কতকের তরেও সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েন। ভগবানের বক্ষঃস্থ কৌস্তুভমণি, যেমন পবিত্র, তেমনই শোভাসম্পদেও, উহা, অতুল। স্বয়ং চিন্তামণি এবং ঋষি-মুনিগণই, উক্ত মণির গুণই অবগত। সপ্তাহান্তর "কৌস্তুভের" কিরণ, বঙ্গের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইত।

৬৫। সত্য-ধর্ম্ম-প্রকাশিকা।

(১২৫৬ সাল, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ)।

"সত্যধর্ম্ম-প্রকাশিকা" সত্য সত্যই কি, যথার্থ ধর্ম্মমত-ঘোষণায় ব্রতী হইয়াছিলেন, কিংবা তদ্বিপরীত রীতি-নীতিতে তাঁহার মতির গতি, প্রধাবিত হইয়াছিল, পশ্চাদ্বর্ণিত বৃত্তান্তে তাহা ব্যক্ত হইবে। "কর্ত্তাভজা"-সম্প্রদায়ের

* "বঙ্গবাসীর" সম্প্রদায়, যখন "জন্মভূমির" পরিচালন করিতেন, তখন পর্য্যন্ত এই সন্দর্ভের ১৪শ (চতুর্দ্দশ), অংশ প্রকাশিত হয়। সুতরাং বর্ত্তমান প্রস্তাবটী, ১৫শ প্রবন্ধ।

মতামত-সমর্থনই, ইহার লক্ষ্য ছিল। সম্পাদক মহাশয়ের উদ্যম, অনলসতা বা অধ্যবসায়, তাদৃশ প্রশংসাযোগ্য ছিল না। কিসেই বা উত্তম উদ্যম হইবে, বল! একটীমাত্র সংখ্যা-প্রচারের পরেই, উহা রহিত হইয়া যায়। এই বর্ষের অধিকার-সীমাতেই না কি—

—০*০—

৬৬। "ভৈরব দণ্ড।"

৬৭। "সুজন-বন্ধু।"

৬৮। "জ্ঞানচন্দ্রোদয়।"

এই ৩ (তিন) জন, আবির্ভূত হয়েন? "ভৈরব দণ্ড" তো এক হরেরই জানি। এ আবার কাহার ভীষণ যষ্টি? প্রথম প্রথম, বিষয়টী, বিদিত হইবার পথে তীক্ষ্ণ কণ্টক-জাল নিক্ষিপ্ত ছিল। উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য, কাশীধাম হইতে উহার প্রচারারম্ভ করেন। "রসমুদ্গরের" সঙ্গে ভীষণ রণের কারণেই উহার জীবন-হরণ হয়! "ভৈরব-দণ্ডের" পরই "সুজন-বন্ধু"র আবির্ভাব, একান্তই স্বাভাবিক। সজ্জন-বান্ধব হইবার অবশ্যম্ভাবি-ফল—"জ্ঞানচন্দ্রোদয়" বটে।

ইহাদের সম্যক্ পরিচয়,অত্যন্ত অপরিচিত। এই অবস্থাতেই ১২৫৬ সালকে (১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দকে) বিদায় দিতে হইল! এটী তেমন সুখাকর সমাচার নয়।

—০*০—

৬৯। সর্ব্বশুভকরী।

(১২৫৭ সাল, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ।)

প্রত্যেক মাসে একটীমাত্র 'সিকি' দক্ষিণা দিলেই, "সর্ব্বশুভকরী" প্রসন্ন-চিত্তে লোককে দর্শন না দিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। প্রতি সংখ্যার অবয়ব, ১০ (দশ) পৃষ্ঠা।

(ক) শৈশব বিবাহ,

(খ) রামাগণের বিদ্যাশিক্ষা,

(গ) মানবগণের সমত্ব,

(ঘ) সুরা-সেবন-নিষেধ,

(ঙ) গঙ্গাযাত্রা-মৃত্যু,

(চ) চড়ক পূজা ও পার্ব্বণ,

ইত্যাকার প্রবন্ধ-নিকরেই এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানির অঙ্গ, সুদৃশ্য ও

সুন্দর দেখাইত। কলিকাতাস্থিত ইংরাজী-শিক্ষিত দলের অগ্রণী ছিল,—এই "সর্ব্বশুভকরী" পত্রিকা। অনন্ত ব্যোমে যেমন জ্যোতিঃ-পদার্থ, ক্ষণপ্রভাবৎ স্বল্পকাল কিরণ, বিকিরণ করে এবং যেমন অল্পক্ষণেই তাহা, বিনাশ প্রাপ্ত হয়, "সর্ব্বশুভকরীরও" সেই দশা। মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। †

—০*০—

৭০। ধর্ম্ম-মর্ম্ম-প্রকাশিকা।

(১২৫৭ সাল, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ।)

এটী উপনগরীয় পত্রিকা। "কোন্নগর"-স্থিত সভা-বিশেষের মুখ-পত্র এটী। কিন্তু সংবাদ, ঐ পর্য্যন্তই। ইহার জীবন, অধিক দিন-স্থায়ী হয় নাই। সকলই মনস্তাপের বিষয়।

—০—

৭১। সত্য-প্রদীপ।

(১২৫৭ সাল, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ)।

"ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া" ইত্যাদির সহায়তায় ও অনুকূলতায় "সত্য-প্রদীপের" দীপ্তি, আমাদের অনুভূত হইয়াছে। টাউন্‌সেণ্ড, এই "প্রদীপের" প্রভূত পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত ছিলেন। 'শ্রীরামপুর' হইতেই, এই "প্রদীপ", প্রজ্বলিত হইত। ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কোন এক দিনে "প্রদীপ" প্রকাশ পাইত না। সপ্তাহে সপ্তাহে এই "প্রদীপ" জ্বলিত। দ্বাদশ মাস ব্যাপিয়া, এই "সত্য-প্রদীপ" অবিচ্ছেদে জ্বলিয়াছিল। তাহার পর "প্রদীপ" নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছিল। স্নেহে (যত্নে) সকল পদার্থেরই সংবর্দ্ধনা হয়। আর, স্নেহেই (তৈলেই এবং যত্নেই) দীপও, উজ্জ্বল হইয়া থাকে। পাদরিদের স্নেহা-ভাবেই, এই "সত্য-প্রদীপ" প্রথমতঃ ক্ষীণজ্যোতিঃ হইয়া, বর্ষান্তে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

"প্রদীপের" আলোক-অবলোকনে অনেকেরই অতীব অনুরাগ জন্মিয়াছিল। "প্রদীপ"-সন্দর্শক-বৃন্দের সংখ্যা, বুঝিবার জন্য পাঠকবর্গকে আমরা, পশ্চান্নিবদ্ধ তালিকায় নেত্র-নিক্ষেপে অনুযোগ করি। যথা,—

† পশ্চাৎ যথাসময়ে দৃষ্ট হইবে, "শুভকরী" নামে এক পত্রিকা ছিল।

ক।	হিন্দু	...	১৭৬ (একশ ছিয়াত্তর) জন।
খ।	ইয়ুরোপীয়	...	৪৮ (আটচল্লিশ) জন।
গ।	মুসলমান	...	৪ (চারি) জন।
ঘ।	এ-দেশীয় খৃষ্টান	...	২ (দুই) জন।
	মোট সংখ্যা	...	২৩০ (দুই শত ত্রিশ) জন।

"সত্য-প্রদীপ" প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহে পরিপূর্ণ থাকিত। সংবাদ, প্রেরিতপত্র, প্রাকৃতিক বস্তু ও শিল্প জ্ঞানের বিবরণ ও তাহাদের চিত্রময় প্রতিরূপ—ইত্যাদিতে পত্রিকার কলেবর, সুসজ্জিত থাকিত। আকৃতি, কোয়ার্টো (Quarto) অর্থাৎ চারি-পৃষ্ঠা-পরিমিত। ৬ (ছয়খানি) কাগজে ৪ (চারি পৃষ্ঠায়) বিষয়গুলি, মুদ্রিত হইত। বার্ষিক দর্শনী ৬৲ (ষট্) মুদ্রা।

এই বৎসরের আরও ৩ (তিন) খানা সমাচার-পত্রিকার সমাচার না দিলে, পাঠক মহাশয়েরা, আমাদিগকে অব্যাহতি দিবেন না। সে গুলির নাম, যথাক্রমে বলিতে গেলে, অগ্রেই "সুধাংশু"-পত্রটী, স্মৃতি-পথে সমুদিত হয়। তৎপরেই "বর্দ্ধমান-চন্দ্রোদয়" এবং "বর্দ্ধমান-সংবাদ" মফস্বলের এই ২ (দুই) পত্রিকার নাম, উল্লেখ করিতে হয়। সুতরাং সংখ্যানুসারে—

(ক)। সুধাংশু।

(খ)। বর্দ্ধমান-চন্দ্রোদয়।

(গ)। বর্দ্ধমান-সংবাদ।

ইহাদের সঙ্গেই, ১২৫৭ সালকেও (১৮৫০ খৃষ্টাব্দকেও) বিষম বিপাকে পড়িয়াই, যেন বিদায় দিতে হইল। নিম্নে ঐ ৩ (তিন) বিবরণ দিলাম।

—*—

৭২। সুধাংশু।

(১২৫৭ সাল—১৮৫০ খৃষ্টাব্দ)।

"সুধাংশুর" কিরণ, বর্ষণ হইয়াছিল—এক বর্ষ-ব্যাপক কাল। কৃষ্ণমোহন বসুজ, "সুধাংশুর" জনক। খৃষ্টানি মতের পরিপুষ্টির নিমিত্তেই ইহার উৎপত্তি। সাহিত্যে ও সমাচারে উহার অঙ্গসৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

৭৩। বর্দ্ধমান-চন্দ্রোদয়।

(১২৫৭ সাল হইতে ১২৫৮ সাল পর্য্যন্ত

অর্থাৎ

১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত)।

রামতারণ ভট্টাচার্য্যের অধিনায়কত্বে "বর্দ্ধমান-চন্দ্রোদয়" অভ্যুদয় পায়। তিনি একাধিক বর্ষও, উহাকে সজীব রাখিতে সমর্থ হয়েন নাই। সুতরাং তদ্দ্বারা অধিকতর কার্য্য-সম্পাদন, কিরূপেই বা সম্ভাবিত হইবে ?

—*—

৭৪। বর্দ্ধমান-সংবাদ।

(১২৫৭ সাল—১৮৫০ খৃষ্টাব্দ)।

যেমনই "বর্দ্ধমান-চন্দ্রোদয়" প্রকাশিত হইতে থাকিল, অমনই "বর্দ্ধমান-সংবাদ" আসরে নামিলেন। তদানীন্তন বর্দ্ধমান-মহারাজ, এই নবপ্রকাশিত শিশুর লালনাদির ভার লইয়াছিলেন। কিন্তু, বড় মানুষের খেয়াল, কত কাল চলে ? আমরাই বলিয়া দিতেছি,উহার জীবনের সত্তা,বহুদিন বর্ত্তমান ছিল না।

—*—

এই আবার উত্তর-কালে (পরবর্ত্তী সময়ে) গিয়া উপস্থিত হইলাম।

৭৫। জ্ঞানোদয়।

(১২৫৮ সাল, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ)।

কোন্নগর-নিবাসী চন্দ্রশেখর কর্ত্তৃক "জ্ঞানোদয়" চালিত হইত। "জ্ঞানোদয়"- অধ্যয়নে কত লোকের কত উপকার হইয়াছিল, কিছুই জানিবার উপায় নাই। পরমায়ুর অল্পতা-হেতুই পত্রিকার ঐ দশা ঘটে। সম্পাদক এই "চন্দ্রশেখর" স্বনামখ্যাত "ব্রাহ্মধর্ম্মাশ্রিত" ডেপুটী কালেক্টার বাবু "চন্দ্রশেখর দেব" বৈ আর কেহই নহেন।

—*—

৭৬। জ্ঞানদর্শন।

(১২৫৮ সাল হইতে ১২৫৯ সাল পর্য্যন্ত

অর্থাৎ

১৮৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত)।

"জ্ঞান-দর্শনের" উদ্ভবস্থল। মতান্তরে—পবিত্র বারাণসীর কোন "লিথোগ্রাফ প্রেসে" "জ্ঞান-দর্শনের" অঙ্গরাগ ঘটিত। এই ঘটনা-দ্বয়ের মধ্যে কোন্ মতটী যে, সমীচীন, তাহার স্থিরতা নাই। নিশ্চয় জানিয়াছি—শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয়, "জ্ঞানদর্শনের" পরিচালনে ব্রতী ছিলেন।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

কালিন্দী।

রূপ-কথা।

(১)

"বাঙ্গালায় কি রূপসী নাই? কিংবা বাঙ্গালার পুরুষগুলা, অবগুণ্ঠনবতী কামিনী দেখিলেই, রূপের কলসী অনুমান করে; আমরা চিকের ভিতর হইতে, গাড়ীর খড়খড়ির মধ্য হইতে, থিয়েটারের শান্তিপুরে-জালের অন্তরাল হইতে, পুরুষসকলকে দেখি;—ভাল করিয়াই দেখি,—নিভৃতে মনে মনে একাগ্রচিত্তে দেখি—দেখিয়া, তুলনায় সমালোচনা করি। আমরা জানি, বাঙ্গালায় কয়েকটা পুরুষ সুন্দর, ও কয়েকটা কুৎসিৎ। কিন্তু পুরুষেরা কেমন করিয়া জানিবে—আমাদের মধ্যে কে রূপসী, কেইবা কুৎসিতা? গঙ্গা-স্নানের সময় তাহারা চপলা-বিকাশের ন্যায়, একবার এক নজর আমাদিগকে দেখিয়া লইতে চেষ্টা করে, কিন্তু দেখার মত দেখা হয় না। তাহারা—

কি জানি কি ঘুম ঘোরে
কি চোখে দেখেছি তোরে,—

এই ভাবে আমাদিগকে দেখে, আর কেবল সুন্দরী দেখে। এক একটা পুরুষ আবার এমন সৌন্দর্য্য-পাগলা যে, পুরুষমানুষকেই সুন্দরী সাজাইয়া তাহার সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথকে হরিদাসী বৈষ্ণবী সাজাইয়া, তাহার রূপে পাগল হইয়াছিলেন;—সে রূপ বর্ণনা করিতে করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের দেড়সের লাল-পড়িয়াছিল। গলায় দড়ি! বাঙ্গালাদেশে কি আর মেয়েমানুষ ছিলনা গা!

আবার এক রকমের পুরুষ আছে, যাহারা ঘোমটার উপর চটিয়া, অব-

স্ত্রীলোকের একচেটিয়া নহে, রূপবান পুরুষই। এই দলের মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার চাঁই। তিনি বলেন, পুরুষের দাড়ি আছে, গোঁপ আছে, পুরুষ সিংহের কেশর আছে, পুরুষ ময়ূরের নানা বর্ণের পাখা আছে, পুরুষ কোকিলের স্বর আছে, পুরুষ বুলবুলীর ঝুঁটি আছে, পুরুষ বৃষের ককুৎ আছে, পুরুষ হস্তির দাঁত আছে, সুতরাং পুরুষ সুন্দর, পুরুষ রূপবান। এ সকল কথা নিরাস-প্রাণের কথা। দেখনা, দেখিতে পাওনা, দেখিতে জাননা;—তাই বুঝনা, আমরা কেমন, কত সুন্দর! আমাদের মন হরণ করিবার জন্য, আমাদের সেবা করিবার জন্যই তোমাদের রূপ, তোমাদের ঐশ্বর্য্য! আমরা যাহাই হই না কেন, আমাদের পায়ের তলায় পড়িয়া থাকিবার জন্য তোমাদের জন্ম।"

(২)

"এইবার আমার কথা বলিব। আমার নাম কালিন্দী; আমার রূপ নাই, কেননা আমার আরসী আছে, সে মুকুরে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে আমি জানি, তাই বলিতেছি, আমার রূপ নাই। আমার কপাল আছে, কপোল আছে, নাক আছে, কাণ আছে, ঠোঁট আছে, অধর আছে, চক্ষু আছে, চিবুক আছে, গণ্ড আছে, বক্ষ আছে, শ্রোণী আছে, জানু আছে, আছে সবই, কিন্তু রূপ নাই; সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে কামিনীর যাহা যাহা থাকা আবশ্যক, আমার সে সব আছে, কেবল নাই রূপ। তাই আমার নাম কালিন্দী; এ বয়সে গর্দ্দভীর রূপ থাকে, অশ্বীরও রূপ থাকে, মানুষীরত থাকিবারই কথা; কিন্তু আমার নাই।—নাই বলিয়া তোমরা পুরুষ-পাঠক আমার এই রূপ-কথা না পাঠ কর, তাহা হইলে আমি দুঃখিত হইব না; এই দুর্ভিক্ষের দিনে, পূজার মরসুমে, বিসর্জ্জনের আন্দোলনে তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিবার আমার সাধ নাই। তাই আমার দুঃখও নাই।"

"আমার রংটা কাল, জুতার বুরুষের মত কাল নহে, রাণীগঞ্জের কয়লার চাপের মত কাল নহে, বাবুর মাথার পোমেটম মাখা চুলের মত কাল নহে, বাঙ্গালার জনকয়েক নাম-জাদা সাহিত্য-সেবির গায়ের চামড়ার মত কাল নহে, আমার কাল রং আমারই মত কাল। যখন তোমাদের গৃহিণী পূজার সময় অলঙ্কারের ফরমাইস্ করিয়া রোষবিকাশ করেন, তখন তোমরা যেমন কক্ষপূর্ণ অন্ধকার দেখ, আমার রংটাও তেমনি অন্ধকার মাখান।"

"বলাবাহুল্য, আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, আমার স্বামী আমাকে ভালবাসেন কি না? সে সংবাদ লইবার আমার অবসর নাই; তবে তিনি আমাকে প্রায়ই পাকানেবু রংঙ্গের বা জাফ্রাণের রংঙ্গের বোম্বাই সাড়ী এই পূজার সময় খরিদ করিয়া দেন; কাজেই আমি ভাবি, আমি কাল। আর আদর সোহাগের কথা যদি বল, পুরুষ ত সে সব কারে পড়িয়াই করিয়া থাকে, সুতরাং তাহার মূল্য নাই। আমার নাম কালিন্দী, আমার নিবাস কালীঘাটে, আমার পিতা কালী ঘোষ, আমার স্বামী কালাচাঁদ, আমি কাল নই? বিশেষ ইংরেজের আমলে আমাদের দেশটা কালা আদমীর দেশ হইয়াছে। কালা-কুলীর ঘরণী, কালিন্দী হইবেই ত! ভগিনি পাঠিকে (চটিও না ভাই) তোমরা পুরুষের মন-মজান কথায় আত্মহারা হইয়া আছ, আমার এ কাটা-কাটা বুলী তোমাদের ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু সময় বিশেষে সত্য কথা শুনিয়া রাখা ভাল। আমি কুরূপা।"

(৩)

"স্বামী আমার উকীল। পূজার ছুটিতে তিনি বাড়ী আসিয়াছেন, আসিয়াই থিয়েটার দেখিবার ঝোঁক হইয়াছে, বিশেষতঃ শ্যালিকা, শ্যালকজায়া প্রভৃতির তাঁহার উপর একটা অধিকার আছে, সেই অধিকার জন্য আব্দারও চলে, সেই আব্দার রক্ষা করিবার জন্য, থিয়েটার দেখিবার কথা স্থির হইল। আমরা "কৃপণের ধন" অভিনয় দেখিতে যাইব, দুইখানি গাড়ীও ভাড়া করা হইল, একখানিতে বালক-বালিকা ও প্রবীনারা যাইবেন, অন্য-খানিতে আমি ছোট-দিদি, মেজ বউ, এবং আমার স্বামী, এই কয়জন যাইব; এই ব্যবস্থামত দুইখানি গাড়ীও ছাড়িল, কালীঘাট হইতে হাতি-বাগান বহুদূর, ঘোড়ার গাড়িতে যাইলেও এক ঘণ্টা লাগে; এই এক ঘণ্টার মধ্যে আমি বুঝিয়াছিলাম, যে আমি কুরূপা, কেননা আমার অবগুণ্ঠন ছিলনা, বিশেষ আমার অবগুণ্ঠন-অন্তরালস্থিত আমার যাবৎ বৈভবই স্বামির সুপরিচিত, আর মেজ-বউ, ঘোমটা টানিয়া মুচ্‌কি হাসির চন্দ্রিকা ছড়াইয়া নন্‌দাইএর সম্মুখে গাড়িতে বসিয়াছে, সেত কখন মুকুরে মুখ দেখে না, তাই তাহার লাবণ্য নবশিশির সিক্ত সেফালীর ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে চারিদিকে যেন ছড়িয়া পড়িতেছিল। আমার স্বামী বুঝিয়াছিলেন, সে সুন্দরী, তাই আমিও বুঝিয়াছিলাম, সে রূপসী লাবণ্যময়ী। বিশেষ আমি ভয় বিহ্বলা হইয়াছিলাম, আমার "কৃপণের

সুন্দর দেখিয়াছিলাম, সুতরাং আমি যে কুরূপা, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

"পরদিন প্রাতে আমার স্বামী ট্রঙ্ক খুলিয়া আমাকে একখানি বেনারশি কাপড় দিলেন, সে কাপড়ের রং বসুন্তি, একটি ভাল মখমলের সল্মার কাজ-করা বডি দিলেন, মখমলের রং বেগুণে, আমি বুঝিলাম, আমি কাল।"

(৪)

"দেবী পক্ষের পূর্ব্বে অপর পক্ষ বা তর্পণ পক্ষ, কেন হয় জান? আমি দাসী হইলেও দেবীর মর্ম্ম বুঝি, তাই সে কথাটা আগে বলি। এখন যে রকম ঘরে ঘরে দেবীর পূজা হয়, তাহাতে পিতৃপুরুষের শুষ্কমুখে তিলাঞ্জলি দানটা পূর্ব্বেই করিয়া রাখা ভাল। নইলে সে কাজটা সারা বছর আর হইবে না, দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিলে হওয়া সম্ভবও নয়। দেবীর আরাধনা শুক্লপক্ষে হয়, তাই গৃহদেবী যাহাই হউন না কেন, তিনি চারুচন্দ্রিকা দীপ্তি-ময়ী, আর পিতৃকার্য্য কৃষ্ণপক্ষে হয়—কালা আদমীর কার্য্য কি না!"

"পূজা আসিয়াছে, স্বামীও নিকটে আসিয়াছেন, জেলা আদালতের ছুটিও একমাসব্যাপী, কিন্তু ঐ দেখনা, তিনি দারজিলিং যাইবেন বলিয়া গ্লাড-ষ্টোন ব্যাগে কাপড় গুছাইতেছেন। তবে কেন না বলি, আমি কুরূপা! দারজিলিঙ্গে তুহিন বিমণ্ডিত চিরস্থায়ী কাঞ্চনজঙ্ঘা আছে, তুহিন-ধবল-কান্তি বিদেশিনী বিহার করিতেছে, সে দেশে পুরুষ যাইবে না কেন? আবার এখনও কি বলিব, আমি কুরূপা!"

"কিন্তু আমার রূপ আছে, সে রূপ আমার রূপ কি আমার অবগুণ্ঠনের রূপ, জানিনা, কিন্তু পাড়ার অনেক মরকটই অবগুণ্ঠনবতী আমার প্রতি কি জানি কেমন ভাবে মাঝে মাঝে তাকাইয়া থাকে। যখন তাকায়, তখন আমাতে দেখিবার কিছু আছে। পুরুষের রূপ দেখিবারই আকাঙ্ক্ষা, যখন আমাকে দেখিয়া রূপের অন্বেষণ করে, তখন বোধ হয়, আমাতে রূপ আছে, কিন্তু সে রূপ সংসারে দৃষ্টিতে বি—রূপ, কাজেই ভয় হয়, আমার রূপ নাই!"

রূপের কথা এত বলিলাম কেন, জান? পুরুষ-লিখিত নাটক নভেল প্রভৃতি সকল পুস্তকেই স্ত্রীলোকের রূপ-বর্ণনা বাহুল্য দেখা যায়। আর আমার এই কামিনী-কলম-কলঙ্কিত কালিন্দী-কথায় রূপের উল্লেখ কেননা থাকিবে! পুরুষ নিজের রূপ বর্ণনা করে না, আমি কিন্তু আমার রূপের বর্ণনা করিলাম।"

(৫)

"স্বামী দারজিলিং গিয়াছেন, আজ পূজার পঞ্চমী, পোটো মায়ের মুখে ঘাম তেল মাখাইতেছে, ফরাস পাল টাঙ্গাইতেছে, পূজার দালান পরিস্কৃত পরিমার্জ্জিত হইতেছে, বাড়ীতে সকলেই ব্যস্ত, কাজ নাই কেবল আমার। আমি পুত্রবতী নহি, আমার বড়দাদা বিপত্নীক, তাহার পুত্র নাই, মেজ বউ আমার মতন,—মেজদাদা এখনও বিদেশ হইতে বাড়ী ফিরেন নাই; সুতরাং আমাদের কাহারই কোন কাজ নাই। পূজার কার্য্যে জেঠাইমা খুড়ীমা মা,—বর্ষীয়সী সকলেই ব্যস্ত আছেন, আর আমরা নিজেদের বয়স লইয়া বসিয়া আছি, কাজেই বলিতে হয়, আমি কুরূপা; মেজ বয়ের খবর কেন দিব, সে নিজের ভাবেই নিজে মগ্ন আছে, আর যদি মেজদাদা বাড়ী আসিয়াই দারজিলিং বেড়াইতে যাইত, তাহা হইলে বলিতাম, মেজবউও কুরূপা।"

"পঞ্চমীর সন্ধ্যার সময় মেজবয়ের নামে একখানি পত্র আসিল, লেফাফার উপর হস্তাক্ষর দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম, কারণ সে হস্তাক্ষর আমার স্বামীর, পত্রখানি পাঠ করিয়া মেজ বউ আমাকে দেখাইল, আমি কুরূপা কালিন্দী বলিয়াই দেখাইল। পত্রে লেখা আছে, "মেজ বউ, আসিবার সময় তোমার মুখখানি দেখিয়া আসিতে পারি নাই, তোমায় কিছু দিয়া আসিতে পারি নাই, অপরাধ লইওনা, দারজিলিং হইতে কোন্ সামগ্রী লইয়া যাইলে তুমি সুখী হও, পত্র পাঠ আমাকে লিখিয়া পাঠাইবে" ইত্যাদি ইত্যাদি। বল দেখি ভাই, এখনও কি আমি সুন্দরী!

"পরদিন ষষ্ঠির প্রাতঃকালে নগেন্দ্র আমাদের বাড়ী আসিল, নগেন্দ্র আমার শ্বশুরের প্রতিপালিত দরিদ্র সন্তান; দূর সম্পর্কে শ্বশুরের ভাগীনেয়। নগু ঠাকুরপো আসিয়াই হাত মুখ না ধুইয়াই আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "বউঠাকরুন, আপনাকে আজ আমার সঙ্গে সুক্‌চরে যাইতে হইবে, আমি টানা গাড়ীতে লইয়া যাইব।" এ কথার উপর উত্তর নাই, হিন্দু রমণীর শ্বশুর গৃহই সর্ব্বস্ব, সুতরাং আমাকে সেই দিনেই যাইতে হইল।

"আবার সেই ঘোড়ার গাড়ী! একদিন সন্ধ্যার সময় এই ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া মেজবউকে বড় সুন্দরী দেখিয়াছিলাম, আর আজ অপরাহ্ণে ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়া নগেন্দ্রকে অতি সুন্দর দেখিতেছি, এক একবার মনে হইতেছে, যে আমার এই পাঁস ঢাকা কুরূপ কোথাকার মলয় পবনের ফুৎকারে

"কেন এমন হয়;—অতি-পরিচয়ে রূপের অভাব-বোধ,অপরিচিতের কাছে রূপের এমন প্রভাব বোধ—কেন হয়? পথে যাইতে যাইতে নগেন্দ্র একবার আমাকে বলিয়াছিল, "বউ, তোমার নাম কালিন্দী কেন হইল, তোমার ত বেশ রূপ, দাদাই বা দারজিলিং গেলেন কেন?" এই কথাগুলি শুনিয়া শুষ্ক ভূমিতে জলবিন্দু পাতের মত কি যেন একটা স্নেহশিক্ত শীতল ভাব হৃদয়ের মধ্যে ডুবিয়া গেল। আমি মরিলাম—রূপে মরিলাম, মোহে মরিলাম, ক্ষোভেও মরিলাম।"

"পূজার তিন দিন শ্বশুর-গৃহে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া থাকিতে হইল; আর বাড়ীর সকলে আমার রূপের ব্যাখ্যা করিতে লাগিল, আমার শাশুড়ী পাড়ার প্রতিবেশিনীগণের কাছে কেবলই বলেন, "বউমার আমার কেমন মাজা রং, কেমন মানান সই গড়ন, ধীর চলন, বড় বড় চোখ, পাতলা পাতলা ঠোঁট, আর অষ্ট প্রহরই ভয়ে যেন জড়সড় হইয়া আছে। মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।" আমি শাশুড়ীর মুখে এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বের মত আরসীতে মুখ দেখিতে ভুলিয়া গেলেম, শাশুড়ীর দেখান প্রতিবিম্ব অহরহ আমার নয়ন-কোনে নাচিতে লাগিল। আর নগেন্দ্র, সে কেবলই আমার প্রতি চাহিয়া থাকে, এক গলা ঘোমটার মধ্য হইতে সে দৃষ্টির ভঙ্গি দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু সকল সময় তাহা বুঝিতে পারি। তবে কি আমি রূপসী।—না, না—আমি পোড়ার মুখী!"

"সকলের পকেটে ঘড়ী থাকে, কিন্তু সকলের ঘড়ি এক যায় না, একটু তফাৎ চলে। সকলের কপালের উপর এক জোড়া চক্ষু আছে, কিন্তু সকলের চক্ষুই এক সামগ্রী, এক সময়ে এক দেখে না, একটু তফাৎ দেখে। আমার রূপও—কাপড়-ঢাকা বলিয়া সকলে সমান দেখিত না; আমার স্বামী যাহা দেখিতেন, নগেন্দ্র তাহা দেখিত না, আমার মা যাহা দেখিতেন, আমার শাশুড়ী তাহা দেখিতেন না। গোল ত এইখানেই;—সর্ব্বনাশ ত এই বৈষম্যেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বৈষম্যই মনুষ্য-সমাজের ব্যবস্থা। বৈষম্য-বৈচিত্র লইয়াই মনুষ্য চরিত্রের পুষ্টি; আমার পোড়া কপাল যে, আমি মানুষ, রক্তমাংস দিয়াই আমার দেহ গঠিত।"

"আর আমার রক্তমাংসের দেবতা, আমার ভিক্ষার ঝুলি, দারিদ্র্যের ছিন্ন কন্থা, পিপাসিত পথিকের জলপাত্র, অন্ধের যষ্টি, ইহকালের ঐশ্বর্য্য, পরকালের সুখ—আমার স্বামী এখন দার্জ্জিলিঙ্গে। আমার খেলা ঘরের পুতুল,

বাক্সের আতরের শিশি, চক্ষের অঞ্জন, সীমন্তের সিন্দূর, অঞ্চলের চাবি, হৃদয়ের নিধি, আমার স্বামী এখন দার্জিলিঙ্গে! আর আমি বাপের আদরের মেয়ে, শাশুড়ীর সোহাগের বধূ, প্রতিবেশিনীর গৌরবের ধন, নগেন্দ্রের ইপ্সীত পারিজাত কুসুম—আমি সোহাগে গলিয়া নর্দ্দামায় গড়াইয়া পড়িলাম। আকাশের শিশির বিন্দু হইয়া ক্লেদ-কর্দ্দমে মিশিলাম।"

(৬)

"যাহা আমার নয়, তাহাই কি মিষ্টি? যাহা পূর্ব্বে পাই নাই, তাহাই ত অপূর্ব্ব। মেজবউ আমার স্বামীর দৃষ্টিতে অপূর্ব্ব, আর আমি আমার দৃষ্টিতে অপূর্ব্ব,তাই আমার সর্ব্বস্ব,আমি ধূলি মুষ্টিময় বায়ুপ্রবাহ-মুখে উড়াইয়া দিয়াছি।

যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিয়াছে, যাহা নিয়তিতে ছিল, তাহাই হইয়াছে।

কিন্তু এমন কেন হয়? তোমরা পুরুষ, তোমাদের জন্য সংসার, তোমাদের জন্য আমরা—তোমরা কেন এমন হইতে দাও? নাটের গুরু নটবর,কখন ফুল মাথায় রাখে,কখন বা সেই ফুল ছিঁড়িয়া দেখে; আমাকে এখন সংসার ছিঁড়িয়া দেখিতেছে। ছেঁড় তোমরা, দেখও তোমরা, শেষে নিন্দা করও তোমরা। আর সেই নিন্দার প্রতিশোধ-স্বরূপ প্রেতনীর আকার ধারণ করিয়া আমরা সমাজের স্কন্ধে অজমুণ্ড বসাইয়া দিই, এবং মনুষ্য মস্তকটি লইয়া চিবাইয়া খাই। দোষ কাহার? দোষ ত আমার নয়, আমি সংসারে ছিলাম, এখনও আছি, আমাকে সংসার যেমন করিয়া গড়িয়াছে, আমি তেমনিই হইয়াছি। যে সংসারে আমার স্বামীর স্থান ছিল, সেই সংসারে নগেন্দ্রও ছিল; যে সংসারে আমার মা ছিলেন, সেই সংসারে আমার শ্বশ্রূও ছিলেন, আর সেই সংসারে আমিও আছি। তাই কি আমি এমন হইলাম?"

"তোমরা সকলে হাততালি দিয়া আমাদের নাচাইও না—নাচিতে আরম্ভ করিলে আমরা সমাজ-হৃদয়কে মথিত করিয়া ফেলিব।"

"আমাদের ভরসা শ্রীগৌরাঙ্গ, কেননা পতিতের অবলম্বন শ্রীগৌরাঙ্গ। যিনি পিশাচীকে নাম-সুধাপানে অধিকার দিয়াছেন, তিনিই আমাদের ত্রাণের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন। তোমরাও পতিত—শিক্ষার দোষে সময়ের দোষে তোমরা পুরুষ-বেশ্যা। বারাঙ্গনা-বিলাস-বিভ্রম-বিমূঢ়তায় পুরুষ দিশে-হারা;—আর পতিত পুরুষের কামকটাক্ষ কজ্জলে আমরা চির-কলঙ্কিনী।"

আমাদের উভয়ের ভরসা কলির দেবতা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

পার্ব্বত্য-পদাবলী।

অনেকের স্থূল সংস্কার এইরূপ, সমস্ত ছোটনাগপুর প্রদেশ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি পূর্ণ অরণ্যে ও পর্ব্বতমালায় সমাকীর্ণ। ঐ সকল অরণ্যে ও পার্ব্বত্য প্রদেশে যে সকল লোক বাস করে, তাহারাও অরণ্যজন্তুবৎ অজ্ঞান ও অসভ্য;—যৎসামন্য কৃষি ও শিল্পের অনুষ্ঠান দ্বারা কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ছোটনাগপুরের অন্তর্গত মানভূম, বরাভূম, পাতকুম প্রভৃতি স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি অনেকগুলি রাজা আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও শিক্ষা-দীক্ষা-ধর্ম্ম-কর্ম্মবিহীন পশুরাজবৎ অসভ্য জনগণের অধিপতি মাত্র। তবে কয়েক বৎসর হইতে সুসভ্য ইংরাজের কল্যাণে তথায় স্কুল-পাঠশালার সৃষ্টি হওয়ায় সাধারণ সুশিক্ষার বিস্তার হইতেছে, এবং বহুকাল হইতে অন্ধতমসাবৃত অরণ্য ও গিরিকন্দর মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এরূপ নহে। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, তত্রত্য নরপতিগণের রাজ্যাধিকার অল্পায়ত হইলেও তাঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয় এবং তাঁহাদিগের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, রাজনীতি সকলই পূর্ব্বতন হিন্দুরাজ-গণের সদৃশ। সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ দরিদ্র ও তাহাদিগের বর্ত্তমান আচার-ব্যবহার কিয়ৎ পরিমাণে ভ্রষ্ট হইলেও তাহাদিগের মধ্যে এককালে সুশিক্ষা ও সদ্ধর্ম্মের আলোচনা ছিল, তাহার ভূরি নিদর্শন অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় সেই প্রদেশের স্থানে স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে।

সম্প্রতি আমরা পুরুলিয়া জেলার নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া ঐ নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অধিকন্তু এরূপ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে, যাহারা এখন অরণ্যবাসী অশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, এককালে তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা সংস্কৃত হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন, এবং পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের উচ্চ সোপানে উপবিষ্ট হইয়া প্রেমধর্ম্মের অনুশীলন করিতেন। ঐ জিলার অধিকাংশ লোকই আপনাদিগকে বৈষ্ণব এবং শ্যামানন্দের পরিবার বলিয়া স্বীকার করে। কিন্তু শ্যামানন্দ কে, তাহার কিছুই তাহারা অবগত নহে। ঐ প্রদেশের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায় এরূপ কোন পুস্তকাদি, কি কোন প্রকার নিশ্চিত নিদর্শন কিছুই তাহারা দিতে পারে না; কেবল রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক কতকগুলি পদ অশুদ্ধ ভাষায় মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারে। ঐ সকল পদ আলোচনায় জানা যায়, বর্জ্জু বা ব্রজনাথ, দীনু বা দীননাথ,

নরু বা নরোত্তম, রঘুসিং, গৌরসিং প্রভৃতি কয়েকটী পণ্ডিত ও কবি ঐ জিলায় বিদ্যমান ছিলেন, এবং তাঁহারা নিতান্ত প্রাচীন নহেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা কয়েটী পদ, পদকর্ত্তাগণের জীবিতকাল নিরূপণের সহিত প্রকাশ করিলাম।

ঐ পর্ব্বতময় আরণ্য প্রদেশে কিরূপে উচ্চ অঙ্গের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল, বোধ হয়, তাহা জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস স্বরচিত কোন পদের মধ্যে বলিয়াছেন,—

"—ভকত কল্পতরু, অন্তরে অন্তরু,
রোপই ঠামহি ঠাম।—"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কলিজীবের কুশলকামনায় ভক্তরূপ কল্পতরু সকল স্থানে স্থানে রোপণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রেরণায় অন্যতম 'ভক্তকল্পতরু' শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু উড়িষ্যা ছোটনাগপুর প্রভৃতি দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্যামানন্দ এবং তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য রসিকানন্দ প্রভৃতি দ্বারাই ছোটনাগপুর অঞ্চলের লোকেরা প্রেমময় বৈষ্ণবধর্ম্ম পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ-পাঠে জানা যায়, শ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীনিবাস আচার্য্য এবং নরোত্তম ঠাকুর এই তিনজনে এক সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তিন জনেই একসঙ্গে দেশে আসিয়া, শ্রীনিবাস বাঁকুড়া অঞ্চলে, নরোত্তম মালদহ অঞ্চলে এবং শ্যামানন্দ উড়িষ্যা অঞ্চলে অবস্থান করেন। এই ঘটনা ন্যূনাধিক সার্দ্ধত্রিশত বর্ষ পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

নিম্নলিখিত পদটী রাজা রঘুনাথ সিংহ বিরচিত, ইনি পুরুলিয়ার অন্তর্গত জয়পুরের রাজা ছিলেন। রঘুনাথ সিংহ বর্ত্তমান উনিশ শত খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল পদাবলী তত্তদ্দেশে ঝুমুর নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শ্রীরাধার বিরহ বর্ণন।

যবে হরি পুরী মথুরা গেল, দুখ দিয়ে তনু ধিক ভেল;
সব সুখ গেও দূরে।
এ নব যৌবন বিফলে গেল, ভাবি গুণি তনু ঝুরে গো
আজ মোর নাগর মনে পড়ে॥ ধুয়া॥

আর কারি বামে দিয়ে গো ঠেশ, উরুতে বসিয়া বাঁধিব কেশ,
অভাগিনী পাপিনীরে।
আইস বিরহিনি,　　শ্যাম সোহাগিনি,
আনিয়া বসাইত কোরে গো।
করে (?) যখন হইত মান,　কাতরে ধরণী লোটাইত শ্যাম,
গৌরবে না হেরি তারে।
সেই অভিশাপ ফলল সজনি, পিয়া ছাড়ি গেল মোরে গো।
শুনলো সজনি বচন সার,　ব্রজে কি নাগর আসিবে আর,
মুঝে তেজল নটবরে।
গাওত রঘুনাথ নৃপতি সাজত হলধরে গো
শ্যাম সাজত হলধরে॥

নিম্নলিখিত পদটী গৌর সিংহের রচিত। এই গৌরসিংহ শিলির রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শিলিনগর পাতকুম হইতে বিশ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। অনুমান পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন।

কলহান্তরিতা নায়িকার প্রতি সখীবাক্য।

মান গৌরবি দুর্জ্জয় মানী মানেতে কি মন মজিল।
সাধের মান কি করিলে গো মন-মোহিনি।
(এখন) দগধনে মনবেদনে প্রাণ যাইতে বসিল॥ ধুয়া॥
ত্রৈলোক জীবন, শ্যাম নবঘন, যখন চরণে পড়িল—
তখন দুনয়নে না হেরিলে গো (মনমোহিনী)।
বিমুখ হ'য়ে, শ্যাম কান্দিয়ে, তোমার নিকট তেজিল।
এখন বিরহ জ্বলিল গো (মনমোহিনি)।
তুমি বল শ্যাম আনিতে, মোদের সাধ্য না হৈল—
তখন গৌরাঙ্গিয়া কি বলিল গো (মনমোহিনী)।

এই পদটী বর্জ্জু বা ব্রজরামের রচিত, ইনি জাতিতে তন্তুবায়, ইহার প্রপৌত্রগণ এখন বর্ত্তমান আছেন। ঐ দেশীয় তন্তুবায়গণ প্রকাশ্যরূপে কুক্কুট মাংস ও পলাণ্ডু ভোজন করিয়া থাকে। তন্তুবায়গণ অতিশয় নিম্নশ্রেণীর

গৌর-সন্ন্যাস।

পূর্ণিমার নিশি ছিল কৃষ্ণপক্ষ ক'রে গেল,
বিষ্ণুপ্রিয়া মা জননী কেন্দে কেন্দে আকুল হ'লো।
সোণার বরণ গৌর চান্দ আমার কোথায় গেল॥ ধুয়া॥
গৌরকে দেখেছ যা'তে, পদচিহ্ন আছে পথে?
কাল সকালে নিশিভোরে ও মা বোলে ডেকে ছিল।
ভারতে কি জন্যে এল, কিবা মন্ত্র দিয়ে গেল,
রাধার ভাবে অনুরাগে চাঁচর কেশ মুড়াইল॥
বলে ব্রজরাম বাণী, শুন মাতা ঠাকুরাণী,
তোর গৌরকে দেখে এলাম ন'দেয় দণ্ডধারী হ'ল॥

পূর্ব্বোক্ত ব্রজরামের পুত্র গোবিন্দরামের একটী পদ।

মান।

ললিতা বলিছে বাণী, শুন গো রাই কমলিনি,
আইল চিকণ কালা কমল নয়নে।
মান কর কেনে, হের গো রাই শ্রীবংশী বদনে॥ ধুয়া॥
শিরে শিখিপুচ্ছ চূড়া, তায় বন-ফুল বেড়া,
শ্রীঅঙ্গে চন্দন পীতাম্বর পরিধানে।
গলেতে বসন করি, দাড়া'য়ে রয়েছেন হরি,
বহিছে প্রেমের ধারা সেই কমল নয়নে॥
কেনে গো করিলে মান, (প্যারি) যা বিনে না বাঁচে প্রাণ,
অধম গোবিন্দ বলে সেবি সে চরণে॥

নরোত্তম, দীননাথ প্রভৃতির পদগুলি বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীকালিনাথ নাথ।

নিধিরামের দুর্গোৎসব।

পঞ্জিকায় এ বৎসর ভারি গোল। কয়েকখানি পঞ্জিকার মতে দুই দিন পূজা, নবমীতে বিসর্জ্জন; কোন কোন পণ্ডিতের মতে ব্যবহারসিদ্ধ তিন দিন পূজা, দশমীর প্রভাতে বিসর্জ্জন। নিধিরাম এখন কি করিবেন? বাড়ীতে প্রতিমা নির্ম্মিত হইয়াছে, পূজা অবশ্যই করিতে হইবে, দুর্গাভক্ত সাহেববিবিগুলিকেও অবশ্য আমন্ত্রণ করিতে হইবে; কিন্তু কোন্ মতে?

নিধিরাম বাবু কোন প্রকার মতামতের ধার ধারেন না; নিজের মতেই কার্য্য করিতে ভালবাসেন। এ বৎসর পঞ্জিকার মতে পূজা করিতে পারিবেন, কিন্তু বিজয়াতে যখন গোল, তখন তিনি কোন মতেই বিসর্জ্জন করিতে পারিবেন না;—বিসর্জ্জন করিবেন না। তবে তিনি কি করিবেন?

নূতন প্রকারে নিধিরাম ঠাকুর মহানবমীর দিন মা দুর্গার একটী স্তব করিবেন। দিন থাকিতে থাকিতে সেই স্তবটী তিনি রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। ১৩০৭ সালের নূতন পঞ্জিকার গণনায় ১৭ই আশ্বিন বুধবার নবমী ৫ দণ্ড ২৯ পল ১৮ বিপল। ঐ সময়ের মধ্যেই মহানবমী পূজা, বলিদান, এবং হোম সমাপন করিয়া নিধিরাম মহাশয় মা দুর্গার স্তব করিবেন; বিসর্জ্জন করিবেন না। নিধিরামের স্বরচিত স্তবটী নিম্নভাগে বর্ণবদ্ধ করা হইল।

নিধিরামের দুর্গাস্তোত্র।

শারদে! অভয়পদে নমি নতশিরে,
হৈমবতি! বিশালাক্ষি! হরমনোহরা,
ভবানি! ভবেশজায়া, মহিষমর্দ্দিনি!
কৃপাময়ি! কৃপাদৃষ্টি কর দীনদাসে।
মা তোমার আশীর্ব্বাদে করি সমাপন—
শারদীয়া মহাপূজা, সুখদ শরতে,
ভক্তিভাবে ভবরাণি! শঙ্করমহিষি!
নবমী আজি মা দুর্গে! মহাপুণ্য-তিথি!
পঞ্জিকার পণ্ডিতেরা শাস্ত্রসিন্ধু মথি,
বিধি দিয়াছেন দেবি! এ নব বৎসরে—

নবমীতে বিসর্জ্জন হবে মা তোমার !
এ কি বিড়ম্বনা মাগো, দুর্গতিনাশিনি ?

একি মা আনন্দময়ি ! আনন্দপ্রসূতি
ভবে তুমি, ভবাঙ্গনা, দেবী মহামায়া,
নিরানন্দ আনিবে কি নবমী বিকালে ?
মহোৎসবে মহালক্ষ্মি ! হবে কি বিজয়া ?
হয় হোক্, ইচ্ছা তব, ইচ্ছাময়ী তুমি ;
কে লঙ্ঘিবে তব ইচ্ছা, এ ভবসংসারে ?
যে পারিবে সে করিবে বিজয়া-নবমী,
বিজয়া দশমী বাক্য ভুলিবে যাহারা,
নিষ্ঠুর তাহারা তারা, ইহ বঙ্গভূমে !
আমি কিন্তু পারিব না (ক্ষম ক্ষেমঙ্করি !)
আচরিতে নিষ্ঠুরতা কভু পারিব না
নবমীতে মা তোমারে দিতে বিসর্জ্জন !
বিসর্জ্জন করিব না, রাখিব মন্দিরে।
দ্বিতীয় বরষে দেবি, পূজিব আবার,
ভবের ভকতবাঞ্ছা রাঙা পা দুখানি !

থাকো মা কৈলাসেশ্বরি ! দাসের ভবনে,
যেওনা কৈলাসে দেবি, এ মম মিনতি !
অসভ্য এ বঙ্গদেশ, গণেশ কার্ত্তিক
অসভ্য রূপেতে দেখা দেন চিরদিন ;
মূষিকবাহনে চড়ি ফুলাইয়া ভুঁড়ী,
শুঁড় নেড়ে খেতে যান কদলীর পাতা,
(কলাবউ লজ্জা পান ঘোম্‌টা টানিয়া,)
এই কাজে পটু মাগো, তব গজানন !
পক্ষীপৃষ্ঠে আরোহিয়া উড়িয়া উড়িয়া,
বেড়ান কার্ত্তিক বীর, ধনুঃশর করে !

অসভ্য পাহাড়ী বন্য, কার্ত্তিক গণেশে
বিলাতে পাঠাব আমি সভ্য করিবারে!
ভাল ভাল স্বর্ণকেশী সুন্দরী সুন্দরী—
বিবি বিয়ে করাইব, পরাইব হ্যাট্।
পালাবে পিকক্ পাখী, লুকাইবে র‍্যাট্।

কলামুখী কলাবউ, সাজিবেন বিবি।
খুলিবেন গণপতি, বিবিদের লিবি।
ষড়ানন ইঙ্গভূমে তুষি ইঙ্গগণে,
অবশ্য দিবেন তথা ব্যারিষ্টারী পাশ!
অথর্ব্ব গণেশ দাদা, সাদাদের দলে,
লভিবেন ইহবঙ্গে সিবিল সার্ভিস্।
কত সুখী হবে তুমি হিমাদ্রি-নন্দিনি!
হেরিয়া তনয় দুটী বৎসরেক পরে!
তোমারেও মহাদেবি! সুবেশে সাজাব।
ছি ছি মাগো একি সজ্জা! ও বরাঙ্গ তুমি,
ঢাকিতেছ বঙ্গে এসে ডাকের ভূষণে!
কি লজ্জা! গিরীন্দ্রবালা! নিধিরাম আমি,
মহানিধি দিয়ে আমি সাজাব তোমারে,
দূর করি ফেলে দিব ডাকের গহনা;
গাউনে ঢাকিব বপু, কষিত কাঞ্চন,
বনেটে সাজাব দুর্গা মস্তক তোমার;
কত ফুল, কত পাখী, শোভিবে বনেটে,
কত শোভা বিকাসিবে তব চন্দ্রানন।

যেওনা মা হরধামে, করি নিবারণ,
থাকো মা আমার ঘরে বৎসরের তরে,
বাসনা পুরাও মাগো, এই আকিঞ্চনে—
কাতরে মিনতি করে ভক্ত নিধিরাম।

নিধিরাম আমি দেবি! সিদ্ধিবিধায়িনি,
সিদ্ধ কর সিদ্ধেশ্বরি! মনের বাসনা।
অহরহ পূজিব মা শ্রীপদ তোমার,
বিজয়া আমার নাই বিজয়া পিপাসী—
নহি আমি সুরেশ্বরি! বিজয়া উৎসব
করেছিলা রামচন্দ্র ত্রেতা অবতারে,
বধিবারে লঙ্কেশ্বরে সমুদ্রপুলিনে,
পূজে ছিলা যবে দুর্গা; অকালে বোধন
সঙ্কল্পিয়া ষষ্ঠীদিনে ভক্তি উপচারে,
দশভুজা দেবীমূর্ত্তি মঙ্গলরূপিণী;
দশমীতে করেছিলা বিজয়া তোমার,
বিসর্জ্জিয়া সিন্ধুজলে সোণার প্রতিমা!
পুণ্যবান পুণ্যভূমে দাশরথী রাম,
নিধিরাম সে রামের দাসযোগ্য নয়!
রামদাস ছিল যত ভল্লুক বানর।
নিধিরাম রামদাস হইতে কলিতে;
করিতেছে বড় সাধ; কিন্তু মা বিজয়ে!
বিজয়াটী করিবে না তৃতীয় দিবসে।

রাখিব প্রতিমা তব পূর্ণ সম্বৎসর,
হনুমান সম রব ভূমে লুটাইয়া;
পুষ্পাঞ্জলি দিব পদে মাথায়ে চন্দন,
থাকো মা সদয়া হয়ে দাসের কুটীরে।
ভাগ্যবতী কলাবউ এ নব বৎসরে
প্রসবিবে মোচা ফল ফলিবে কদলী,
টপাটপ থাব কলা লুফিয়া লুফিয়া,
বড় রম্ভা বড়ই খাইতে ভালবাসি।
পঞ্জিকা ভাসায়ে দিব সাগরের জলে,
নবমীতে বিসর্জ্জন হবে না ধরায়,
যেওনা কৈলাসাচলে কৈলাসবাসিনি!

তব সহ থাকিবেন দেব শূলপাণি
মহেশ্বর ; কৃপা করি নিধিরাম ধামে।
বিহর মহেশরাণি ! আশ্রমে আমার,
হৃদয় পাতিয়া দিব কোকনদ পদে,
আরাধিব মহাদুর্গা এই আকিঞ্চন।
থাকিবেন বীণাপাণি, জলধি দুহিতা
লক্ষ্মী ; মহাবিশালাক্ষি চঞ্চলা কমলা ;
থাকিবে মহিষাসুর, থাকিবে কেশরী,
থাকিবে শ্রীপদপ্রান্তে ইন্দুর ময়ুর ;
সবারে করিব পূজা মনের উল্লাসে,
কৃতার্থ হইয়া যাব প্রসাদে তোমার।

বিলাত হইতে ফিরি আসিবেন যবে,
কালাপাণি পার হয়ে জাহাজে চড়িয়া,
বিলাতি পোষাক পরি গুহ গজানন,
হাটে বিভূষিয়া শুণ্ড, কোটে চমকি ভুঁড়ি,
কিবা শোভা ধরিবেন ঠাকুর গণেশ ;
হাট কোটে শোভিবেন কুমার কার্ত্তিক,
ব্যারিষ্টারি পাশ দিয়া ঝুলায়ে গাউন,
ধনুঃশর তেয়াগিয়ে ধরিবেন ব্রিফ্,
তোমার চরণে আসি করিবেন নতি।
লবেন আমার পূজা প্রফুল্লবদনে,
সর্ব্বরূপ হেরিব মা সর্ব্ব সুখময়,
সম্মুখে নাচিব আমি ফুলায়ে লাঙ্গুল।
লাঙ্গুল ভরসা মম লাঙ্গুলী উপাধি
পাইয়াছে কবি করে বীর হনুমান,
আমিও তাহাই দুর্গে, তব শ্রীচরণে
রামদাস রূপীদাস, ক্ষুদ্র হনুমান।
নাম শুধু নিধিরাম, দেহ মানবের
এই মাত্র ভেদ ভিন্ন ভাবান্তর নাই।

তাই বলিতেছি মাগো, দাসে কৃপা করি
থাকো মা ভবানীপুরে, শঙ্করী ভবানি !

চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে শ্রীদুর্গা পূজায়,
আমার কেবল লাভ পাকা রম্ভা ফল।
রম্ভাপ্রাপ্ত নিধিরাম, বলিবে সবাই,
বর দেহ, নিত্য নিত্য রম্ভা যেন পাই।
বিজয়া ভুলিয়ে গিয়ে, সপ্তমী অষ্টমী
নবমীর পুণ্যতিথি, নিত্য যেন শিবে,
বিরাজে দাসের গৃহে ; পূর্ণানন্দে যেন
নিত্য নিত্য পূর্ণ হয় মহা মহোৎসব।
নিত্য নিত্য নব নব কুসুম সৌরভে,
সুবাসিত থাকে যেন দাসের ভবন ;
সুবাসিত ধূপ ধূনা সুবাস বিতরি,
নিত্য নিত্য শোভে যেন তোমার সম্মুখে।
প্রেমপদ্ম নীলপদ্ম পূর্ণ বিকাশিয়া,
অগুরু চন্দন মাখি শত শত দলে,
পাদপদ্মে নিত্য যেন করে নমস্কার।
শঙ্খ ঘণ্টা জগঝম্প বীণা সপ্তস্বরা,
নিত্য নিত্য বাজে যেন তব শ্রীমন্দিরে,
নিত্য যেন শোনা যায় মহোৎসব রব।
রাঙ্গা পদে এই বর মাগে নিধিরাম,
এই মহোৎসব যাচে কৃতাঞ্জলিপুটে।

—*—

নিদয়া হয়োনা দেবি ! দয়াময়ী তুমি,
ছোলা কলা পানিফল আতপ তণ্ডুল,
দিবনা তোমারে শিবে, দিতে পারিব না,
তোমার বিশ্বের বস্তু কি দিব তোমায় ?
ছাগশিশু বলিদান হবেনা এখানে,
সে বিধিটি নিধিরাম রাখেনা পূজায়।

তোষামোদে ঘুস খেয়ে তুষ্ট মহামায়া,
অজ্ঞানেই ভাবে ইহা ; ভক্তের ভাবনা
সে রকম কভু নয়, কভু নয় নয়।
আমিও অজ্ঞান মূঢ়, তবু শিবেশ্বরি !
তত হীন মতি মম কদাচ হবে না।
সচন্দন বিল্বদল পুষ্প গঙ্গাজল,
তাহাও তোমার বস্তু ; কি আছে আমার ?
কি দিয়া পূজিব তবে শ্রীদুর্গা চরণ ?
বস্তু আছে ব্রহ্মময়ি ! তাহাই অর্পিব।
ভক্তি বিল্ব, ভক্তি গঙ্গা, শ্রদ্ধার চন্দন।
মনফুলে মিশাইয়া অর্পিব চরণে,
নিয়ত ইহাই বাঞ্ছা, বাঞ্ছাপ্রদায়িনি !
বাহিরে উৎসব থাকে, থেকে থাকে তাহা,
আনন্দে আনন্দময়ী তুষ্ট চিরদিন।
বাহ্যানন্দে ভক্ত যদি ভক্তি নাহি ভুলে,
পূজা করে মা তোমারে, তুষ্ট তুমি তাহে।

—*—

নিধিরাম বোঝেনা মা অন্তর বাহির,
দয়া করি দয়াময়ি, দিও বুঝাইয়া,
যেওনা কৈলাসাচলে মিনতি আবার,
থাকো মা দীনের বাসে, দীনদুঃখহরা,
বৎসরেক থাকো পুনঃ দ্বিতীয় বৎসরে
পূজিব শ্রীপাদপদ্ম মানসোপচারে।
যেওনা থাকো মা দুর্গে, দুর্গতিবারিণি !
পুনঃ পুনঃ এই বর যাচে নিধিরাম।

সমাপ্ত।

বাঙ্গালা ভাষার লেখক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিহারিলাল যখন সেকেণ্ডইয়ারে পড়েন, তখন ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরে তত্রত্য জমিদার চৌধুরী মহাশয়দেরও ঐরূপ একটী হিন্দুমেলা হইত। বিহারী বাবু জনৈক বন্ধুর আগ্রহে ঐ মেলাতেও একটি কবিতা পাঠ করেন। সেখানেও তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা হয় এবং পুরস্কারস্বরূপ সেখানে তিনি একখণ্ড "মেঘনাদবধকাব্য" উপহার পান। এই সূত্রে বিহারী বাবু যে আর একটি অমূল্যনিধি লাভ করেন, কথাপ্রসঙ্গে এখানে সে কথাটি বলিতেও ইচ্ছা হইতেছে। বারুইপুরের মেলায় কবিতা পড়িতে গিয়া বিহারী বাবু এক কন্যারত্ন দেখিয়া আসেন। সেই কন্যারত্নকে দেখিতে যান, অন্য কোন পাত্রের জন্য; কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে, যথা-দিনে নিজেই সেই কুমারী কন্যাকে লাভ করেন। সেই গুণবতী রমণীরত্ন এখন সন্তানবতী হইয়া স্বামীর গৃহ উজ্জ্বল করিয়া আছেন। উপস্থিত বিহারী বাবুর দুই পুত্র ও এক কন্যা।

পঠদ্দশার পরেই বিহারী বাবু বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কলিকাতা আহিরীটোলা-নিবাসী ৺রাজমোহন মুখোপাধ্যায়ের কলিকাতা প্রেসের ম্যানেজারীপদ তিনি পান। দিবাভাগে ঐ কাজ করিয়া রাত্রে বিহারী বাবু সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সংস্কৃত-সাহিত্যের গুরু,—কলিকাতা হাতিবাগান-নিবাসী,—সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ কালিদাস দাস রায় মহাশয়ের সুযোগ্যপুত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল কবিরত্ন মহাশয়। এই সময় বিহারী বাবু মধ্যে মধ্যে মিরর ও ষ্টেটসম্যান পত্রে পত্রাদি লিখিতেন।

"প্রভাতী" নামে একখানি প্রাত্যহিক পত্রের সেই সময় জন্ম হয়। বিহারী বাবু কলিকাতা প্রেসের ম্যানেজার হইলে,—প্রেসের সত্বাধিকারী রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত "প্রভাতী" পত্রিকার সত্বগ্রহণ করেন। সে সময় প্রভাতীর সম্পাদক ছিলেন,—৺পশুপতি মুখোপাধ্যায়। ইনি,—পাউয়ার গার্জ্জনের শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের অগ্রজ। এক বৎসর পরে, বাঙ্গালা সংবাদপত্র-সম্পাদকের একজন মহারথ উক্ত প্রভাতীর সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি আমাদের বিজ্ঞ, বহুজ্ঞ, সুপণ্ডিত, লেখকশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত মহাশয়। সেন গুপ্ত মহাশয় অনেককে মানুষ

করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তাঁহার বহু শিষ্যশাখা আছে। আমাদের বিহারী বাবুও তাঁহার একজন শিষ্য। ক্ষেত্র বাবুর আমলে বিহারী বাবু "কন্যাদায়" সম্বন্ধে প্রভাতীতে এক পত্র লিখেন। প্রভাতীতে বিহারিলালের এই প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। সেই হইতেই বিহারী বাবু "প্রভাতীর" নিয়মিত লেখক হইলেন। ক্ষেত্র বাবুর পর শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাতীর সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। তিনি সম্পাদক হইলেন বটে, কিন্তু প্রভাতীর প্রায় যাবতীয় কার্য্য বিহারী বাবুই সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। প্রভাতীতে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকটিত হইতে লাগিল। প্রভাতী আপিস পূর্ব্বে রাধাবাজারে ছিল; কিছু দিন পরে উহা রাধাবাজার হইতে উঠিয়া রাজমোহন বাবুর নিজ নিমতলার বাটীতে আসে। এইখানে ঘটনাক্রমে এক সময় কম্পোজিটরগণ অনুপস্থিত হয়। কার্য্যকুশল বিহারিলাল মুখে মুখে রচনা করিয়া, নিজহস্তে সেই রচনা কম্পোজ করিয়া "প্রভাতী" প্রকাশ করেন। সুতরাং সে সময় কম্পোজিটরীও বিহারিলাল কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন। একাধারে এত শক্তি বড় সহজ নয়।

ইহার চারি পাঁচ বৎসর পর প্রভাতী উঠিয়া গেল।

এই সময় "বঙ্গবাসী" প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গবাসীর একমাত্র সত্বাধিকারী,—গুণী ও গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুজ মহাশয়,—বহু গীতিনাট্য-প্রণেতা শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্রের নিকট বিহারী বাবুর গুণের পরিচয় পাইয়া, বঙ্গবাসী আপিসের প্রেস-বিভাগে বিহারী বাবুকে নিযুক্ত করিলেন। তখন বঙ্গবাসী ছাপাখানা-বিভাগের বড়ই বে-বন্দোবস্ত ছিল। তখন দৈনিক প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং কার্য্যের বড়ই ঝঞ্ঝাট। স্বত্বাধিকারী মহাশয় বিহারী বাবুর উপর প্রেসের যাবতীয় ভার ন্যস্ত করিলেন। কার্য্যকুশল,—প্রেসের অধ্যক্ষতায় দক্ষ বিহারিলাল অল্পদিনের মধ্যে প্রেসের সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করিলেন; অযথা ব্যয় কমাইয়া আয় বাড়াইলেন; আরও অনেকরূপ উন্নতি করিলেন।

প্রেসের অধ্যক্ষতার কাজ করিতে করিতেও বিহারী বাবু মধ্যে মধ্যে দৈনিকে লিখিতেন। এক বৎসর পরে বঙ্গবাসীতেও লিখিতে আরম্ভ করিলেন। দৈনিক জন্মগ্রহণের তিন বৎসর পরে সুকবি স্বর্গীয় রামদেব দত্ত মহাশয় দৈনিকের সম্পাদক নিযুক্ত হন; সেই সময় বিহারী বাবু তাঁহার সহকারী হইলেন। ক্ষেত্রবাবু তখন দৈনিকের লেখক ছিলেন,—সম্পাদক নন। কিন্তু দৈনিকের শেষ দশবর্ষ কাল, ক্ষেত্রবাবুই একমাত্র সম্পাদক ছিলেন।

অতঃপর যখন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গবাসীর সম্পাদক হইলেন, রামবাবু তখন দৈনিক হইতে বঙ্গবাসীতে আসিলেন এবং ক্ষেত্র বাবুই তখন দৈনিকের ভার লইলেন। এই সময় বিহারী বাবু বঙ্গবাসীর "শাস্ত্র-প্রকাশ" বিভাগে নিযুক্ত হইলেন। বিহারী বাবুর সে সময়কার অগাধ পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের কথা স্মরণ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। শাস্ত্রপ্রকাশের গ্রাহক সংগ্রহের জন্য তিনি যেরূপ উৎকট পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে আজ অবধিও সকলেই তাঁহার কার্য্যকুশলতার প্রশংসা করিয়া থাকেন। বামদেব বাবুর সহিত বঙ্গাবসীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, বিহারী বাবু বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন এবং ঈশ্বরেচ্ছায় আজিও সেই পদে প্রশংসার সহিত কার্য্য করিতেছেন।

বঙ্গবাসীতে বিহারী বাবুর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, "নেপাল"; এবং জন্মভূমিতে প্রথম প্রকাশিত হয়,—"পঙ্গপাল।" এই দুই প্রবন্ধেই বিহারী বাবু সুধী-সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই মনোযোগ এখন সহস্র সহস্র পাঠককে আকর্ষিত করিতেছে।

বিহারী বাবু সুস্থ শরীরে থাকিয়া দীর্ঘজীবী হউন,—ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

দীনের দুর্গোসব।

মা দুর্গে! এই জগতে হীন দীন কৃপণ রুগ্ন মানব, আর অমর নরপতি যোগী বা ভোগী, সকলেরই একমাত্র সুখই মুখ্য লক্ষ্য, মানবের মন! সদা সুখের জন্যই লালায়িত, কিসে সুখী হইবে, এই আশায়ই প্রাণিদিগের মন ছুটাছুটী করিতে থাকে। যাহা কিছু দৈনিক আহার বিহারাদি মানব করিয়া থাকে, তৎসমুদয়ই কেবল আপন সুখের জন্যই।

ধন রাজ্য ঐশ্বর্য্য পুত্র ক্ষেত্র কলত্র মিত্রাদি লাভ করিয়াও, ক্রমশ পর্ণকুটীর হইতে একতল দ্বিতল ত্রিতল প্রাসাদ, বসন ভূষণ যান আসন, অধিক কি বলিব, দেবত্ব লাভ করিয়াও মানবের মন শান্ত বা তৃপ্ত হইতেছে না।

যেন ইহার পরেও আরও কি জানি একটা সুখ আছে, সেই সুখের জন্য মানব মন অহর্নিশ পরিভ্রমণ করিতেছে।

ধনাদি দ্বারা নিত্য নিরতিশয় সুখের সম্ভাবনা নাই, ফলতঃ, সেই সকল ধন ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি বিষয় কৃত্রিম দুঃখানুবিদ্ধ সুখেরই হেতু পরিলক্ষিত হয়। মানবের মন দুঃখসংস্পৃষ্ট অনিত্য সুখের স্পৃহা করে না, ক্ষণ বিনশ্বর সুখ লাভে মানবহৃদয় কৃতার্থ হয় না, শান্ত হয় না, এই নিমিত্তই ধনৈশ্বর্য্যাদির দ্বারা শান্তি লাভে অকৃতার্থ হইয়া মানব মন বিস্রস্ত হইয়া পড়ে।

জগজ্জননি! সেই দিন সেই মুহূর্ত্তেই মানবাত্মা কৃতার্থন্মন্য হইবে, বীত-লিপ্স হইবে, প্রশান্ত হইবে, যে দিন যে মুহূর্ত্তে অখণ্ডানন্দ নিত্য নিরতিশয়ানন্দ লাভ করিবে, সে দিন স্ত্রী পুত্র গৃহ ক্ষেত্র রাজ্যৈশ্বর্য্য সুখ সেই মহা সুখের এক কণিকামাত্রও মনে করিবে না।

মা আনন্দময়ি! সেই অনির্ব্বচনীয় মহামন্দ লাভে কেবল তোমার চরণার-বিন্দ সাক্ষাৎকারই মুখ্য কারণ বেদাদি শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। তা ছাড়া যুগ সহস্রের চেষ্টায়ও সেই অখণ্ডানন্দ লাভ আকাশকুসুমবৎ সম্পন্ন হইবে।

মা পূর্ণানন্দময়ি! আমাদের সকল সুখের আকর তোমার সাক্ষাৎ-কার অনায়াসলভ্য নহে। কেননা, মা! তুমি এই দৃশ্য ক্ষিতি জলঅনল অনিল বা আকাশ নহ, তুমি গন্ধ রস রূপ স্পর্শ বা শব্দ নহ, তুমি তাহার অতিরিক্ত, সুতরাং তোমায় নাসা আঘ্রাণ করিতে পায় না, রসনা স্বাদ করিতে অপটু, নয়ন দর্শনে শক্তিহীন, ত্বক্ স্পর্শ করিতে পারে না, শ্রুতি শুনিতে অসমর্থ, মা তুমি অণু হইতে অণুতর, মহৎ হইতে মহত্তর, কাজেই মনও তোমায় ধরিতে পায় না।

মা ব্রহ্মময়ি! তুমি অবাঙ্মনস গোচর, মা! তোমায় মন জানেনা, মনকে তুমি জান, শ্রবণ তোমায় শুনেনা, শ্রবণকে তুমি শুন, বাক্য তোমায় কহিতে পারে না, বাক্যকে তুমি কহিতে পার, চক্ষু তোমায় দেখেনা, তুমি চক্ষুকে দেখিয়া থাক, মা! তুমি প্রাণিমাত্রেরই হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, মা! তোমার কোন ক্রিয়া নাই, অথচ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমিই করিতেছ, মা! তুমি অতি দূরে আছ, অথচ অতি নিকটে নয়ন-পুত্তলির মধ্যেও আছ, মা! তুমি সকলের বাহিরে আছ, সকলের অন্তরে আছ।

মা! তোমায় আস্তিক মাত্রই "সর্ব্বকর্ত্রী" বলে, ইহাতে কাহারও বিমতি দেখা যায় না।

অদ্য "সর্ব্বকর্ত্রী" এই শব্দটীর তাৎপর্য্য বিচার পূর্ব্বক তোমার সাক্ষাৎকার দুর্লভ নহে ইহাই বুঝিতেছি, "সর্ব্বকর্ত্রী" এই শব্দের অন্তর্গত সর্ব্ব শব্দের অর্থ

কল্পনা কি ? না, এক বস্তুতে অপর বস্তুর আরোপ কল্পনা, যেমন ঘটে বা পটে দেবতা বুদ্ধি, মা ! উক্ত কল্পনাও সর্ব্বকর্ত্রী তোমারই সৃষ্ট পদার্থ, যদি তোমা ব্যতীত অপর কেহ কল্পনা সৃষ্টি করিয়া থাকে, তবে তোমার সর্ব্বকর্ত্রীত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়।

জগজ্জননি ! ইহাও বলা উচিত হয় না, যে তুমি নিষ্প্রয়োজনে কল্পনা পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছ, যদি তাহাই হয়, তবে নিষ্ফল সৃষ্টি করিয়াছ বিধায় তোমাকে দোষগ্রস্ত হইতে হয়, অতএব কল্পনার একটা ফল আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

মা ! তোমার সৃষ্ট "শব্দ," কৈ, শব্দের ত কোনও আকার নাই, ত্রিকোণ বর্ত্তুল চতুষ্কোণ বা নীল পীত লোহিত বা কপিশ, ইত্যাদি কিছুই দেখিতে পাই না।

ফলতঃ, বর্ণাত্মক শব্দের কোন আকৃতি না থাকিলেও "ক" "খ" "গ" "ঘ" ইত্যাদি ত্রিকোণ কুণ্ডলীবিশিষ্ট "ক" বকতুণ্ডবৎ "খ" এইরূপে কল্পিত আকার পত্রে আরূঢ় করিয়া দেশান্তর স্থিত বন্ধুদিগের বার্ত্তা নিশ্চয়-রূপে জ্ঞাত হইতেছে, সুতরাং "কল্পনা" নিষ্ফলা, ইহা কখনই বলা যায় না।

অতএব আবহমান কাল হইতে প্রচলিত নিরাকার তোমার কল্পিত ঐ দশভুজা সিংহারূঢ়া মহিষমর্দ্দিনী রূপের দ্বারা নিরাকার শব্দের কল্পিত ক কারাদি রূপের ন্যায় যথাবিধি পূজা করিয়া নিশ্চয়ই আমরা অভীষ্ট লাভ করিতে পারিব।

মা ! যাহার কোনও নাম নাই, তাঁহাকে সকল নামই দেওয়া যায়, যাহার কোনও রূপ নাই, তাঁহাকে সকল রূপেই ডাকা যায়।

মা ! তোমার স্বরূপ যে কি ? তাহা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতিও জানে না, আমরা ত কীটাণু।

মা ! আরও বলি, তুমি ত নিরাকারা, ইহা সর্ব্ববেদাগমের সিদ্ধান্তিত কথা, আবার এ কথাও শাস্ত্রে পাওয়া যায়, যে তুমিও আমাদের মত শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ প্রেম শ্রবণ মনন ধ্যানের দ্বারা সাক্ষাৎ হইয়া থাক, এবং আমরাও তোমা হইতে জল অনল ও দিন রাত্রির মত অত্যন্ত ভিন্ন নহি, কিন্তু আমরাও চৈতন্যময়ী তোমরই একটী কণা, অজ্ঞানানুবিদ্ধ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব, বা ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকও আশয়ে সংসৃষ্ট চিতিশক্তি তুমিই আমরা হইয়াছি, সেই অজ্ঞানের আবরণ শক্তির মাহাত্ম্যেই আমরা নিত্য সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

সংস্কারাভাবে কোন কার্য্যইত এ জগতে নিষ্পন্ন হইতেছে না, বা হইতে পারে না।

যেমন, আমরা জন্মিয়াই জীবনের ঔষধরূপ মাতৃস্তন্যেই স্নেহধারা শিক্ষা করিয়াছি, তখন ত আর কিছুই ভালবাসিতাম না, মাত্র মাতৃস্তন্য, পরন্তু তাহারও একটা আকার আছে, স্তন্য শুক্লবর্ণ মধুর রসবিশিষ্ট, ও কবোষ্ণ, এজন্যই স্তন্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য এবং প্রত্যক্ষিত।

তৎপরে বাল্যদশাপন্ন আমরা দেখিলাম, এ জগতে মা ভিন্ন আর আমাদের কেহ নাই, আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া রোদন করি, স্নেহময়ী মা অমনি বক্ষে ধারণ করিয়া অমৃতায়মান স্তন্য দান করেন, বিবিধ ক্লেশ বিবিধ ভয় হইতে ত্রাণ করেন, তাই মায়ের উপরেই আমাদের উত্তরোত্তর শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহের উৎস খুলিয়া পড়ে! সেই মা, আমাদের মূর্ত্তিময়ী, তবেই ত এমন ভালবাসিতে পারিয়াছি।

তৎপরে সংস্কার এবং সংসর্গবশে সর্ব্বদা আহার বিহারজনিত যে প্রেম করা, তাহাও সাকার বস্তুর সহিতই হইয়াছে, নিরাকার বস্তু কখনো ইন্দ্রিয়-গোচর নয় বলিয়াই তাহা আমরা ভালবাসিতে শিখি নাই, সুতরাং নিরাকার বস্তু আমাদের প্রেমভাজন হইতে পারে না।

মা! নিরাকারা, তোমার দ্বারা আমাদের সুখের আশা সুদূরপরাহত, ইহা নিশ্চয়। মা! তোমার নিরাকার নিয়া তুমি থাক, আমাদের তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই।

বিশ্বজননি! যেমন ভূগর্ভে নিহিত কত স্থানে কত কত মণিরত্ন প্রোথিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে গতিকেই তদ্দ্বারা আমরা সুখী হইতে পারিতেছি না, তেমন মা! তুমি সূক্ষ্মরূপে সদা সন্নিহিত থাকিলেও স্থূলদর্শী আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হওনা বলিয়াই মন প্রীত হইতেছে না।

আমরা ইহাই বুঝি, শ্রদ্ধা স্নেহ ভক্তির দ্বারা লব্ধব্য বস্তু, অন্যোপায় দ্বারা লাভ করিতে শক্য হয় না, গন্ধ গ্রহণে নাসাই পটীয়সী, কিন্তু সহস্র পদ্ম চক্ষু নহে, পাতাল মূলে স্থিত বস্তু গিরি শিখরে কখনও পাওয়া যায় না, দক্ষিণ সাগরে প্রাপ্য বস্তু, ক্রমাগত যুগসহস্র বৎসর উত্তর দিগে অনুসন্ধান করিলে কখনই পাইবার নহে। জলের কর্ম্ম অনলে, ও অনলের কার্য্য জলে, কখনই নির্ব্বাহিত হইতে পারে না।

বিশেষতঃ, যে বস্তু লাভে যেমন প্রক্রিয়া, যেমন স্থান, যেমন সময়ের

শাস্ত্রে আছে, "গবাং সর্ব্বত্রগং ক্ষীরং স্রবেৎ স্তনমুখাদ্ যথা।" গাভীর সর্ব্ব শরীরেই দুগ্ধের সঞ্চার আছে, কিন্তু হস্তদ্বারা আপীন আকর্ষণ করিলেই দুগ্ধ নির্গত হয়, ছেদনে রুধির বহির্গত হয়, কেন? না, দুগ্ধ বহিষ্করণে আপীনাকর্ষণই সম্যগুপায়, ছেদন নহে, আবার আপীনাকর্ষণেই দুগ্ধ বাহির হইয়া থাকে, জিহ্বাদোহনে কেবল ক্লেদই বাহির হয়, কেন? না, জিহ্বা দুগ্ধ বাহিরের স্থান নহে, যথা নির্দ্দিষ্ট সময়েই দুগ্ধের প্রবাহ হয়, সময় উত্তীর্ণ হইলে আর দুগ্ধ তেমন হয় না। সেরূপ ভক্তি বিশ্বাস স্নেহ শ্রদ্ধার দ্বারা এবং শাস্ত্রোক্ত পূজার দ্বারাই মা! তোমাকে আমরা পাইব, তাছাড়া! যুগসহস্রের চেষ্টায়ও কখনও পাইব না।

এজন্যই মা! নিরাকার শব্দের কল্পিত আকারের ন্যায়, এই শরৎকালে মনোহর মণ্ডপে ভক্তিশ্রদ্ধা ও বিবিধোপহারে শাস্ত্রোক্ত মার্গে তোমার দশভূজা মূর্ত্তি সাক্ষাৎ করিব।

অন্তর্যামিনি! মা! তুমি আমাদের মন জান, আমরা কি করি, না করি সব জান, মা! তুমি যে সর্ব্বজ্ঞা, ধূর্ত্তভক্ত আমরা কেবল মুখে দুর্গা বলিয়া চীৎকার করিলে, স্তোত্র পাঠ করিলে, ললাটে ভস্ম ত্রিপুণ্ড্র, তদুপরি রক্তচন্দন তিলক ধারণ করিলে, সর্ব্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষমালা জড়াইলে, প্রভূত নৈবেদ্য সাজাইলে, অসংখ্য ছাগ শাবকের প্রাণ সংহার করিলে, এবং দীর্ঘ শিখা দোলাইলে কখনই তোমায় ভুলাইয়া প্রসন্ন করিতে বা সাক্ষাৎ করিতে পারিব না।

সপ্তাহে এক দিন কেশ শ্মশ্রু বিন্যাস করিয়া বিলাসিবশে আপনাকে কন্দর্পরূপে পরিণত করিয়া, পট্ কিড়্ মিড়্ শব্দরহ চর্ম্ম পাদুকা ধারণ করিয়া, উচ্চাসনে আসন্দীতে দীর্ঘ বর্ত্তুল কাষ্ঠাসনে মন্দুরাস্তৃত কুট্টিম উপাসনা গৃহে প্রবেশ করিয়াই চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই অমনি হে নাথ! হে জগৎ পিতঃ! হা দীনবন্ধো! তুমি নির্ব্বিকার নিরঞ্জন, তুমি প্রতিক্ষণে সহস্র সূর্য্যের ন্যায় আমাদের পুরো বিরাজিত রহিয়াছ, কিন্তু হে বিভো! হে ভূমন্! অজ্ঞানান্ধ আমরা তোমায় দেখিতে পাইতেছি না, ইত্যাদি জল্পনা বাক্যে মা তোমাকে আমরা কখনই ভাঁড়াইতে পারিব না।

পরন্তু, মা! সেই মুহূর্ত্তেই তুমি অভিলষিত দশভূজা মূর্ত্তিতে আমাদের সাক্ষাৎ উপস্থিত হইবে। যখন আমরা দরবিগলিত নেত্রে ভক্তি শ্রদ্ধা স্নেহের উৎস খুলিয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়মে—

মা আনন্দময়ি! মা চৈতন্যরূপিণি! মা! তোমা বিনা ক্ষণকালও

বিসর্জ্জন করিলাম, ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ ভাব বিশ্বস্তসূত্রে তোমায় জানাইতে পারিব। তখন মা! বালকের আর্ত্তনাদে কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতেপারিবে না।

জগন্ময়ি! যে তুমি নিজের শক্তিতে উত্তুঙ্গশৃঙ্গ শৈল হইতে পারিয়াছ, যে তুমি অপার পারাবার হইতে পারিয়াছ, যে তুমি "অণোরণীয়ান্ মহতো-মহীয়ান্" হইতে পারিয়াছ, সেই তুমিই আমাদের অকৃত্রিম ভক্তি দ্বারা আরাধ্যা হইয়া এই মহিষমর্দ্দিনীরূপে সাক্ষাৎ উপস্থিত হইতে পারিবে না? ইহা অশ্রদ্ধেয় কথা, যদি না পার, তবে তোমায় সর্ব্বকর্ত্রী সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বান্তর্যামিনী বলিয়া কিরূপে মনে করিব? কেনই বা তুমি ভক্তানুগ্রহ কাতরা এই বুঝিয়া পূজা করিব?

মা! তুমিই ত আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গের এমনি স্বভাব দিয়া সৃষ্টি করিয়াছ যে, স্থূলালম্বন ব্যতীত সূক্ষ্ম প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, যেমন অনাকৃতি শব্দ স্থূল কণ্ঠ তালু দন্ত ওষ্ঠাদি অবলম্বন বিনা প্রত্যক্ষ পথে আসিতে পারে না। তেমন রূপও পৃথক্‌রূপে আমাদের নয়নগোচর হয় না, কিন্তু ঘট পটাদি স্থূল বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই শুক্ল পীত নীল লোহিতাদি রূপ নেত্রগোচর হইয়া থাকে।

মা! যদি আমরা জলীয়কীটাণু দেখিতে ইচ্ছা করি, তবে তা কি চর্ম্ম চক্ষুতে পারি? কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই তাহার প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই। সেই প্রকার আলোক সাধারণ মনোনয়নকমনীয় তোমার এই দশভুজা মূর্ত্তি পুরোভাগে স্থাপন করিয়া শাস্ত্রানুসারে পবিত্র ভাবে একাগ্রচিত্তে আমীলিতনেত্রে প্রথমে তোমার বাহিরের এই দশভুজা মূর্ত্তি চিত্তক্ষেত্রে দৃঢ় অঙ্কিত করিব,—তোমায় হৃৎপদ্মে বসাইব, বিনয়কাতরে জিজ্ঞাসা করিব—মা! এথায় আসিতে তোমার কোন কষ্ট হয় নাই? সুখে আসিয়াছ ত? পরে সহস্রারচ্যুত অমৃত সলিলে পাদুখানি ধোয়াইয়া দিব, চঞ্চল মন শিরোভূষা পরাইয়া দিব, মন্দ মন্দ সমীরে তাহা দুলিতে থাকিবে, সেই অমৃত সলিলে মুখ ধোয়াইয়া দিব, স্নান করাইয়া দিব, এই নক্ষত্রখচিত আকাশ বস্ত্র প্রদান করিব, আমার গন্ধ তত্ত্ব কুঙ্কুমচন্দনে তোমায় অনুলিপ্ত করিব, চিত্ত কুসুমমালা গলায় দোলাইব, পঞ্চ প্রাণ পঞ্চাঙ্গ ধূপ দিব, তেজস্তত্ত্ব প্রদীপ জ্বালিব, সুধাসমুদ্রতীর প্ররূঢ় কল্প পাদপ হইতে নানাবিধ সুস্বাদু খাদ্য প্রদান করিব, অনাহত ঘণ্টা বাদন করিব, সহস্রার ছত্র ধরিব, আর শব্দ তত্ত্বে গান ধরিব—

"দাড়া গো কুল কুণ্ডলিনি! মা আমার অন্তরে।
তোমায় অন্তরেতে রাখি, নিয়ত নিরখি, অন্তর না করি দিবা রজনি?
ভক্তি পুষ্প করি, শ্রদ্ধা সুচন্দন, তদঞ্জলি করি চরণে অর্পণ,
নেত্র মুদে মন সাধে তোমার রূপ করি নিরীক্ষণ
কামাদি ছয় বলি, দিবগো করালি।
বিবেক অসি করে ধারণ করি,

আর আত্ম নিবেদন করিব—

মা! করুণাময়ি! মা! তোমার জন্য তোমায় পূজা করিতেছি না, এ আমার আনন্দের জন্য, সুখের জন্য, শান্তির জন্য, মা! তুমি অন্নপূর্ণা, অন্ন প্রদানে ত্রিলোক পালন করিতেছ, আমি অকিঞ্চন, তোমায় কি অন্ন দিব? মা! তুমি জগদ্ব্যাপিনী, তোমায় বিতস্তি পরিমিত বস্ত্র দানে তোমার অঙ্গাবরণ কিরূপে করিব? মা! কিন্তু সকলই হইতে পারে, যদি মা! তুমি আমার মনের মতন হও, আমরা মন, প্রাণ, বুদ্ধি তোমায় সমর্পণ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে মা! মা! বলিয়া কাঁদিব, অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিব, আর গদ্‌গদ রবে বলিব,—মা! এই পবিত্র শরৎকালে, এই দুঃখপূর্ণ ধরাতলে, তুমি পদার্পণ করিবে বলিয়া চিত্তহীন জড়বর্গও তোমায় পূজা করিতেছে—সুধাকর অমৃতময় কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে, সরোবর নির্ম্মল জলে, নভোমণ্ডল নক্ষত্রমালায়, প্রভাকর প্রফুল্ল পঙ্কজ ব্রজে তোমার পূজা করিতেছে, আর আমরা হতভাগ্য মানবকুল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব? কখনই না, তাই ডাকিতেছি, মা! দুর্গে!

"শরণাগতদীনার্ত্ত পরিত্রাণপরায়ণে! মা! প্রদীদ, আর সহ্য হইতেছে না, দুঃখের চরমসীমায় আসিয়াছি, মা! দেখা দেও, মা! আমি এইত দেখিতেছি,

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।"

আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনে ত্যভিধীয়তে।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।"
আর দেখিতেছি,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।"

শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণঃ।

Tr 689
B 398
12/7/97
BENGAL LIBRARY
9 JAN 1901
WRITERS BUILDINGS

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক পত্র।)

নবম বর্ষ। } কার্ত্তিক, ১৩০৭ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা।

বিজয়া।

মহামায়ার এমনি দুশ্ছেদ্য মায়াজাল যে, উহাতে জড়িত হইয়া জীব একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়ে। ভারত এখন অতি শোচনীয় অবস্থায় পতিত। ভারতবাসিগণ অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ, তাহার উপর আবার এ বৎসরের অতিবৃষ্টি, বন্যা, শস্যহানি প্রভৃতিতে সকলেই কণ্ঠাগতজীবন হইয়াছেন। এত ঘোর কষ্টভোগ করিতে করিতেও ক্ষণকালের জন্য ভারত-বাসী সুখ-সাগরে ভাসিতেছিল। মহামায়ার মোহিনী শক্তিতে জীব সাংসারিক ক্লেশাদি বিস্মৃত হইয়া দিনত্রয় আনন্দময়ীর আনন্দময়ী ছবি মানসপটে অঙ্কিত করিয়া অলৌকিক আনন্দ অনুভব করিতেছিল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে নিমেষ মধ্যে আনন্দময়ী অন্তর্হিতা। সুখের দিন কখনই দীর্ঘস্থায়ি হয় না; তাহাতে আবার দুর্ভাগ্য ভারতীয়গণের অদৃষ্ট, সুতরাং সুখের দিন আসিতে না আসিতেই অতীত হইল। আনন্দময়ী নিরানন্দ ভারতবাসিগণের হৃদয়ে তিন দিবস অলৌকিক বিমল আনন্দের উৎস প্রবর্ত্তিত করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। জীবগণ আজ মহামায়ার অদর্শনে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন। আবার সম্বৎসর অতীত হইলে, ভক্তগণ ভবভয়-হারিণী, ত্রিতাপনাশিনীর অভয় পাদপদ্ম দর্শন করিবার আশায় কালাতি-পাত করিতে লাগিলেন। আশাই জীবের প্রধান অবলম্বন।

তিথিনক্ষত্রাদিযোগে দিনবিশেষের বিজয়া সংজ্ঞা শাস্ত্রকারগণ প্রদান করিয়াছেন, শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে রবিবার যোগ হইলে তাহাকে বিজয়া নামে অভিহিত করা যায়। যথা—

"শুক্লপক্ষস্য সপ্তম্যাং সূর্য্যবারো যদা ভবেৎ।
সপ্তমী বিজয়া নাম তত্র দত্তং মহাফলং॥" তিথ্যাদিতত্ত্বে।

অর্থাৎ শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে যদি রবিবার হয়, তাহা হইলে সে সপ্তমীকে বিজয়া নামে অভিহিত করা হয়, সে দিন দানাদি করিলে মহাফল হয়। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, তিথিবিশেষের সংজ্ঞা বিজয়া হইয়া থাকে। কিন্তু অদ্য আমরা যে বিজয়ার উল্লেখ করিতেছি, তাহা বিজয়াদশমী। বিজয়া বলিলেই সাধারণে যাহা বুঝিয়া থাকে, অদ্য সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব। বিজয়া বলিলেই প্রায় সকলেই বুঝিয়া থাকেন যে, দুর্গাপূজার পর যে দশমী, তাহাই কথিত হইতেছে। এই দশমীকে শাস্ত্রকারগণ বিজয়া বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যথা—

"উদয়ে দশমী কিঞ্চিৎ সংপূর্ণৈকাদশী যদি।
শ্রবণর্ক্ষং যদা কালে সা তিথির্বিজয়াভিধা॥"

হেমাদ্রৌ কশ্যপঃ।

অর্থাৎ উদয়কালে যদি কিছু দশমী থাকে, তাহার পর সমস্ত একাদশী হয়, তাহা হইলে সেই তিথিকে বিজয়া দশমী বলিতে হইবে। যদি শ্রবণা-নক্ষত্র লাভ না হয়, তাহা হইলে কেবল দশমীকেও বিজয়া আখ্যা দেওয়া হইবে। নক্ষত্রযোগ হইলে ফলাধিক্য হয়, ইহাই শাস্ত্রকারগণের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

এই তিথিতে রাজগণ পূর্ব্বে যুদ্ধযাত্রা করিতেন, ইহাতে যুদ্ধযাত্রা করিলে জয়লাভ নিশ্চিত। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের নিমিত্ত মহা-মায়ার অকাল পূজা সমাপন করিয়া এই বিজয়া দশমীতে যুদ্ধযাত্রা করিয়া-ছিলেন, এই কারণেই সমস্ত হিন্দুরাজগণ সেই প্রথা অবলম্বন করিয়া বিজয়া দশমীতে যুদ্ধযাত্রা করিয়া থাকেন।

হেমাদ্রিধৃত কশ্যপবচনে লিখিত হইয়াছে ঃ—

"শ্রবণর্ক্ষে তু পূর্ণায়াং কাকুৎস্থঃ প্রস্থিতো যতঃ।
উল্লঙ্ঘয়েয়ুঃ সীমানং তদ্দিনর্ক্ষে ততো নরাঃ॥"

অর্থাৎ আশ্বিন শুক্লদশমীতে শ্রবণানক্ষত্রযোগে শ্রীরামচন্দ্র যেহেতু যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত জনগণ সেই দিনে এবং সেই নক্ষত্রে যুদ্ধযাত্রা নিমিত্ত দেশের সীমাতিক্রম করিবেন; রাজগণের বিজয়দান করেন বলিয়া, এই তিথিকে বিজয়া নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সেই জন্যই

শাস্ত্রকারগণ বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যে, এই দিবসেই রাজগণ যুদ্ধযাত্রা করিবেন। এই দিনে যুদ্ধযাত্রা না করিলে সম্বৎসর কোথাও বিজয়-লাভ হইবে না। যথা—

"দশমীং যঃ সমুল্লঙ্ঘ্য প্রস্থানং কুরুতে নৃপঃ।
তস্য সম্বৎসরং রাজ্যে ন ক্বাপি বিজয়ো ভবেৎ" ॥

অর্থাৎ যে রাজা বিজয়া দশমী অতিক্রম করিয়া যুদ্ধযাত্রা করেন, তাঁহার রাজ্যে সম্বৎসর মধ্যে কোথাও বিজয় লাভ হয় না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি রাজা কোনও প্রতিবন্ধকবশতঃ বিজয়া দশমীতে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতে না পারেন, তাহা হইলে সম্বৎসর তাঁহার কি কোথাও জয়লাভ হইবে না? শাস্ত্রের অতি কঠোর ব্যবস্থা। শাস্ত্র বলিতেছেন, এই দিন ভিন্ন অন্য দিন যুদ্ধযাত্রা করিলে সমস্তই নিষ্ফল হইবে। তজ্জন্য সেই শাস্ত্রই আবার ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, ঐ দিনেই যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে; তবে রাজা যদি কোন বিঘ্নাদিবশতঃ স্বয়ং যুদ্ধার্থ নির্গত হইতে না পারেন, তাহা হইলে ছত্রখড়্গাদি কোন একটী রাজোপ-করণকেও অন্ততঃ সেই দিন যুদ্ধার্থ নির্গমিত করিতে হইবে। রাজমার্ত্তণ্ডে লিখিত হইয়াছে:—

"কার্য্যবশাৎ স্বয়মগমে ভূভর্ত্তুঃ কেচিদাহুরাচার্য্যাঃ।
ছত্রায়ুধাদ্যমিষ্টং বৈজয়িকং নির্গমে কুর্য্যাৎ ॥"

অর্থাৎ কোনও কার্য্যবশতঃ রাজা যদি স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিতে না পারেন, তাহা হইলে খড়্গ কিম্বা ছত্রাদি কোনও ইষ্ট বস্তুকে যুদ্ধার্থ নির্গমিত করিবে।

এই বিজয়া দশমী রাজাদিগেরই বিশেষ উপযোগিনী। জয়লাভের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রকারগণ এই দিবসে নানারূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই দিবস অপরাজিতা দেবীর পূজা করিতে হয়। ইহার উদ্দেশ্যও বিজয়াদি লাভ। স্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে:—

"দশম্যাং তু নরৈঃ সম্যক্ পূজনীয়াপরাজিতা।
ঐশানীং দিশমাশ্রিত্য অপরাহ্ণে প্রযত্নতঃ ॥
নবমীশেষযুক্তায়াং দশম্যামপরাজিতা।
দদাতি বিজয়ং দেবী পূজিতা জয়বর্দ্ধিনী ॥

অর্থাৎ বিজয়া দশমীতে ঈশান কোণে অপরাহ্ণকালে অতি যত্নসহকারে নরগণ সম্যক্ প্রকারে অপরাজিতা পূজা করিবে।

নবমীর শেষভাগযুক্ত দশমীতে জয়বিবর্দ্ধিনী অপরাজিতা দেবী পূজিতা হইলে বিজয় প্রদান করেন।

এই সমস্ত বচন হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, বিজয়াদশমী রাজাদিগের বিশেষ মঙ্গলদায়িনী। রাজার মঙ্গলেই প্রজার মঙ্গল, এজন্য আমরা সতত রাজার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া, বিজয়া দশমীর অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। রাজার বিজয়দায়িনী বলিয়া আমরা সকলেই এই বিজয়া দশমীতে শুভক্ষণে সকলেই স্ব স্ব কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া থাকি। হিন্দুগণের কথা আর কি বলিব, আমাদিগের দেশে যে সমস্ত বৈদেশিক অন্যধর্ম্মাবলম্বী ব্যবসায়ি বণিক্‌গণ আছেন, তাঁহারাও এই শুভ বিজয়া দশমীতে কোন না কোন রূপ কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগেরও দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই শুভ বিজয়া দশমীতে কার্য্যের সূত্রপাত করিলে সম্বৎসর কাল স্বীয় কার্য্যে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ হইবে। নতুবা তাঁহারা এরূপ অনুষ্ঠান করিবেন কেন?

শ্রীকৈলাসচন্দ্র শর্ম্মা।

ফুল-কুমারী।

রূপ-কথা।

"আমি রূপসী;—এত রূপ, এতই লাবণ্যপ্রভা যে, আমার জন্য আমার শ্বশুর শাশুড়ী ননন্দা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনগণ সদাই ব্যস্ত ও চিন্তিত থাকেন। আমি খিড়কির পুকুর ঘাটে কাপড় কাচিতে যাইলে শাশুড়ী সঙ্গে যান, আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছাতের উপর উঠিলে, ননদ তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপস্বরে আমাকে বারণ করেন। সার্কাস দেখিতে যাইবার আমার অনুমতি নাই; আজন্ম কলিকাতায় রহিলাম, কখন থিয়েটার দেখিলাম না।

আর আমার স্বামী,—তিনি ত কেবল অনিমিষ নয়নে আমার প্রতি তাকাইয়া আছেন, আমার চুল দেখিতেছেন, চোখ্ দেখিতেছেন, আর আমার হাতের আঙ্গুলগুলি লইয়া নিশিদিন খেলা করিতেছেন। আমার রূপের জ্বালায় তাঁহার লেখা পড়া বন্ধ হইয়াছে; তিনি চাকরির চেষ্টা করেন না, বন্ধু বান্ধবের সহিত সন্ধ্যাকালে বেড়াইতেও যান না। মন্ত্রমুগ্ধ

ফণীর মত নির্নিমেষ নয়নে কেবল আমার প্রতি তাকাইয়া আছেন, আমার রূপ তাঁহার পক্ষে কাল হইয়াছে।

২

আমার রূপ আমার পক্ষেও কাল হইয়াছে। ঘেরাটোপ ঢাকা পিঞ্জরা-বদ্ধ বুলবুলীর মত মানুষ কি চিরকাল থাকিতে পারে? রান্না ঘরে যাইবার আমার অনুমতি নাই;—পাছে বামুন ঠাকুর আমায় দেখিয়া ফেলেন। সংসারে এটা-ওটা-সেটা বাজে কাজ করিবার আমার অধিকার নাই;—পাছে খান্‌সামারা আমাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়।

স্বামিসেবাও আমি করিতে পারি না, কারণ বলিতে লজ্জা করে, স্বামীই আমার সেবা করেন, সে সেবার পরিচয় কি দিব?—কৃতদাসীও যে সেবা করিতে পারে না, আমার ইহকাল ও পরকালের দেবতা হইয়া আমার স্বামী সানন্দচিত্তে সেই প্রকার সেবা করিয়া থাকেন; শ্বশুরের চরণসেবা করিবার আমার অবসর হয় না, স্বামী আমার কখনই কাছ ছাড়া হন না; শাশুড়ীও শ্বশুরের কাছে যাইতে দেন না। আর শাশুড়ীর সেবা—সেত হইবারই যো নাই, তাঁহার দুই কন্যা অনবরত তাঁহার সেবা করিতেছেন; আমি কাছে গিয়া বসিলে তিনি আমার চিবুক ধরিয়া বলেন, "মা আমার ভুবন মোহিনী, দেহটা যেন ননী দিয়ে গড়ান, তুমি মা আমার কি সেবা করিবে? তোমার সেবা করিবার বয়স হউক, তখন করিও, এখন ঘরে গিয়ে বস, আমার ঘর আলো করে থাক, নহিলে পরেশ রাগ করিবে, তুমি মা পরেশেরই সেবা কর।" শাশুড়ীর এই সকল কথা শুনিলে আমার হাসি পাইত, তাঁহার পরেশের সেবা করা ত দূরে থাকুক, পরেশই আমার সেবা করিয়া আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত।

৩

ছাই রূপ! এ রূপ আমার কেন হইল? আমার খাইতে সোয়াস্তি নাই, বসিতে সোয়াস্তি নাই, সাধ-সখ মিটাইবার উপায় নাই; দশটা স্থানে যাইয়া দশ রকম সামগ্রী দেখিবারও অনুমতি নাই। দুই বেলা দুই পাথর ভাত খাই, তাহা হজম করিবার জন্য সংসারে দশটা পরিশ্রমের কাজ করিবারও অবসর নাই। এমন ভাবে কি মানুষ বাঁচিতে পারে? আর স্বামী! তিনিত স্বামীই নন,—স্বামী সঙ্গে স্ত্রীলোকের যে সকল বাসনা পূর্ণ হয়, স্বামীর সহিত কুলাঙ্গনা যে সকল আমোদ-আহ্লাদ করিয়া সুখী হয়,

আমার তাহার কিছুই হয় নাই। স্বামী কেবলই আমায় দেখিতেছেন, চাঁদের আলোয় দেখিতেছেন, বাতির আলোয় দেখিতেছেন, বিদ্যুতের আলোয় দেখিতেছেন, প্রথম প্রভাত-আলোয় দেখিতেছেন, প্রদোষকালেও দেখিতেছেন; আর নানা রঙ্গের নানা রকমের কাপড় পরাইয়া, আমার রূপের প্রভা দেখিতেছেন। এত দেখা কি আমার সহ্য হয়? আমি দেখিতে পাই কই? আমার সুকান্ত স্বর্ণবর্ণ, সুগঠিত স্বামিমুখ আমি দেখিতে পাই কই? কেবলই যদি দেখাইব, কেবলই যদি নিজের রূপের দোকান খুলিয়া বসিয়া থাকিব, তবে আমার দেখার সাধ মিটিবে কেমন করিয়া?

হায়! হায়! এ পোড়া রূপের জ্বালায় আমার জীবন-যৌবন সবই বৃথা হইল!

৪

কতবার আমি আরসীতে মুখ দেখিয়াছি! আমার কক্ষ-প্রাচীরের উপর একটা প্রকাণ্ড আরসী টাঙ্গান আছে, আমি নিশিদিন বসিয়া বসিয়া সেই আরসীতে আমার দেহের প্রতিবিম্ব দেখিয়া থাকি। আমার যেমন নাক কান চোখ আছে, কপোল কপাল গণ্ড আছে, উরু ভুরু বক্ষ আছে, অন্য সকল স্ত্রীলোকেরইত তেমনি আছে। গৌরবর্ণটা, কিছু আমার এক চেটিয়া নহে, আমিই যে পল্লীর মধ্যে সুগঠিতা, তাহাও নহে। আমার মত যুবতী বাঙ্গালা দেশে অনেক আছে, অনেক ছিল, অনেক হইবেও; তবে কোন্ পাপে আমি এমন ভাবে মোহপাশবদ্ধ হরিণীর ন্যায় দুঃখ পাইতেছি? আমার স্বামী বলেন, তাঁহার চক্ষু লইয়া দেখিলে আমি নিজেকে অসামান্যা রূপসী দেখিব; তাহাতে আমার লাভ কি? আর তাহাই কি রূপ? ইহার জন্যই আমার স্বামী পাগল! আমার শাশুড়ী সদাই ত্রস্ত! নিশ্চয় বলিতে পারি, প্রকৃত রূপ আমার দেহে নাই, তাঁহাদের নয়নে আছে। রূপট কেবল দৈহিক সামগ্রী হইলে আমি সে রূপ দেখিয়া আমার স্বামীর মতন বিমূঢ়া হইয়া থাকিতাম। কিন্তু রূপ যে নয়নের সামগ্রী! সকলকে দেখিয়া সকলের নয়নে একরকম রূপের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে না। মেজ ঠাকুর-পোর বৌ কাল, তিনি সেই কাল বৌ লইয়া বেশ সুখে আছেন, আমোদ-আহ্লাদ করিতেছেন; মেজবউকেও ভাল বাসেন। মেজঠাকুর-পো ত আমাকে দেখিয়া আমার স্বামীর মত বিহ্বল বিমূঢ় হইয়া থাকেন না; কেবল

রঙের গোলাপী আভাটুকু শুকাইয়া যাইবে।” পুরুষের মুখে এ সকল কথা, আমরা যুবতী বেশ বুঝিতে পারি ; কিন্তু আমার স্বামীর ভঙ্গিটা বুঝা যায় না, বুঝিয়াও লাভ নাই।

ফলে, ধীরে ধীরে আমার মনে একটা বিরক্তির ভাব জাগিয়া উঠিল। এ মোহবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য মনে মনে একটা সংকল্পও হইল।

৫

আমার শ্বশুর ডেপুটী কালেক্টার, গবর্ণমেণ্টের হুকুমে তিনি আরায় বদলী হইলেন। আমরা সকলেই আরায় যাইলাম। চাটুর্য্যে বাড়ীর একটি ছেলে শিশুদের পণ্ডিত হইয়া আমাদের সঙ্গে আরায় যাইল। কিছুকাল আরায় আমি বেশ সুখে ছিলাম। নূতন স্থান, নূতন ব্যবস্থা—নবীনত্বে আমি আমোদ পাইলাম, পরন্তু আমার স্বামীর সেই পুরাতন মোহ পূর্ব্ববৎই প্রবল রহিল। আরায় আমি একটি কন্যা প্রসব করিলাম। কন্যার মা হইয়া আমার স্বাধীনতাও একটু লাভ হইয়াছিল।

ছেলেদের পণ্ডিতটির নাম রাজকৃষ্ণ ; বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, ঠোঁট দুটী খুব মোটা, চক্ষু দুইটি গোল গোল, আর দেহ—সেত লৌহের ভাঁটা—সুসংবদ্ধ কেবল মাংসপেসীজড়িত, একটুও কোমলত্ব নাই,যেন ঠিক চোয়াড়ে। রাজকৃষ্ণ আমার অনেক কাজ করিত, অনেক ফরমাইস্ খাটিত, আর মাঝে মাঝে আমাকে ধমকাইত; আমি রাজকৃষ্ণকে ভয় করিতাম, একটু ভালও বাসিতাম।

আমার এক ননদের স্বামী গয়ায় মুন্সেফ ছিলেন, আমরা আরায় আসিয়াছি শুনিয়া, বড়দিনের ছুটিতে তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী আমাদিগকে দেখিতে আসিলেন। মুন্সেফ ঘরণী আমার এই ননদিনী, আরায় আসিয়া অবধি আমাকে দুই চক্ষের বিষ দেখিতে লাগিলেন ; তাঁহার নিন্দা-পরিবাদ—তিরস্কার-গঞ্জনা প্রথম প্রথম আমার ভাল লাগিত। কেননা বিবাহ হইয়া অবধি, আমি কেবল আদর খাইয়াছি—আদর পাইয়াছি, আদরে আমার বিতৃষ্ণা হইয়াছিল, তাই ননদের তিরস্কার প্রথম প্রথম ভাল লাগিয়াছিল।

কিন্তু এই ননদিনী শেষে আমার কালস্বরূপিনী হইলেন।

৬

আমি যে কক্ষে শয়ন করিতাম, সেই কক্ষের পার্শ্বে একটি বাথরুম ছিল। বাথরুমের পূর্ব্বদিকেই রাজকৃষ্ণের শয়নকক্ষ ছিল। ১লা জানুয়ারী ইংরাজী নূতন বর্ষের নূতন দিন। আমার স্বামী বাঁকিপুরে গিয়াছেন,

আমি এবং আমার প্রখরা ননদিনী, আমরা দুই জনেই কক্ষে শয়ন করিয়া আছি। রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে, একটু ঝির ঝির করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। পৌষ মাসের শেষ, পশ্চিম বেহারের ভীষণ শীতে আমরা কাঁপিতেছি। আমি একবার বাথরুমে যাইলাম, ফিরিয়া আসিয়া আগুনের আংটার কাছে আগুন তাপিতে বসিলাম। আমার ননদিনী উঠিলেন, তিনিও বাথরুমে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া, আমার প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিয়া তীরস্কারের স্বরে বলিলেন, "বউ! নাইবার ঘরে এত রাত্রে রাজকৃষ্ণকে দেখিলাম কেন? তুইত ওখানে গিয়েছিলি?" আমি উত্তর করিলাম, "তুমিও গিয়েছিলে ঠাকরুণ? রাজকৃষ্ণ কার জন্য এসেছিল, কে জানে? আর যদিই আমার খোঁজে এসে থাকে, তাতে তোমার ক্ষতি কি? পাঁচ ভায়ের উপর না হয় তোমার আর একটি ভাই হইল।"

আমার ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কথা শুনিয়া ননদিনী ব্যাঘ্রীর ন্যায় জলিয়া উঠিলেন, তীব্রবেগে মায়ের কক্ষের দিকে যাইলেন। উচ্চকণ্ঠে আমার কলঙ্কের কথা মাকে বলিলেন, বাবাকে বলিলেন, বাড়ীতে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

পরে আমার শাশুড়ী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আমি বলিলাম, "রাজকৃষ্ণকে আমি দেখি নাই।" কিন্তু আমার কথা কেহ বিশ্বাস করিল না। পরদিন প্রত্যুষে রাজকৃষ্ণের খোঁজ হইল, তাহার কক্ষে তাহাকে কেহ পাইল না, সন্দেহের উপর সন্দেহ হইল। আমার এতদিনের এত আদর, এত সোহাগ, সব এক কলঙ্কের বন্যায় ভাসিয়া গেল। বাঁকিপুর হইতে স্বামী আসিলেন, শ্বশুর মহাশয় তাঁহাকে বিলক্ষণ তিরস্কার করিলেন, শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, "দেখ্ পরেশ! তুই এমন স্ত্রীকে ত্যাগ কর, আমি অমন কালামুখীকে সংসারে রাখিব না।" শ্বশুর পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার সুন্দরী স্ত্রী যদি ত্যাগ করা কষ্টকর বোধ হয়, তুমি স্ত্রী লইয়া অন্যত্র থাকিতে পার, কিন্তু আমার সংসারে তোমাদের উভয়ের স্থান হইবে না।" আমার ননদিনী বলিলেন, "তা কেন, ও অভাগী দূর হউক, আমি আমার ভায়ের বিবাহ দিব।"

আমার বড় যত্নের রূপের কুসুমস্তবক একেবারেই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল।

৭

রাজকৃষ্ণের মনে পাপ ছিল কিনা, আমি জানি না। আমি তাহাকে

বাথরুমে দেখি নাই, তাহাকে ভাল বাসিতাম বটে, অনুগত চাকরকে যে ভাবে স্নেহ করে, আমি সেই ভাবে স্নেহ করিতাম। আমার মনে পাপ ছিলনা, কিন্তু আমার ললাটে পাপের কলঙ্ক লেখা আছে, আমি মনে যতই সতী হইনা কেন, আমার অসতীত্বের নিন্দা অচিরে চারিদিকে রটিয়া গেল।

স্বামী আমার শয়ন কক্ষে আসিলেন, আসিয়াই গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিলেন, "ফুল! আজ তোমাকে বাপের বাড়ী যাইতে হইবে, আমি ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিব। তোমার ভাই আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবেন।"

আমি।—আমার কি অপরাধ যে, আমাকে আমার এই আঠার বৎসর বয়সকালে তুমি ত্যাগ করিতেছ, তোমার কন্যা সুবালার মুখের দিকে একবার তাকাও। আমি যাব না।

স্বামী।—তোমাকে জোর করিয়া পাঠাইয়া দিবার কথা হইতেছে, আমার সঙ্গে যাইলে তোমার মান থাকিবে! আর দরোয়ানের সঙ্গে তোমাকে তাড়াইয়া দিলে তোমার মান থাকিবে না। আমার কথা শোন, তোমার সামগ্রী পত্র সব গুছাইয়া লও।

আমি।—যখন সংসারের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল, তখন আবার গুছাইব কি? আমি এক বস্ত্রে যাইব।

স্বামী।—সুবালাকে আমি যে সব জামা কাপড় খরিদ করিয়া দিয়াছি, তাহা লইয়া যাও; আমাকে কষ্ট দিও না, আমি তোমাকে যে সকল সামগ্রী খরিদ করিয়া দিয়াছি, তুমি তাহাও লইয়া যাও।

আমি।—বিবাহের পর ছয় বৎসর আমি তোমার চরণ ধরিবার অবসর পাই নাই, তুমিই দাও নাই। আজ সেই চরণ ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল, একবার বল, আমার মুখের দিকে তাকাইয়া একবার বল, আমার শিশুকন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া একবার বল, আমার মাথায় হাত দিয়া একবার বল,—আমি তোমার দৃষ্টিতে নিরপরাধিনী কিনা? তুমি একবার বলিলে আমার সকল জ্বালা জুড়াইবে, আমি সকল দুঃখ পাসরিব। বল নাথ, একবার বল।

স্বামীর চরণ ধরিয়া আমি ঊর্দ্ধমুখ হইয়া কাঁদিতে ছিলাম। আমার মুখের দিকে চাহিয়া স্বামী ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, দুই করে আমার দুই গণ্ড চাপিয়া ধরিয়া অধরের উপর একটী চুম্বন দিয়া, কোঁচার কাপড়ে

বলিলেন, "ফুল! অমন করিয়া কাঁদিও না, তোমার মুখ দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়, তোমার কথা শুনিলে আমি পাগল হইয়া উঠি; শেষে কি আফিং খাইয়া মরিব? ফুল! তুমি আমার সর্ব্বস্ব; সুখ ঐশ্বর্য্য বিভব বিলাস জীবন যৌবন—আমার সর্ব্বস্বই তুমি। তুমি সতী, তুমি সাধ্বী; আমার দৃষ্টিতে তুমি আমার ইষ্টদেবী, তোমাকে ছাড়িতে, তোমাকে ত্যাগ করিতে আমার যে কত কষ্ট হইতেছে, আমার হৃৎপিণ্ড কি ভাবে ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, তাহা কেমন করিয়া তোমাকে বুঝাইব। আমার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া দেখ, আমি একদিনেই পঞ্চাশ বৎসরের বুড়া হইয়া পড়িয়াছি।"

আমি।—তবে আমায় পায়ে ঠেলিতেছ কেন? প্রভু, চল দুজনে দেশান্তরে যাই, ভিক্ষা করিয়া খাইয়া দিন যাপন করি।

স্বামী।—ছি! ওকথা বলিতে নাই; ঈশ্বর নিরাকার অজ্ঞেয় পুরুষ; কিন্তু এ জগতে পিতা-মাতা সজীব ও সাকার দেবতা। আমার সেই দেবতাই তোমাকে ত্যাগ করিতে বলিতেছেন; তুমি যাহাই হও না কেন, সতী হও, সাধ্বী হও, পতিব্রতা হও,—তুমি আমার পিতা-মাতার পরিত্যক্তা, তোমাকে লইয়া আমি আর সংসার সুখে সুখী হইতে পারিব না। তুমি যাও, মনে রাখিও, তোমার পরেশ মরিয়াছে, তুমি বিধবা হইয়াছ। আমার এ দেহ আমার নহে, পিতা-মাতার, তাঁহাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন। আমাকে হয়তঃ আবার বিবাহ করিতে হইবে; ক্ষত স্থানকে আবার ছেদ করিয়া লবণ প্রলেপ দিতে হইবে।

এই কথা বলিয়া স্বামী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, আমি ছিন্ন মূল ব্রততীর ন্যায় ধূলায় লুটাইয়া পড়িলাম।

৮

আমি এখন পিত্রালয়ে। আমার স্বামী আবার বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহার দুটী পুত্রসন্তান হইয়াছে, তিনি এখন চাকরি করিতেছেন।

আর আমি সধবা হইয়াও বিধবা হইয়া আছি; আমার সে রূপ নাই, সে লাবণ্য নাই, সে আদর নাই, সে সোহাগ নাই। জীবনের অবলম্বনের মধ্যে আমার কন্যা, সে আমার কাছে আছে;—আর পূর্ব্বেকার সে সুখ-স্বপ্নের সুখ-স্মৃতি আমাকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। অতীত জগতে আমার অধিষ্ঠান, আমার পক্ষে বর্ত্তমানও নাই আর ভবিষ্যতও নাই।

ছাই রূপ! রূপের জন্যই ত এত হইল! সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্। আমার রূপের অত্যন্ত আদর হইয়াছিল; তাই সে পোড়া রূপের জন্য আমি এখন ধূলায় লুটাইতেছি। স্বর্গের দেবতা আমার চরণতলে বসিয়া আমার মুখেন্দু-প্রভা দেখিতেন, আর এখন আমি, স্বর্গের দ্বার কবে খুলিবে, তাহারই অপেক্ষায় দিন গণিতেছি।

ছাই রূপ। রূপ না থাকিলে হয়ত এতটা হইত না। আমার স্বামী পূর্ব্বে আমার রূপপূজা করিতেন, আর আমি তাঁহার দিবানিশি রূপ পূজার ধূম দেখিয়া মনে মনে কেবল বিরক্তি প্রকাশ করিতাম; এখন তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি।

রূপের এ তুষানল, রাবণের চিতার ন্যায়, আমার দেহের উপর আমরণ জ্বলিবে। আমি মরিব না,—কিন্তু বাঁচিতে পারি কৈ?

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাস।

(ষোড়শ প্রস্তাব)।

৭৭। সংবাদ-লস্কর।

(১২৫৮ সাল—১৮৫১ খৃষ্টাব্দ)।

নীলকমল দাস, "সংবাদ-লস্কর"-নামক একব্যক্তি, সমাচার-পত্র-পারাবারের কাণ্ডারী ছিলেন। এটী, একটী সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ। ইহার স্থায়িত্ব, মূল্যের পরিমাণ, প্রাতিপাদ্য বিষয়-সমুদয়—ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারই, এত কালের ব্যবধানের পর আমাদের সম্যক্ অগোচর।

৭৮। বঙ্গ-বার্ত্তাবহ।

(১২৫৯ সাল—১৮৫২ খৃষ্টাব্দ)।

ইহাই, পাক্ষিক পত্রিকা-সমূহের অগ্রণী। ইংরাজী-ভাষায় সুশিক্ষিত কতিপয় যুবক, "বঙ্গ-বার্ত্তাবহের" প্রবর্ত্তক। পঞ্চদশ দিবস ব্যবধানে

এই "বার্ত্তাবহ" অকাতরে বহন করিতেন। সাময়িক ঘটনাবলীর উপর মতামত প্রকটিত ও অভিব্যক্ত করিতেই ইহার মুখ্য লক্ষ্য থাকিত।

৭৯। কাশীবার্ত্তা-প্রকাশিকা।

(১২৬০ সাল—১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ)।

নামেই প্রকাশ—পবিত্র বারাণসী-ধামের সংবাদ-প্রচারই, এতৎ-পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। উহাকে এক প্রকৃষ্ট লক্ষ্য বলিতে হইবে। বারোণসীর বার্ত্তার কত মাহাত্ম্য, প্রকৃত ভক্ত ব্যতীত আর কে, তৎ-সমস্ত বিদিত হইতে শক্ত হইবে, বলি দেখি? কিন্তু দুঃখ এই—অদ্যাবধি নির্দ্দিষ্ট নিদর্শন কিছুই মিলিল না।

৮০। জ্ঞানারুণোদয়।

(১২৬০ সাল—১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ)।

রবির আবির্ভাবে অন্ধকার, দূরীভূত হইয়া যায়। জ্ঞান-রূপ অরুণের উদ্ভয়ে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়। কর্ম্মকার কেশব, ইহার কর্ণধার। "জ্ঞানারুণোদয়ের" সন্দর্শন জন্য প্রত্যেক মাসে ।০ (চারি) আনা মাত্র পয়সার প্রয়োজন হইত। সুতরাং বৎসরে বৎসরে মুদ্রাত্রয় (তিনটী টাকা) কেবল দিলেই, "জ্ঞানারুণোদয়ের" সঙ্গে লোকের দেখা সাক্ষাৎ ঘটিত। কিন্তু এক অব্দও, নিঃশব্দে বা সশব্দে, "জ্ঞানারুণোদয়ের" প্রকাশ হইয়াছিল, অথবা উহার কোন বিশেষ বিপদ্ ঘটিয়াছিল কি না, সংশয় হয়। তাহার কারণ, উক্ত বৃত্তান্তের সম্যক্ বিবরণের একান্ত অসদ্ভাব।

অতঃপর পরবর্ত্তী বর্ষের অধিকারে গিয়া পড়িতে হইতেছে। পশ্চাৎ পাঠক-পুঞ্জের দৃষ্টিপথে ইহাই নিপতিত হইবে যে, তখন এক অভিনব যুগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

৮১। সুধাবর্ষণ।

(১২৬১ সাল—১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ)।

এত ক্ষণের পর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের বর্ণনায় ব্যাপৃত হইতে হইবে। সংবাদ-পত্র-মহলে "সুধাবর্ষণ"কে সার্থক নাম লইয়া, স্বীয় অব্যর্থ সামর্থ্য

হয়, বলুন দেখি? যে কারণত্রয়ে "সুধাবর্ষণ" অন্বর্থতা প্রাপ্ত হইয়াছিল—এই স্থলই, তাহার বিবরণের অপ্রতিকূল। প্রথমতঃ, এটী একটী আহ্নিক পত্রিকা। দ্বিতীয়তঃ, বাণিজ্য-ব্যাপার-মূলক বিষয়েই, এতৎ-পত্র, সম্পূর্ণ শক্ত ও সমর্থ। তৃতীয়তঃ, বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষায় যাহায় পরিচালনা চলিয়াছিল, তাহাকে উপেক্ষার সামগ্রী মনে করা অসাধু। মাসে মাসে ১৲ (এক মুদ্রার) সাহায্য দ্বারা লোকের ঘরে ঘরে প্রতি দিবস ইহা কর্ত্তৃক অমৃত বৃষ্টি হইত।

৮২। বঙ্গবিদ্যা-প্রকাশিকা।

(১২৬১ সাল—১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ)।

ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত, একান্তই অপরিজ্ঞাত। এতাবৎ-কাল পর্য্যন্ত যাবৎ পত্র, জাত ও মৃত হইয়াছিল, তাহাদের ব্যাপার, সর্ব্বসাধারণের অগোচর রাখি নাই। "বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা" পত্রিকা, ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, কি কি সুকার্য্য বা কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তত্তাবৎ ব্যাপার, নর-লোকের জ্ঞানগোচর হইতে পায় নাই—এইটীই, আমাদের নিতান্ত মনস্তাপের নিদান। তবে নাম দেখিয়া, মনে হয়—বঙ্গের জ্ঞান-রত্নের কতকটা প্রচার, ইঁহার চেষ্টায় হইয়াছিল।

৮৩। সংবাদ-চারু-চন্দ্রোদয়।

(১২৬৩ সাল, অগ্রহায়ণ—১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ নবেম্বরের শেষার্দ্ধ ও ডিসেম্বরের প্রথমার্দ্ধ)

যে যে বিষয়, জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহা এই,—

ক। সম্পাদক—বাবু নিমাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

খ। মাসিক মূল্য—।০ (চারি) আনা।

গ। বাৎসরিক মূল্য—২৷৷০ (আড়াই) টাকা।

ইহার অনুষ্ঠান-পত্র-সম্বন্ধে "সংবাদ-প্রভাকরে" নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্‌ক্তি লিখিত হইয়াছিল,—

"কতিপয় বিদ্যানুরাগী যুবক, আগামী অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমাবধি "সংবাদ-চারুচন্দ্রোদয়" নামে একখানি নূতন সাপ্তাহিকপত্র প্রকাশকরণে

স্থিরসঙ্কল্প হইয়া, তাহার অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশ পূর্ব্বক গ্রহণেচ্ছু মহাশয়-দিগের স্বাক্ষর গ্রহণ করিতেছেন।" (১)

উল্লিখিত লিপির প্রচারের অষ্টাদশ দিবস পরে "প্রভাকর"-সম্পাদক কবিপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়, পুনরায় লিখিয়াছিলেন,—

"আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে, "সংবাদ-চারু-চন্দ্রোদয়" নামে এক-খানি সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র, এতন্নগরে কোন বিদ্যানুরাগী যুবক কর্ত্তৃক প্রকটিত হইবেক। অধুনা আমরা, তাহার অনুষ্ঠানপত্র প্রাপ্ত হইয়া, নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম। কোন্ দিবসাবধি ঐ পত্র, প্রকাশারম্ভ হইবেক, তাহা এ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই। বোধ হয়, শতাধিক লোকের স্বাক্ষর না হইলে, প্রকাশক, পত্র-প্রকাশে সাহসিক হইবেন না।" (২)

"অনুষ্ঠানপত্র।

"জ্ঞান-ইন্দীবর আছে হৃদি-সরোবর।
অজ্ঞান-ভাস্করে তারে জর জর করে॥
মুকুলিত ছিল যাহা বিকসিত হয়।
অঘন গগনে হেরি 'চারুচন্দ্রোদয়'॥"

"পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমান সময় এই বঙ্গদেশবাসী ব্যক্তিবৃন্দ, বঙ্গভাষানু-শীলন-বিষয়ে বিলক্ষণরূপে যত্নবান্ হইয়াছেন। অতএব আমরা বর্ত্তমান সময়কে জ্ঞান-সময় বিবেচনা করিয়া "সংবাদ-চারু-চন্দ্রোদয়" নামে এক-খানি অভিনব সংবাদ-পত্র-প্রকাশকরণে স্থিরসংকল্প হইয়াছি। ঐ পত্র, "সংবাদ-প্রভাকরের" ন্যায় নানা দিগ্‌দেশীয় সমাচার ও গদ্য-পদ্য পরি-পূরিত বিবিধ দেশহিতজনক প্রবন্ধ ও ইংরাজী গ্রন্থ হইতে নানাপ্রকার উত্তম বিষয়ের অনুবাদ প্রকাশ করিবেন। আমরা, এই অনুষ্ঠান-পত্রে অন্য কোন প্রকার প্রতিজ্ঞা করিতে ইচ্ছা করি নাই। কার্য্যের দ্বারাই সকলে, আমাদিগের অভিপ্রায় ও পরিশ্রমের প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন। পরন্তু সাধারণ বিদ্যানুরাগী মহোদয়গণের বিহিত সাহায্য ব্যতীত এত-ন্মাঙ্গলিক বিষয়, কোনরূপেই সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। এ কারণে

(১) সংবাদ প্রভাকর, ১২৬৩ সাল, ৫ই কার্ত্তিক।

(২) সংবাদ-প্রভাকর, ১২৬৩ সাল, ২৪শে কার্ত্তিক।

বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা, আমার নবীনোৎসাহ বর্দ্ধনার্থ এই অনুষ্ঠানপত্রে আপন আপন নাম স্বাক্ষর করিবেন। আমরা সাধারণের পাঠ-সুলভ নিমিত্ত "সংবাদ-চারু-চন্দ্রোদয়ের" মাসিক মূল্য ।০ (চারি) আনা অথবা বার্ষিক অগ্রিম ২৷৷০ টাকা নির্দ্ধারণ করিয়াছি।"

শ্রীনিমাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক।

মধ্যে এক বৎসরের ব্যবধান। ১২৬২ সাল, (১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) বিনা কার্য্যেই অতীত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর "জ্ঞানদর্পণ" দশজনকে দর্শন দিয়াছিলেন।

৮৪। জ্ঞানদর্পণ।

(১২৬৩ সাল, ৯ই পৌষের অর্থাৎ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের
২৩শে ডিসেম্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়।)

"সংবাদ-প্রভাকর" না কি আমাদের শুভাদৃষ্টক্রমে সুপ্রসন্ন ছিলেন, সুতরাং "জ্ঞানদর্পণের" বিবরণ, আমাদের সকলের সন্দর্শনযোগ্য হইল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতিরেকে কেইবা মৌখিক একটা উক্তিতে ভক্তিমান্ হয়? আমরা প্রমাণবলে বলীয়ান্ হইয়াছি, সুতরাং নিম্নে তাহার নিদর্শন লিপিটী, নিবদ্ধ করিয়া দিলাম,—

"আমাদিগের (৩) বন্ধুবর পূর্ব্বতন "জ্ঞানদর্পণ"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়, এই কর্ম্মের (ভদ্রলোকদিগকে বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে ঠিক বর্দ্ধমান সহরের ভিতর আনয়নের) অধ্যক্ষ"। (৪)

জানা গেল—সম্পাদকের নাম ছিল—বাবু "উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য"। মতান্তরে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে (১২৫৪ সালে) ইহার প্রথম প্রকাশ। বার্ষিক মূল্য ৪।০ (চারি টাকা চারি আনা) বৈ নয়। পত্রিকাটী সাপ্তাহিক।

আগামী বারে "সোমপ্রকাশ", "এডুকেশন গেজেট" প্রভৃতি অন্যান্য সংবাদ-পত্রের বিষয় আলোচিত হইবে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

---

(৩) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের। কেন না, উক্ত উদ্ধৃত অংশ, উক্ত কবি-পুঙ্গব গুপ্ত মহোদয়ের 'ভ্রমণবিবরণ' সন্দর্ভের সারাংশ।

(৪) সংবাদ প্রভাকর, ১২৬৩ সাল, ৯ই পৌষ।

গোকুলে-শ্রীকৃষ্ণ।

ভক্তবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবিধ পুরাণ শাস্ত্রে কৃষ্ণলীলা পাঠ করিয়াছেন, কবি কল্পনার যথেষ্ট মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের সারসংগ্রহ করিতে বোধ হয় সম্পূর্ণরূপেই সমর্থ হইয়াছেন।

কৃষ্ণলীলা অনেক প্রকার।—ঋষিপ্রণীত কৃষ্ণলীলা, গোস্বামী প্রণীত কৃষ্ণলীলা, বৈষ্ণবপ্রণীত কৃষ্ণলীলা, গোঁড়াপ্রণীত কৃষ্ণলীলা, ইত্যাকার নানা শ্রেণীর নানাজনপ্রণীত কৃষ্ণলীলার পুস্তক আমাদের দেশে অনেক আছে। এতদ্ব্যতীত এতদ্দেশীয় ওস্তাদী কবিতে এক এক প্রকার কৃষ্ণলীলা গীত হয়;—এতদ্দেশীয় যাত্রাতে, আধুনিক থিয়েটারগুলিতে এক এক প্রকার কৃষ্ণলীলার সুন্দর সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করা হয়;—আমাদের প্রেমাস্পদ আদরণীয় অকালমৃত সাহিত্য-বন্ধু বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণসাগর মন্থন করিয়া একখানী কৃষ্ণ চরিতামৃত তুলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; এই সকল ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে এবং যাত্রাদির অভিনয়ে পরস্পর কতদূর প্রভেদ, আবিষ্টচিত্ত পাঠক ও দর্শক মহাশয়েরা তাহা অবশ্যই বুঝিয়া লইয়াছেন।

এদেশে কৃষ্ণলীলার পাঠক অনেক, অভিনয়-ক্ষেত্রে দর্শকও অনেক; কিন্তু কৃষ্ণ বাস্তবিক কি, দেশের সকলে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন, দুঃসাহসে তেমন মিথ্যা কথা আমরা বলিতে পারিব না। শ্রীকৃষ্ণের রূপ কি, প্রকৃতপক্ষে অবশ্যই তাহা পরিজ্ঞাত হইবার উপায় নাই। কৃষ্ণ অবতারের পূর্ব্বে কৃষ্ণের কি প্রকার রূপ ছিল, ভারতের সাময়িক কবিকুল তাহা এক এক প্রকারে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কজন লোক, ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখিয়া সহসা সেই সকল রূপকে কৃষ্ণ বলিয়া চিনিতে পারেন? ময়ূরপুচ্ছশোভিত মোহনচূড়া, নানাবর্ণ রঞ্জিত পীতধড়া, গোপিকারঞ্জন মোহনমুরলী ঠাম ত্রিভঙ্গ, বক্ষে ললাটে সুগন্ধ শুভ্রচন্দন, এই গুলির একত্র মিলন না হইলে, এখনকার কৃষ্ণভক্তেরা এখন কৃষ্ণকে কৃষ্ণ বলিয়া চিনিতে পারেন না। কৃষ্ণ যখন ব্রজধামে, চূড়াধড়া পরিয়া গোচারণ করিতে প্রবৃত্ত হন নাই, তাহার বহু পূর্ব্বে ধ্রুব, প্রহ্লাদের সিদ্ধিলাভ। প্রচলিত প্রমাণানুসারে ভক্তশ্রেষ্ঠ ধ্রুব প্রহ্লাদও সেই সত্য-

যুগেও ব্রজরাজরূপী ত্রিভঙ্গিমঠাম কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করিলে, বাস্তবিক তাহার প্রকৃত রূপ নির্ণয় করা অসাধ্য। যিনি হরি, যিনি নারায়ণ, যিনি নৃসিংহ, যিনি অসীম, অনন্তনামধারী, তিনিই কৃষ্ণ; ভক্তের মনে এইরূপ বিশ্বাস; ধ্যান করিবার সময় কিন্তু তাঁহারা গোপিনীরঞ্জন. কৃষ্ণ-রূপ ভিন্ন আর অন্যরূপ ভাবিতে পারেন না।

কৃষ্ণ বাস্তবিক কি?—রূপে যেমন মানুষের ভ্রম হইতেছে,শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রেও সেইরূপ প্রবল ভ্রম থাকা বিচিত্র নহে। এখনকার সাধারণ সংস্কার, প্রায় এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, কৃষ্ণ একটি গোপান্নপালিত, মাখনচোরা, বসনহরা, লম্পট বালক ছিল। ব্রাহ্মণ কায়স্থের—অপর জাতীয় নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা কৃষ্ণকে, সত্য সত্যই, গোপালবালক বলিয়া জানে; শৈশব চরিত্রও কলঙ্কিত মনে করে। ভক্তের পক্ষে এ প্রকার গুরুতর ভ্রম থাকা কদাচ মঙ্গলসূচক নহে; অতএব অতি সংক্ষেপে এইখানে আমরা অগ্র কৃষ্ণের শৈশব লীলাটি দর্শন করিবার চেষ্টা পাইব।

একাদশ বর্ষকাল গোকুলে আর বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান। তাহার অধিক নহে। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে অক্রুরের রথে কৃষ্ণ বলরাম মথুরায় কংসযজ্ঞে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন; তাহার পর আর গোকুলে অথবা বৃন্দাবনে ফিরিয়া যান নাই। একাদশ বর্ষ মাত্র ঐ দুই স্থানে অবস্থিতি। সেই একাদশ বৎসরের মধ্যে কদিন গোপের অন্ন শ্রীকৃষ্ণের উদরস্থ হইয়াছিল, সাধারণ অন্তরে সেই নিগূঢ় তত্ত্বটি নিরূপণ করিবার ইচ্ছার উদয় হয় না;—গোপালয়ে কৃষ্ণ ছিলেন, গোপের অন্ন ভক্ষণ করিয়াছেন, ইহাই সাধারণ লোকে আপন আপন মনে সিদ্ধান্ত করিয়া লয়। এ সিদ্ধান্তে ভ্রম কোথায়, তাহাও আমরা এই স্থলে দেখাইবার প্রয়াস পাইব।

শ্রীকৃষ্ণ গোপের অন্ন ভক্ষণ করেন নাই। একাদশ বৎসর কেবল ক্ষীর সর নবনী ভোজন করিয়াই পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন। দুটি দিন মাত্র অন্ন ভোজনের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে দিন মহর্ষি গর্গ নন্দালয়ে আগমন পূর্ব্বক পায়সান্ন রন্ধন করিয়াছিলেন, সেইদিন এক আশ্চর্য্য দৃশ্য সংঘটিত হইয়াছিল। ঋষি যখন নারায়ণায় নমঃ বলিয়া পায়সান্ন উৎসর্গ করিয়া দেন, শিশু কৃষ্ণ তখন হামাগুড়ি দিয়া গিয়া সেই অন্ন ভক্ষণ

কৃষ্ণকে, নিকটে যাইতে দেন না। ঋষি পুনর্ব্বার রন্ধন করেন, নিবেদন করিবামাত্র কৃষ্ণ আসিয়া অগ্রে আহার করিতে বসেন। তিন-বার এইরূপ হয়। চতুর্থবারে নন্দরাণি সক্রোধে কৃষ্ণকে একটা ঘরে আবদ্ধ করিয়া দ্বারে চাবি দেন। চতুর্থবার গর্গ ঋষি নূতন পায়সান্ন উৎসর্গ করিবামাত্র কৃষ্ণ আসিয়া ভোজনপাত্রের সম্মুখে উপবিষ্ট। অজ্ঞান শিশুর কার্য্য ভাবিয়া পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহারা পুনঃ পুনঃ ভীত হইয়াছিল, এবারে তাহাদের সকলেরই মহাশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। একদ্বারী গৃহ; চাবিবদ্ধ বালক; চাবি অভগ্ন; বালক কি প্রকারে ঋষি সন্নিধানে উপস্থিত হইল?

বার বার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সন্দর্শনে ঋষির মনে সংশয় জন্মিল; ঋষি তখন ধ্যানে বসিলেন। ধ্যানে জানিলেন, কৃষ্ণ কে?—তখন তিনি প্রেমানন্দপূর্ণ রোমাঞ্চিত কলেবরে অগ্রে স্বহস্তে কৃষ্ণকে, পায়সান্ন ভক্ষণ করাইয়া, তদনন্তর স্বয়ং ভক্তিভাবে সেই প্রসাদ ভোজন করিলেন। অপরাধ ক্ষমা পাইবার জন্য যশোদা আসিয়া ঋষিবরের পায়ে ধরিলেন; ঋষিবর তাঁহারে নিগূঢ় তত্ত্ব বলিলেন। মায়াবশে নন্দরাণী সে তত্ত্ব অতি শীঘ্র ভুলিয়াই অভ্যাসসিদ্ধ পুত্রস্নেহে শ্রীকৃষ্ণকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অন্ন ভোজনের এই একটি প্রমাণ। দ্বিতীয় প্রমাণ, বনমাঝে অন্নভিক্ষা। রাখালরাজ একদিন রাখালমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া অন্ন ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন; ঋষিকন্যাগণের নিকট হইতে অন্ন ভিক্ষা করিয়া আনিবার নিমিত্ত শ্রীদাম সখা প্রেরিত হন; ঋষি কন্যারা স্নেহানন্দে বিভোর হইয়া স্বয়ং স্বয়ং বন মধ্যে আগমন পূর্ব্বক কৃষ্ণকে কোলে লন, মনসাধে অন্ন ভোজন করান; কৃষ্ণের সহিত রাখালেরাও পরমপুলকে সেই অন্ন ভোজন করে।

এই দুই প্রমাণে বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিবে, ঐ দুই দিবস ব্যতীত কৃষ্ণ আর একদিনও গোপগৃহে অন্ন গ্রহণ করেন নাই। তাহা যদি করিতেন, নিত্য নিত্য অন্ন ভক্ষণ করা তাঁহার যদি অভ্যাস থাকিত, তাহা হইলে পুরাণে ঐ দুই দিবসের এত মাহাত্ম্যমূলক বিশেষ উল্লেখ থাকিত না। যাহারা নিত্য নিত্য অন্ন ভোজন করে, তাহাদের দুই একটা উপলক্ষের কথা কেহই ধরে না। নিত্য অন্নভোজী হইলে কৃষ্ণের ঐ দুই দিবসের [illegible] আবির্ভাব হইত না।

(ক্রমশঃ)

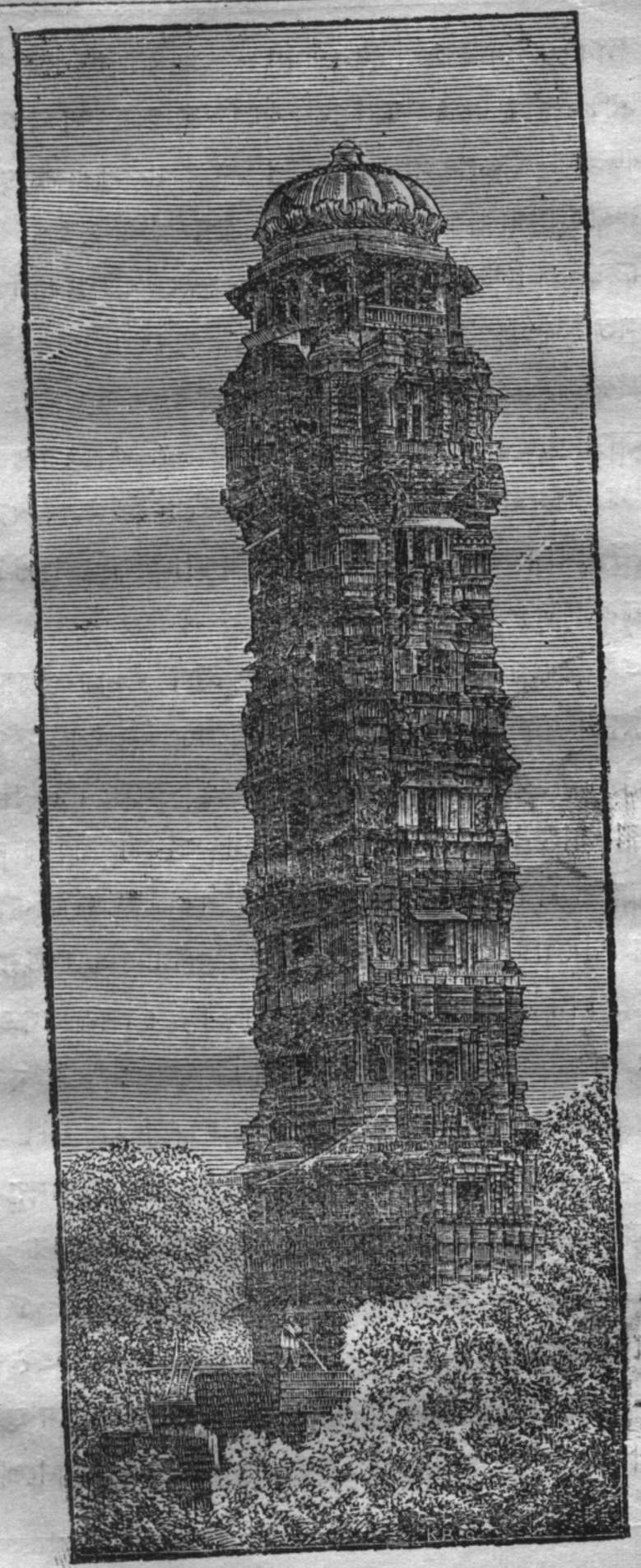

চিতোর।

সূর্য্যবংশের কোশল রাজ্যে প্রধান অধিষ্ঠান; এবং তাঁহাদিগের রাজধানী অযোধ্যা। তাই সূর্য্যবংশাবতংস রাজা রামচন্দ্রের রাজধানী

অযোধ্যানগরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি রাজকার্য্য পরিচালনে আদর্শ-পুরুষ ছিলেন। কুশ এবং লব নামক তাঁহার দুই পুত্র ছিল। তৎপরে রাজা রামচন্দ্রের বংশ-স্রোতের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গেলেও, পর্য্যায়ক্রমে তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস সাধারণের সম্পূর্ণ বিদিত নহে; তবে মিবারের রাণাগণ আপনাকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত করায়, এই স্থানে অদ্য চিতোরের কথা কিছু বলা যাইতেছে।

রাজা রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশের পবিত্র বংশে বাপ্পারাও নামক এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন; ইনিই ৭২৮ খৃষ্টাব্দে—"চিতোর-গড়" নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। উপস্থিত এই দেশে যাইতে হইলে, রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুরে হোলকার সিন্ধিয়া ষ্টেট রেলওয়ের একটী ষ্টেশন আছে।

পূর্ব্বে এই দেশের নাম ছিল "চিত্রকূট"; ইহার উল্লেখ রামায়ণ-গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। সেই রামায়ণের "চিত্রকূট" পর্ব্বত কালে পরিবর্ত্তন হইয়া চিতোর হইয়াছিল;—ইহাই অনেকের ধারণা। এই চিত্রকূট দিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাহরণ করিয়া লইয়া যান, এবং এখানে জটায়ু পক্ষীর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ হয়। ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে, সিংহলে যাইবার পথ চিত্রকূট দিয়া ছিল। এবং উক্ত পাহাড়ের উপর তখন কোন রাজার অধিকার ছিল না; কেবল অসভ্য পাহাড়ী-দিগের এবং পশু পক্ষিগণের বাস ছিল। বস্তুতঃ এই বন জঙ্গলময় পার্ব্বত্য প্রদেশ কালে চিতোর নগরে পরিণত হইল। *

চিতোর গড়টী দূর হইতে দেখিতে ইংলণ্ডের উইণ্ডসর প্রাসাদের মত। যাঁহারা এই নগর দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভারতের অমরাবতী বা গোলকের চিত্র হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়াছেন! যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহাদের কল্পনাবলে দেখাইবার চেষ্টা করা বৃথা। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, একটী সুবৃহৎ ক্রমোচ্চ পর্ব্বতের গাত্রে যেন, স্থানে স্থানে সুবৃহৎ জলাশয়, স্থানবিশেষে বনরাজি, কোথাও বা অট্টালিকাশ্রেণী। এই

---

* অনেকেই আবার চিত্রকূট দাক্ষিণাত্যে বলিয়া, তাহার সংস্থানের বিপর্য্যয় ঘটাইয়া, ইহাকে চিত্রগূঢ় বা চিত্রগড়ের অপভ্রংশ নাম চিতোর

পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে যে সুবৃহৎ নয়নরমণ হর্ম্ম্য, তাহাই রাজপ্রাসাদ, এবং উহার অপর নাম চিতোর গড়।

চিতোর গড়ের দীর্ঘ ৫৭৩৫ গজ এবং প্রস্থ ৮৩৬ গজ। ইহার ভিতর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলাশয় আছে, দুর্গ আছে, কতকগুলি কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে, শস্য-ক্ষেত্র আছে, তথায় গোধূম এবং চণকের কৃষি ও উৎপত্তি বিশিষ্টরূপ; এমন কি, অনেক খ্যাতনামা মুসলমানদিগকে পর্য্যন্ত রাখি দিয়া ধর্ম্মভ্রাতা পাতাইয়া রাখিতেন। যে সকল অপরিচিত পুরুষদিগকে স্ত্রীলোকেরা রাখি দিত, তাঁহারা অনেকে সে সকল কামিনীদিগের মুখ দর্শনও করেন নাই। পরন্তু এই সম্মান পাইয়া তাঁহারা বিপদের সময় ঐ সকল হইয়া থাকে, কিন্তু গবাদি পশুদিগের খাদ্য তৃণের বড়ই অভাব। পরন্তু গড়ের ভিতর অনেক দেব দেবীর মন্দির আছে। তন্মধ্যে "মোকল-জীর মন্দির" সুদীর্ঘ।

মোকলজীর মন্দির ৭২ ফিট্ দীর্ঘ এবং উত্তর দক্ষিণ ৬০ ফিট। ইহাকে গিরিমন্দির বলা যাইতে পারে। পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত ও প্রকৃতই যেন পর্ব্বতের গুহারূপে তাহার তোরণ রচিত করিয়া দিয়াছেন। এবংবিধ পার্ব্বত্য মন্দিরের নির্ম্মাণ কৌশল প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে হয়, পর্ব্বতের গাত্র কাটিয়া ক্রমে সহজভাবে যেন একটী রথ প্রস্তুত করা হইয়াছে; সেই রথসদৃশ মন্দিরটী দেখিতে অতি সুন্দর; সেই সৌন্দর্য্য আরও পরিস্ফুট হইয়াছে, প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যময় অতি ভয়াবহ স্থানে বলিয়া। এই বৃহৎ মন্দিরের ভিতর দিবালোক প্রবেশ করে না। অন্ধকারময় স্থান। মন্দিরের গাত্রে নগরের অবস্থাজ্ঞাপক অনেক চিত্র আছে।

চিতোর গড়ের স্তম্ভগুলির মধ্যে "জয়স্তম্ভ" বিশেষ উল্লেখযোগ্য; এটী বিশেষ কারুকার্য্যযুক্ত অথচ কলিকাতার মনুমেণ্টের মত উচ্চ। ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার গাত্রে বিবিধ শ্লোকে নগরের অবস্থা লিখিত আছে। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে "জয়স্তম্ভের" চিত্র দেওয়া হইয়াছে।

চিতোর গড়ের কেল্লার ভিতর শস্য ক্ষেত্র আছে, জলাশয় আছে এবং কেল্লার দক্ষিণ ভাগের প্রাচীর ১৮১৯ ফিট উচ্চ। উত্তর ভাগে

হোলকার মহারাজের অধিকার ভুক্ত। সময়ে, ইহা আকবরের অধিকার-ভুক্ত ছিল।

এই সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পল্লী লইয়া চিতোরের রাজধানী। এবং এই রাজপ্রাসাদ-বেষ্টন প্রাচীরে বহু তোরণ-দ্বার আছে। এখন যেমন লৌহের রেলিং হইয়াছে, তখন তাহা ছিল না; তখন প্রাচীর ছিল, এবং প্রাচীর-বেষ্টিত প্রাসাদকে "গড়বন্ধী" বা "গড়" বলিত।

চিতোরগড় শৈলোপরি ৩।৪ মাইল উর্দ্ধে শিখরদেশে বনের ভিতর। এই স্থান হইতে শৈলের নিম্নস্থ নগর ইত্যাদি কামানের দ্বারা অনায়াসে নষ্ট করা যায়। এই শৈলের ৩।৪ মাইল নিম্নে "চিত্রকূট" দেশ। এখন এই দেশকে "তলহাটী" কহে। এই পর্ব্বতের সমতল হইতে ৪৫০ ফিট উচ্চে চিতোর গড়।

রাণা বাপ্পরাওয়ের বংশীয়গণ রাজপুত ক্ষত্রিয়গণের শিরোরত্ন। সূর্য্য-কুলতিলক মহাবীর রামচন্দ্রের বংশধরগণ ক্রমবিক্ষেপে রাজপুতরূপে পর্য্যবসিত। পরন্তু ইহাঁরা বহুদিন পর্য্যন্ত চিতোরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৭২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাণাগণ চিতোরে রাজত্ব করেন। এই কাল মধ্যে চিতোরে অনেক বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহাবীর সমরসিংহ, প্রতাপসিংহ, বাদলসিংহ, কুম্ভরাণা এবং ভীমসিংহ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট আকবর উদয়সিংহের নিকট হইতে এই নগর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পাইয়াছিলেন।

মিবারের রাজপুতগণের স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা—তজ্জন্য যুদ্ধে আত্মোৎ-সর্গ বিশেষ অতুলনীয়। এইরূপ আত্মরক্ষার্থক কোন একটী ভীষণ সংগ্রামে, এত রাজপুতের প্রাণ উৎসৃষ্ট হইয়াছিল যে, উহাদের উপবীত ওজন করিয়া ৭৪৷৷০ মন হইয়াছিল। তাই অদ্যাপিও হিন্দুরা কোন গোপনীয় পত্রের পৃষ্ঠে ৭৪৷৷০ দাগ দিয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "অপর যিনি এই পত্র খুলিবেন, তিনি ৭৪৷৷০ মন উপবীতধারী দ্বিজহত্যার পাপ গ্রহণ করিবেন।"

সহজে চিতোর বশীভূত হয় নাই। যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও, অনেক রাজপুত প্রধান গুপ্তভাবে পর্ব্বত গহন কাননাদি আশ্রয় করিয়া, অবসর-ক্রমে মুসলমানদিগের অনেক ক্ষতি করিয়াছিলেন। এমন কি, ইহাঁরা

ইহারা ধর্ম্মাবলম্বনে মোগল বাদসাহের নিগ্রহ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে অবতরণ করিয়া ইহাঁরা উন্মাদবৎ হইয়া উঠেন, তাই রক্ষোবংশ ধ্বংসের ন্যায় যবনবিনাশেও ইহাঁদের দ্বারা অনেক অভিনীত হইয়াছিল। আজ কাল যেমন পল্লীগ্রামের ভিতর সাহেব দেখিলে, তথাকার লোকেরা অনেকটা ভয় পায়, তখন ইহাঁদের দেখিলে মুসলমানগণ বলিত, "রাজ-পুতকা তলবার, আউর রাজপুত সোয়ার। মাত ঠার হুঁসিয়ার !!" ইহা বড় ভয়ের কথা ছিল।

রাজপুত স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত অসময়ে অথবা প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতে বাহির হইতেন। পরন্তু আমাদের দেশে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এবং এই দেশের "রাখি বাঁধা" প্রথা অনেকটা উদ্দেশ্যে কারণগত ঐক্য দেখা যায়। এখনকার "রাখি বাঁধা" যেমন বৎসরের এক সময়ে হয়, তখন এ প্রথা ছিল না। রাজপুত কামিনীরা এবং অধ্যাপকেরা প্রয়োজন হইলে, অন্যের সঙ্গে "রাখি" সূত্র প্রদান করিয়া, তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্ম ভ্রাতা সম্পর্ক পাতাইয়া রাখিতেন, দেশের মঙ্গলের জন্য এবং বিপদ আপদের জন্য; কিন্তু এখনকার "রাখি সূত্র" যে সে যাহাকে তাহাকে দিয়া থাকে, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুস্থানীরা পার্ব্বণীর লোভে "রাখি" আনিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু রাখির এ নিয়ম নহে। তখনকার রাজপুত হিন্দু-রমণীরা অন্তঃপুর হইতে দেশের প্রসিদ্ধ যোদ্ধা বা ধনী মহাজনদিগকে ধর্ম্ম ভগিনীদিগকে স্বীয় প্রাণ দিয়া রক্ষা করিতেন। এখনকার রাখি-সূত্র যেমন রেশম নির্ম্মিত, তখনকার রাখি বলয় ছিল স্বর্ণ, রৌপ্য এবং হীরকে নির্ম্মিত।

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল।

বাঙ্গালা ভাষার লেখক।

—বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র। বয়ঃক্রম ৪৮ বৎসর। বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ,—আঢ্যকাপ-সাতোটার মৈত্র। পূর্ব্বপুরুষেরা ভট্টাচার্য্য উপাধিতে অভিহিত হইতেন। নিবাস,—বর্দ্ধমানজেলার অন্তঃপাতী গঙ্গাতীরবর্ত্তী মাজিদা-গ্রাম। পিতার নাম ৺রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য। রাজনারায়ণ অতি কৃত-বিদ্য ও ধীমান্ ছিলেন। তাঁহার পিতা ৺হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তেজস্বী ও ধর্ম্মশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অতি যত্নসহকারে পুত্র রাজনারায়ণকে

বলে, রাজনারায়ণ সংস্কৃত ভাষাতেও বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালে পিতা মাতার অজ্ঞাতসারে এক বন্ধুর সহিত দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন, এবং উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া দেশে প্রত্যাগত হন, এই সময়ে ঐ বন্ধুর অনুরোধে তিনি "রসিকরঞ্জন" নামক কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ আদিরস-ঘটিত এবং পূর্ব্বে ইহার বহুল প্রচার ছিল। কিছুদিন বাটীর নিকটবর্ত্তী দুই এক স্থানে বিষয়কর্ম্ম করিয়া অবশেষে তিনি কলিকাতা নগরীতে আগমন করেন। সে সময়ে ৺ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সমাচার চন্দ্রিকা" প্রকাশিত হইয়াছে। রাজনারায়ণ, ভবানীচরণের জীবিতকালে ও মৃত্যুর পরে "চন্দ্রিকার" লেখক ও "রত্নাবলী" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। ১২৫৪ সালে তাঁহার "পঞ্জাবেতিহাস, প্রকাশিত হয়। এই সময়ে কলিকাতায় ভূম্যধিকারীসভা বা "Land-holders" Association সংস্থাপিত হয়। ১২৫৬ সালে রাজনারায়ণ "ভূম্যধিকারী সভার" শাখা সংস্থাপনার্থ রঙ্গপুরে গমন করেন। কিছুদিন রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার সম্পাদকের কার্য্য সম্পাদনের পর ১২৫৭ সালের কার্ত্তিক মাসে ৪৩ বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজনারায়ণের মৃত্যুকালে বিষ্ণুচন্দ্র জননীর ক্রোড়ে। পিতার যত্নে তাঁহার যেরূপ শিক্ষা ও মানসিক উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাহা হয় নাই। তাঁহার শিক্ষার ভার তাঁহার পিতামহ হরচন্দ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মধুসূদনের উপর ন্যস্ত হয়। তাঁহার বাল্যকাল পিতামহের নিকট অতিবাহিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষাও বিষ্ণুচন্দ্র পিতামহের নিকট প্রাপ্ত হন। পিতামহের চরিত্র প্রভাবে ভক্তি ও বিশ্বাসের বীজ তাঁহার হৃদয়ে নিহিত হয়। শিক্ষার্থ পিতামহ বিষ্ণুচন্দ্রকে কোন পণ্ডিতের টোলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এখানে বিষ্ণুচন্দ্র ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মধুসূদন তাঁহাকে টোল ছাড়াইয়া ইংরেজী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। এ সময়ে মধুসূদন কলিকাতায় "ভাস্কর" "প্রভাকর" প্রভৃতি সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদকতায় নিযুক্ত ছিলেন। যে সময়ে "ভাস্কর"-সম্পাদক ৺গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কারারুদ্ধ হন, সে সময়ে "ভাস্কর" পত্রের সমস্ত ভার মধুসূদনের হস্তে ন্যস্ত ছিল। [ক্রমশঃ]

ছায়াসতী।

(২)

রাজকুমার রমণীমোহন উদার ও সরলস্বভাব ছিলেন, তাঁহার কপটবন্ধু অতুল নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য তাঁহাকে কুপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে-ছিল; সুতরাং মন্দবন্ধুর সংসর্গে ও পরামর্শে রাজকুমার বাল্যসীমা অতিক্রম করিতে না করিতে অমিতব্যয়িতায় ও লাম্পট্যদোষে দূষিত হইয়া স্বীয় পিতার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন; কেবল একমাত্র পুত্র বলিয়া অপরিত্যক্ত হইয়াছিলেন।

অতুল প্রস্থান করিলে কুমার উৎসাহিত ভাবে উদ্যানে পাদচারণা করিতে করিতে বারংবার বাতায়নের দিকে চাহিতেছিলেন। বালিকা ইন্দ্র-প্রিয়াও অল্প বয়সেই সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে, রাজকুমারের সর্ব্বদা দর্শনে তাহার কোমল মন প্রণয়পরবশ হইয়াছিল, তাহার আর পুস্তকে যত্ন নাই, সূচীকর্ম্মে অমনোযোগ, সর্ব্বদা উদাসভাবে গবাক্ষে বসিয়া থাকে; এবম্প্রকার রমণীমোহনের মোহন রূপ দর্শনে দিন দিন প্রণয়াঙ্কুর বর্দ্ধিত হইতেছিল। কুমার কথা কহিতে যদিও ইন্দ্রপ্রিয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতে না পারিয়া পুনরায় তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ধীরে ধীরে বাতায়ন সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কুমারের নয়নে নয়ন সম্মিলন হইল, লজ্জায় নতমুখে বসিয়া পড়িলেন, হৃদয় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। রমণীমোহন অবসর বুঝিয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন;—"অমরমোহিনি, সামান্য মানবজ্ঞানে যদি ঘৃণা না কর, তবে কিছু আবেদন করি;—ঐ স্বর্গীয় রূপ-নগরীর দ্বারে এ অধীন ভিখারী বরমাল্যের ভিক্ষার্থী; এক্ষণে তোমার কৃপায় প্রার্থিতলাভে ধনী হইতে অভিলাষী।" লজ্জিতা ইন্দ্রপ্রিয়া তড়িতের ন্যায় তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কুমারের অতৃপ্ত রসনা নিরূপায় হইয়া নিস্তব্ধ হইল, কুমারও সুতরাং অতুলের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে অতুল ও একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক কুমারের নিকট আসিল। কুমার "এই কি সেই স্ত্রীলোক?" ইহা অতুলকে জিজ্ঞাসা করাতে অতুল মাথা নাড়িয়া কুমারের কথায় সায় দিল। কুমারও ক্রমে ক্রমে

কর—কাহার সঙ্গে এখানে আসিয়াছ ইত্যাদি"। পরিচারিকা উত্তর করিল, "আমার নাম যশোদা, আমি কোন্নগরের নীরেন্দ্রলাল বাবুর বাড়ী তাঁহার ভগিনী ইন্দুকে লালনপালন করিতাম; এক্ষণে সে এখানে তাহার মাসীর বাড়ীতে লেখা পড়া করিতে আসিয়াছে; আমিও তাই তার সঙ্গে এসেছি। কেন মশায় আমায় এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?" রমণীমোহন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ইন্দ্রপ্রিয়াকে যদি আমায় দিতে পারিস্, তোকে হাজার টাকা বক্‌সিস করিব।" বৃদ্ধা হাজার কাহাকে বলে তাহা বুঝিত না, শিহরিয়া উত্তর করিল, "না বাবু, আমি তা পারবো না। বাপ্‌রে! তা কি হয়? ঐটি পেটে ওর মা বিধবা হয়েছিল। তাই তিনি মেয়েকে চক্ষে হারান্! তাহা হইলে মা মরে যাবেন! বড় আদারের মেয়ে গো! হাতে হাতে বেড়ায়! কেবল মা বড় লেখা পড়া ভালবাসেন বলে, তাই শেখাতে এখানে পাঠাইয়াছেন!" রমণীমোহন ব্যগ্রভাবে বলিলেন, তোমায় পোনের শত টাকা দিব, তুমি ইন্দ্রপ্রিয়াকে বলিও যে, "রমণীমোহন রায় বলে এক জন তোমায় বিবাহ করিতে চাহে; কিন্তু লুকিয়ে।" কারণ আমার বাপ আছেন; তিনি জানিতে পারিলে বিবাহ হইতে দিবেন না। তোমার ইন্দু আমাকে চেনে, বলিও, "যাকে তুমি তোমাদের বাটীর পার্শ্বের বাগানে সর্ব্বদা দেখিতে পাও, ও যে তোমাকে তোমার গোলা তুলিয়া দিয়াছিল। তিনি যদি রাজী হন, তাহা হইলে আমার একটি বন্ধু গড়পারে থাকেন, সেইখানেই আমাদের বিবাহ হইবে। "দেখ ঝি, এ কথা যেন ইন্দ্র-প্রিয়ার মাসীও না জান্তে পারেন। অতুল বৃদ্ধাকে উৎসাহ দিয়া বলিল, "দেখ ঝি, তুমি যদি ইন্দ্রপ্রিয়াকে বাবুকে দিতে পার, তা হইলে সেত রাণী হবেই, আর তোমার যে যেখানে আছে, কাহাকেও কখন খেটে খেতে হবে না।" বৃদ্ধা শত টাকা বুঝিত; পোনের শ টাকা শুনিয়া তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল! কুমারকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া টাকার স্বপন দেখিতে দেখিতে ও কুমারের প্রদত্ত ১০৲ টাকা অঞ্চলে বাঁধিতে বাঁধিতে উদ্যান হইতে বহির্গত হইল। কুমারও অতুলের সহিত উদ্যান হইতে গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমনুজেন্দ্র দত্ত।

গীত।

ভজ'রে মন, হরি জনার্দ্দন,
কংসধ্বংসকারী—শ্রীমধুসূদন্।
জ্ঞান-লোচন, করি উন্মীলন,
প্রাণভরে তাঁরে কর দরশন॥
চরণে নূপুর বনমালা গলে,
পরিধান পীতাম্বর, তিলক ভালে,
করে মোহন বাঁশী, মুখে মধুর হাসি,
বামে হেলা চূড়া, বঙ্কিম নয়ন॥
বামে যাঁর শোভে বিজলী-বরণী,
বৃষভানু-সুতা রাধা বিনোদিনী,
ভাব তাঁর পদ, পাবে মোক্ষপদ,
যাইতে না হ'বে শমন সদন॥

শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার।

মালঞ্চ।

কোন কাজ নাই।

(১)

তোমাকে, আমার কোন কথা নাই,
কোন আশা নাই, তোমার কাছে—
এই ভব পথে চলিতে চলিতে
দৈববশে দোঁহে দেখা হয়েছে।

(২)

দুদিনের দেখা—দুদিনে ভুলিবে
কেবা কোথাকার রবেনা মনে,
তুমি, গরবিনি, রহিবে এমনি

(৩)

তোমাতে আমাতে দূর—বড় দূর
কত বাধা আছে পথ মাঝারে—
(তুমি) ধনীর ঝিয়ারী, আমি গো ভিখারী
তুমি বিদ্যালোকে আমি আঁধারে।

(৪)

তুমি গো রূপসী মধুরিমাময়ী
সুবেশা, সুভূষা তুমি গো বালে,
আমি কদাকার কঠোরতা সার
চীর বিমলিন আমার ভালে।

(৫)

তুমি সুরসিকা, সুসভ্যা, তরুণী ;
আমি অমার্জ্জিত বিশুষ্ক প্রাণ ;
তুমি বাঞ্ছনীয়া, তুমি বরণীয়া
আমি হেলনীয় সবারি স্থান।

(৬)

যে তোমা' হেরেছে মানস-মোহিনি,
সেই পদতলে পড়েছে গো ;
(কত) ধীমানে শ্রীমানে সজল বয়ানে
দাঁড় করে দ্বারে রেখেছ গো।

(৭)

মানস সরসে সাঁতরে মরাল
বলাকা লুটায়ে কাদায় কুলে ;
তুমি কি সুভগে, মরালে তেয়াগি
বলাকাকে হৃদে লইবে তুলে ?

(৮)

কভু আঁখিকোণে হেরনি আমায়
কভু ভাব নাই দাসের কথা—
কখনো সাহসে বল্লিনি সকাশে

(৯)

কি হবে বলিয়া ? কি আছে গো আশা—
কি ভরসা বল আমার আছে ?
(আমি) নীরবে সহিব, নীরবে পূজিব,
বলি দিব হৃদি তোমার কাছে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী।

চিন্তা।

হৃদিবিদারিণি চিন্তে ! নর হৃদিমঠে
চিরবাস তব। কহ বিশ্ব-বিমোহিণি,
যে জন তোমারি রক্ষক, ভক্ষক তা'র
কি দোষে বা হও ? তক্ষক সদৃশ দংশ
হৃদিপিণ্ডে তা'র ; দিবানিশি জ্বলে মরে
অভাগা সে জন, নিদারুণ চিন্তা-জ্বরে।
তব জ্বর নহে সোজা কথা, মৃত্যুবাণ
সম মানবের পক্ষে। ভাব দেখি চিন্তে,
যে জন যতনে হৃদে, করে সংরক্ষণ ;
যাহার আশ্রয়ে থাকি দিবস রজনী
দিন দিন বৃদ্ধি হও, মানস-মন্দিরে ;
হায়রে ! নারীর রীতি এত কি কঠিন !
অবিশ্বাসী, আততায়ী, কৃমিকীট সম,
দিন দিন হৃদিপিণ্ড, করি খণ্ড খণ্ড,
যাতনার মহাকূপে, কর গো নিক্ষেপ !
আহা ! যেবা রূপবান্ মদনমোহন,
কভু, রূপবতী, রতি জিনি কান্তি যা'র ;
সেও হয় একদিন তোমার পরশে
কান্তিহীন তনু, নারকীয় জীব সম
কুৎসিত-আকার, চেনা ভার লোক মাঝে।

পদানত। রোগী, ভোগী, কভু বা সন্ন্যাসী,
রাজা হ'তে প্রজাপুঞ্জ, তব আজ্ঞাধীন।
কহ লো সুন্দরি! কেবা মুক্ত তব হ'তে?
ভাব দেখি মনে, সেই কুরুক্ষেত্র রণে,
কৃষ্ণ, মিত্র পার্থ সহ, হায়! কতদিন
স্মরে'ছে তোমায়? হেন দৃষ্টান্ত অপার
রহে'ছে ভারতে গাঁথা, কিংবা রামায়ণে।
শুন চিন্তে! তুমি নও, সামান্য সে নারী;
মূঢ় আমি, তব লীলা বুঝিতে না পারি!
কোটী কোটী নতি তব পায়, এ ভুবন
চায়, ক্ষণমাত্র মুক্তি পেতে তব হ'তে।
তুমি লোকে পার জানি, হাসাতে কাঁদাতে,
কভু পার কা'রে উঠা'তে স্বরগে; কভু
ফেল কারে কৃমিময় নরকের হ্রদে।
সাবাস! সাবাস! অচিন্ত্য মহিমা তব।
শুন বিশ্বরাণি! জানি আমি সবিশেষ,
শমনদুহিতা তুমি—রোগ, মৃত্যু, জরা,
এ তিন সোদর তব। যেই মহাপাপী,
আর অনর্থের মূল অর্থ, এ'রা দুই
সাধের কিঙ্কর তব, ষড়রিপুগণ
সখা লো তোমার, ঘুরে তব আশে পাশে।
ক্ষম মম দোষ, যদি কর রোষ, ত্যজ মোরে
যত শীঘ্র পার, এই মম নিবেদন।
কালভুজঙ্গিণি! এ ভুবন তবাশ্রিত;
তেঁই কহি শুন মন দিয়া, যত দিন
রহে এ জীবন, কোরো'না বঞ্চিত যেন,
বিভু ধ্যান জ্ঞানে, কিংবা সাধু দরশনে॥

শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র।

শরৎ।

পূরবে অরুণ-রেখা এমনি জাগিয়েছিল,
এমনি প্রভাত-রবি রাঙামুখে চেয়েছিল,
এমনি বিজলে ঊষা ঘোম্‌টাটী খুলেছিল,
এমনি নলিনী তা'র মুখখানি তুলেছিল,
এমনি শরতে সেহ বরিষা-বারি-চুল
লুকাইয়েছিল পিছে ধরণী সরমাকুল;
এমনি জগৎ-রূপ, রবি-করে ফুটেছিল,
হীরার আঁচলখানি নিশীথ গগনে ছিল।
এমনি—এমনি ভোরে এই আমি এসেছিনু,
অতীত শরতে কোল সমাদরে দিয়েছিনু।
আজো সেই দীপ্তিমাখা দেখিয়ে নীল আকাশ,
আজো সেই শুভ্রমেঘে শরতের পূর্ণাভাস,
তাই এই আবাহনে আনিয়াছি ফুল-ডালি;
যা'বে নাকি পূজা?—দেবি! যা'বে নাকি পুষ্পাঞ্জলি!

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গ সাহিত্যে-বঙ্কিম।

সমালোচনা।

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। মূল্য ১।০। কালিকা-যন্ত্রে মুদ্রিত, বর্দ্ধিত আয়তনে দ্বিতীয় সংস্করণ, পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও পুনর্লিখিত, পরিমাণ ২২৩ পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালার সাহিত্যগৌরব মহারথ, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী, বংশ পরিচয়, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বিদ্যাশিক্ষা, এবং প্রতিভাযুক্ত কৃতিত্বের বিবরণ বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক,—বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত, মহাশয়, এই পুস্তকে স্বগৌরবে লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন; ইতিপূর্ব্বে

আমরা হারাণবাবুকে একজন উৎকৃষ্ট উপন্যাসিক, লেখক, ও কবি বলিয়া জানিতাম। "বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমপাঠে" তাঁহার সমালোচনা, সূক্ষ্ম অনুসন্ধান, গভীর গবেষণা ও পাণ্ডিত্য যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত, কিছুমাত্রও সম্বন্ধ রাখেন, সাহিত্যের গৌরব জানেন, এই পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহারা সকলেই বুঝিবেন, গ্রন্থকার বাঙ্গালা সাহিত্যের মহারথ বঙ্কিমচন্দ্রকে পদে পদে ;—তেজোময়ী, অপূর্ব্বা প্রতিভাকে সুমধুর তালে নৃত্য করিয়া গিয়াছেন। এরূপ এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা স্পর্দ্ধা করিয়া বলেন, গদ্য লিখিতে কবিত্বের সহায়তার প্রয়োজন কি? সেই সম্প্রদায় আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রকে কবি বলিয়া সম্মান দিতে কখনই সম্মত নহেন। যিনি যাহাই বলুন, আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের ইহা কতদূর ভ্রান্তি তাহা তাঁহারা বুঝিতে, একেবারেই অক্ষম! প্রকৃতই যাঁহারা সাহিত্যসেবক, তাঁহাদের পুস্তকাদিতে, গদ্য রচনায় বর্ণে বর্ণে কবিত্বের সৌরভ থাকে। আরব্য উপন্যাস, এবং বেতাল পঞ্চবিংশতি, প্রভৃতি অদ্ভুত অদ্ভুত উপন্যাস পুস্তকেও উচ্চাঙ্গের কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিম-চন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে স্তরে স্তরে, অনুপম কবিত্ব বিরাজমান। হারাণবাবু অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুটরূপে সাধারণ পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া, তাহাতে সম্পূর্ণরূপেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের সুমধুর কবিতা, ও সঙ্গীত অনেক আছে, দুর্গেশ-নন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, এবং মৃণালিনী, প্রভৃতি কয়েকখানি চিত্তরঞ্জন উপ-ন্যাসের মধ্যে মধ্যে, নূতন নূতন, সঙ্গীতে এবং পদবদ্ধ রচনাবলীতে, তাঁহার কবিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় আছে। বাঙ্গালার প্রায় অধিকাংশ নর নারী তাঁহার বিরচিত সঙ্গীতে বিমুগ্ধ।

বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত, বর্ত্তমান সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার অধিকারী হইয়া, প্রকৃষ্টরূপেই তাঁহার প্রতিভার সজীব চিত্র, প্রদর্শন করিয়াছেন। যদিও ইহা একখানি—মৌলিক গ্রন্থ নহে, তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য, ভাষার লালিত্যে, 'বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিম' উপন্যাসের ন্যায় চিত্ত আকর্ষক হইয়াছে। পুস্তকখানি আমরা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি। "বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম" বাঙ্গালা সাহিত্যের উপাদেয় গ্রন্থ। হারাণবাবুর পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

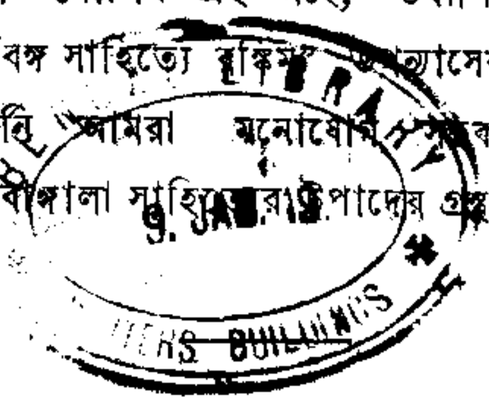

৭৫-৬৭০

399
10/7/07

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক পত্র।)

নবম বর্ষ। } ১৩০৭ সাল, অগ্রহায়ণ। { [illegible] সংখ্যা।

BENGAL LIBRARY
FEB. 1901

মুক্তি।

যথন দুই, তিন, চারি বা ততোধিক বির[illegible] মতের [illegible] করিতে হয়, তখন কোনও মত বিশেষের পক্ষপাতী হইলে প্রকৃত কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। পক্ষপাত শূন্য হইয়া প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান করাই সামঞ্জস্য-কারের কর্ত্তব্য। আমরা সত্যের অনুসন্ধান বা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই বা নাই হই, সত্য নির্ব্বাচন করিতে একবারেই অসমর্থ নহি। যদিও প্রাকৃত মনুষ্যে পূর্ণজ্ঞান সম্ভাবনা সুতরাং পারলৌকিক বিষয়ের সত্য নির্ব্বাচন করাও প্রাকৃত মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব, তথাপি যদি অসত্যকে প্রকৃতই সত্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে সেই অসত্যের সত্যতা নিরূপণও তাদৃশ দোষাবহ হয় না। কিন্তু অসত্যকে অসত্য জানিয়া যদি তাহার সত্যতা সংস্থাপন পূর্ব্বক জিগীষা বা বিপ্রলিপ্সার তৃপ্তিসাধন করা হয়, তবে ইহলোকে অকীর্ত্তি ও পরলোকের জন্য মহাপাতক সঞ্চয় করা মাত্র। লৌকিক বিরোধের সমাধান অতি সহজ কিন্তু অলৌকিক অতীন্দ্রিয় বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার সমাধান করিয়া ঐকমত্য স্থাপন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। যিনি তপঃপ্রভাবে অলৌকিক বিষয় অনুভব করিতে সমর্থ, তাঁহার কথা পৃথক্, কিন্তু যিনি সংসারের ক্রীতদাস ও ইন্দ্রিয়গণের আজ্ঞাবহ, এরূপ অযোগ্য বিষয়ে হস্তার্পণ করা তাঁহার সাহসমাত্র। যেমন সাংসারিক কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে প্রাচীন পিতার অনুমতি লইয়া কার্য্য করিতে হয়, সেইরূপ অলৌকিক বিষয়ের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতম আপ্ত বাক্যের অনুসরণ করাই

কর্ত্তব্য। অসংখ্য আর্য্যশাস্ত্রের মধ্যে উপনিষৎ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম, সুতরাং শাস্ত্র মাত্রেরই পিতৃস্থানীয়। যেমন পুত্রের আপাদমস্তক সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই পিতা হইতেই উদ্ভূত, সেইরূপ সমস্ত আর্য্যশাস্ত্রই একমাত্র উপনিষদের অনুকরণমাত্র। যেমন মহাসাগরের সত্তা অবলম্বন করিয়াই পৃথিবীস্থ সমস্ত নদ নদী প্রভৃতি. জলাশয়ের সত্তা, সেইরূপ শাস্ত্র সাগর উপনিষদের অভিপ্রায় অবলম্বন করিয়াই দর্শনাদি সমস্ত আর্য্যশাস্ত্রের অস্তিত্ব। যেমন অনন্ত আকাশব্যাপী অনন্ত বায়ু পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবের উপজীব্য, সেইরূপ একমাত্র উপনিষৎ সমীরণই অসংখ্য আর্য্যশাস্ত্রের জীবনস্বরূপ। যেমন কোন কোন বংশধর সন্তান বস্ত্রালঙ্কারের বাহ্য শোভায় সুশোভিত হইয়া মলিনবাসা বৃদ্ধ পিতাকে পিতা বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন, সেইরূপ যে সকল গ্রন্থ শব্দালঙ্কারের বাহ্যড়ম্বর দেখাইয়া উপনিষৎ অগ্রাহ্য করেন, ঐ সকল গ্রন্থকে অসদ্ গ্রন্থ না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। যেমন আপাতদর্শী অৰ্দ্ধ শিক্ষিত পুত্র সুশিক্ষিত প্রাচীন পিতার দীর্ঘদর্শিতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সুপণ্ডিত পিতাকে নির্ব্বোধ বলিতেও কুণ্ঠিত নহেন, সেইরূপ কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী মহাপুরুষ উপনিষদ্ বাক্যের অগাধ অন্তস্তল স্পর্শ করিতে না পারিয়া ঐ অপৌরুষের ঈশ্বর বাক্যের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতেও লজ্জা বোধ করেন না। যদি স্বতঃ প্রমাণ বেদবাক্যেও ভ্রান্তি থাকা সম্ভব হয়, তবে ভ্রান্তি প্রদর্শকদিগের ভ্রান্তি প্রদর্শন কি ভ্রান্তিমূলক হইতে পারে না? যে সকল অৰ্দ্ধ শিক্ষিত যুবক আপন আপন বৃদ্ধ পিতাকে ভ্রান্ত বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের বার্দ্ধক্য হইলে তাঁহাদের পুত্রগণ তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলিবে না এ কথা কে বলিতে পারে। কবিবর ভবভূতি মালতীমাধব নামক নাটকের প্রথমেই বলিয়াছেন—

"যে নাম কোচিদিহনঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং।
জানন্তিতে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।"

উপনিষৎ সম্বন্ধে আমিও তাহাই বলি। অতএব উপনিষদের ভ্রান্তি প্রদর্শন না করিয়া আপন আপন সূক্ষ্মদর্শিতার অভাব স্বীকার করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

এইরূপে উপনিষদের উৎকর্ষ স্বীকার করিয়া সকল শাস্ত্রের তদনুরূপ ব্যাখ্যা করাই প্রকৃত সামঞ্জস্য এবং ইহাই আমাদের সত্য নির্ব্বাচনের একমাত্র উপায়। উপনিষদের সহিত যে সকল শাস্ত্রের আপাততঃ শব্দগত বিরোধ

দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার শব্দার্থমাত্র গ্রহণ না করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক উপনিষৎ বাক্যের সহিত ঐক্য সংস্থাপন করিলেই যথার্থ সমাধান হইয়া থাকে। উপনিষদের সপ্রামাণ্য রক্ষা করিবার জন্য অন্য শাস্ত্রের অর্থান্তর স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু অন্য কোনও শাস্ত্রের সম্মান রক্ষার জন্য উপনিষদের অর্থান্তর কল্পনা করা আমার বিবেচনায় নিতান্ত দোষাবহ। আমি সাংখ্যের পক্ষপাতী, অতএব উপনিষদের তদনুরূপ অর্থান্তর কল্পনা করিয়া সাংখ্যের সম্মান রক্ষা করিলাম, আবার এক ব্যক্তি বৈশেষিক দর্শনে অত্যন্ত অনুরক্ত, তিনিও উপনিষদের প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা করিয়া বৈশেষিক দর্শনকে উচ্চ আসন প্রদান করিলেন। এইরূপ সকলেই যদি আপন আপন উপজীব্য শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অসহায় উপনিষদ্‌কে নানাস্থানে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিজ নিজ অভীষ্ট সাধন করিয়া লইলেন, তবে আর উপনিষদের স্বতঃপ্রামাণ্য রহিল কোথায়? এবং সামঞ্জস্যই বা হইল কি? আদর্শ স্বরূপ একখণ্ড বিমল সুবর্ণ নিকষোপলে ঘর্ষণ করিলে যে স্বর্ণাভ রেখা উৎপন্ন হয়, সুবর্ণ বণিকেরা অন্যান্য স্বর্ণালঙ্কারের বিমলত্ব বুঝিবার জন্য নিকষোপরি ঘর্ষণ করিয়া ঐ আদর্শ রেখার সহিত মিলাইয়া থাকেন। যে স্বর্ণালঙ্কারের রেখা আদর্শ রেখার সদৃশ হইল না, অগ্নি সংযোগে তাহার মালিন্য দূর করিয়া আদর্শ সদৃশ করিয়া লয়েন। অলৌকিক বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিবার সময় উপনিষদই আমাদের ঐরূপ আদর্শ অর্থাৎ উপনিষদের সহিত যে কোন গ্রন্থের আপাততঃ অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সকল শব্দার্থগত অনৈক্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাৎপর্য্যার্থে উপনিষদের সহিত সমানার্থ করিলেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত ও সামঞ্জস্য হইল। আমার একটী স্বর্ণালঙ্কার আছে, উহা বিমল সুবর্ণ বলিয়া আমার বিশ্বাস; কিন্তু নিকষোপলে ঘর্ষণ করিয়া দেখিলাম, উহার রেখাগত বর্ণাভা আদর্শ সুবর্ণের রেখাগত বর্ণাভার সদৃশ হইল না, তখন আপন অলঙ্কারের মালিন্য অপাকরণ না করিয়া অগ্নি সাহায্যে আদর্শ স্বরূপ বিমল সুবর্ণে ধাত্বন্তর মিশ্রিত করিয়া নিজালঙ্কারের গৌরব রক্ষা করা আর উপনিষদের অর্থান্তর কল্পনা করিয়া আপন উপজীব্য শাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করিতে সমুদ্যত হওয়া সমান কথা। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন :—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।

যিনি বেদ-শাস্ত্রের অনুকূল তর্কদ্বারা ঋষি-প্রণীত ধর্ম্মোপদেশের সমাধান করেন, তিনিই ধর্ম্মতত্ত্ব জানেন, অন্যে জানেন না।

আমিও যে সমগ্র ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছি তাহা নহে, কেবল মন্মাদি মহাপুরুষগণের অমূল্য উপদেশের অনুসরণ করিয়াই বেদোপনিষদের উৎকর্ষ অনুবাদ করিতেছি। পরাশর বলিয়াছেন :—

অক্ষপাদ প্রণীতেচ কানাদে সাংখ্য যোগয়োঃ।
ত্যাজ্যঃ শ্রুতিবিরুদ্ধোহংশঃ শ্রুত্যেকশরনৈর্নৃভিঃ॥

ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও যোগ দর্শনের মধ্যে যে সকল অংশ শ্রুতিবিরুদ্ধ ঐ সকল অংশ শ্রুতিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের পরিত্যাজ্য।

এইরূপ শত শত ঋষি-বাক্যের অনুসরণ পূর্ব্বক উপনিষৎ ও তদনুগত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারেই আমি মুক্তির আনন্দ রূপত্ব প্রতিপাদন করিলাম। অথবা ইহা আমার প্রতিপাদন করা নহে, কেবল অপৌরুষের উপনিষদের ও পবিত্র পরমর্ষিবাক্যের অনুবাদ মাত্র। ইহা ভিন্ন লৌকিক ব্যবহার দর্শনেও মুক্তির আনন্দময়ত্ব কথঞ্চিৎ অনুভব করা যায়। বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পিপীলিকা হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমস্ত জীবই প্রাতঃকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কেবল আনন্দের অনুসন্ধানেই উদ্যত আছে। যেমন বাহ্য দেহের সহজ অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিলেই তাহা রোগ বলিয়া নির্ণীত হয়, এবং ঐ রোগ নিবারণের নানাপ্রকার প্রতিকারের প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেইরূপ আনন্দ স্বরূপ জীবের স্বরূপাবস্থা আবৃত হইলেই অন্তরে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, এবং ঐ দারুণ যন্ত্রণা নিবারণের জন্যই অর্থাৎ স্বাভাবিক আনন্দ স্বরূপে অবস্থান করিবার নিমিত্তই গ্রাসাচ্ছাদনাদি নানাপ্রকার বাহ্য প্রতিকারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। অতএব ঐরূপ প্রতিকারের চেষ্টাকে দুঃখ নিবারণের অভিলাষ বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে উহা নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক আনন্দ লাভের অভিলাষ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। যেমন স্থূলদেহের অন্যতম উপাদান জলীয় পদার্থের অভাব হইলেই তাহাকে তৃষ্ণা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, সেইরূপ জীবের অন্যতম উপাদান আনন্দ, সেই আনন্দের কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিলেই তাহা দুঃখ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে, অতএব যাহা

স্বরূপানন্দের প্রকাশ হয় না, সেই জন্যে উহা অপনয়ন করিতে হয় এবং সেই জন্যই আপাততঃ দুঃখ নিবারণের চেষ্টা বলিয়া প্রতীয়মান, হইয়া থাকে। বাস্তবিক স্বরূপানন্দ লাভই ঐরূপ চেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি দুঃখ নিবারণ মাত্রই অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর সামগ্রীর জন্যে অভিলাষ হইত না। ক্ষুধা হইলে যে দুঃখের অনুভব হয়, তাহা সুখলভ্য শাকেও উপশমিত হইতে পারে, তবে যত্নলভ্য ক্ষীর শরাদির জন্য মনুষ্য এত যত্নবান্ কেন? শীত জন্যে দুঃখ কম্বলেও উপশমিত হইয়া থাকে, তবে শাল, বনাত প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্র আহরণ করিতে হয় কেন? কেবল আনন্দের জন্য। (ক্রমশঃ।)

শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী।

কবিকেশরী

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের এক পরিচ্ছেদ।

(১৩০৫ সাল।)

"It is a good sign when good deeds are honoured. Blood may be shed and great victries may be won by the selfish, the vain glories and the proud, but they only are truely great who delight in goodness and hnmanity." P. C. SIRCAR.

ক্ষণজন্মা, স্বনামধন্য, বঙ্গের গৌরব, কবিকেশরী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গত ২৫শে বৈশাখে ৩৯ ঊনচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘজীবন ও সুস্থ শরীর লাভ করিয়া এই অধঃপতিত বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য সিংহাসন চিরদিন সুশোভিত করুন, পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিকট ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

বিদ্যমান কাল, কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথের জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার উপযোগী নয়। সুতরাং তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, সর্ব্বব্যাপিনী বিদ্যা, বীণা-বিনিন্দীত সুমধুর কণ্ঠস্বর—অথবা তাঁহার স্বভাবতঃ সরল হৃদয়, উদার চরিত্র, উন্নত চিত্ত, অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ, পরদুঃখ-কাতরতা, পরার্থপরতা

ব্যঞ্জক প্রিয়দর্শন সৌম্যমূর্ত্তির কথা আমাদের ন্যায় হীন জনের ক্ষীণা-লেখনী দ্বারা ব্যাখ্যাত হওয়া অসম্ভব। কাজে কাজে সে সকল বিষয়, কিছুই বলা হইল না। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের কোলে লালিত হইয়া—ভোগ বিলাস বাসনা ত্যাগ করিয়া—স্বদেশের জন্য—স্বদেশ-ভাষার উন্নতি-কল্পে আজন্ম পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। তিনি বঙ্গভাষার এক অভিনব পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন! তাঁহার লিখিত বঙ্গভাষাই যে, কালে বঙ্গ সাহিত্যের অনেকের আদর্শ হইবে, ইহারই মধ্যে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ভাষা এমনই অজ্ঞাত-সারে বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে; আজকাল বিস্তর ভাল ভাল বাঙ্গালা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাষার ছায়া দেখিতে পাই। শোভাবাজারের রাজবাটীতে সাহিত্য পরিষদের এক অধিবেশনে কবি-কেশরী রবীন্দ্রনাথের একটি বাঙ্গালা প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সাহিত্য-পরিষদ সভার তাৎকালিক সভাপতি ক্ষণজন্মা স্বনামধন্য ভারতের মুখোজ্জ্বল্য-কারী সাহিত্য রথী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তজ মহাশয়, মুক্তকণ্ঠে বলিয়া-ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ বাবুর প্রবন্ধের ভাষার মত এমন শ্রুতিমধুর বাঙ্গালা আর কখন শুনি নাই। আমি অনেক বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়াছি বটে, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় এমন করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, রবীন্দ্র বাবুর বাঙ্গালা প্রবন্ধ শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। বাস্ত-বিকই, রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গালা, সতেজ অথচ সরল—অতরল সরবতের মত মুখপ্রিয় ও উপকারক, সুস্বাদু ও সুপেয়। পড়িতে পড়িতে আশ মেটে না। কিন্তু সে সব কথা যাক্। তাঁহার কলা-জ্ঞানের অনুশীলন, বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত অথবা অনুকূল নহে। অপ্রাসঙ্গিক বোধে তৎসমস্ত পরিত্যক্ত হইল।

স্বদেশের হিতের জন্য, স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি-কল্পে কবি-কেশরী রবীন্দ্রনাথ, স্বয়ং লোক শিক্ষক-রূপে সংসার ক্ষেত্রে কেমন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন, কৃষিকর্ম্মে তিনি নিজ জীবনের বর্ত্তমান কাল কিরূপে নিয়োজন করিয়াছেন, বক্ষ্যমাণ সংক্ষিপ্ত সন্দর্ভে তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। সহৃদয় জমিদারবর্গের ও জনসাধারণের ইহাতে মনুষ্যচক্ষুঃ, কথঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইলে, রাজাদের ও জমিদারগণের সমবেত চেষ্টার ফলে আমাদের দেশের (ভারতের) ভবিষ্যতে অনেক মঙ্গলই সাধিত হইবে।

সলিলা। তিনি স্বদেশের হিতসাধন-সংকল্পে গলাবাজী করিয়া বক্তৃতা করিয়া বেড়ান নাই; অথবা গুছাইয়া গুছাইয়া শব্দ বিন্যাস করিয়া হৃদয়গ্রাহী কোন প্রবন্ধের রচনা নাই বটে, কিন্তু এমন দিন নাই, যে দিন তিনি স্বদেশের জন্য একবিন্দুও অশ্রুপাত করিয়া পৃথিবী সিক্ত না করেন। তাঁহার হৃদয়, স্বদেশ প্রেমময়। তাঁহার রচিত কয়েকটী ভারত-সংগীত শ্রবণ করিলে, প্রকৃত ভাবুকের প্রতি ধমনীতে এক মহাশক্তি সঞ্চারিত হয়। কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথকে ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া কেবল কবিতা লিখিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে, শোনা বা দেখা যায় না। যাহাতে স্বদেশের আত্মীয় বা অনাত্মীয় দশের উপকার সাধিত হয়, যাহাতে স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্যাদি কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত ও বিশেষ উন্নতি হয়, যাহাতে এদেশে বাণিজ্য-ব্যবসায়-শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়, যাহাতে আমাদের দেশের বিজ্ঞানানুশীলন, সমধিক শ্রীবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য রবীন্দ্রনাথ, প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। শিল্প ও বাণিজ্য-শিক্ষার্থীদিগকে অর্থ-সাহায্য করিতেছেন। বিজ্ঞানাগারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, এবং কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য বিস্তারের জন্য নিজেই, সমাজ-শিক্ষকরূপে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন! প্রতীচ্য শিক্ষায় অহঙ্কৃত ও বিদ্যাভিমান-দৃপ্ত উদ্ধত ও মদ-গর্ব্বিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চিহ্নিত যুবকগণকে অথবা ধনীর সন্তানদিগকে কৃষি-কার্য্য অথবা ব্যবসায়-বাণিজ্যে কর-ক্ষেপ করিতে বলা দূরে থাকুক, মুখের কথাতে উৎসাহ দিতে বলিব না। তাঁহারা, হয়তো অপমান বোধে অগ্নি শর্ম্মা হইয়া উঠিবেন—কত অকথ্য কথাই ব্যবহার করিবেন। এফ-এ এবং বি-এ, পাশ করিয়াও সামান্য অর্থের জন্য লোকের বাটীতেই শিক্ষকতা করিবেন। চাকরী যোটান তো দূরের কথা। ঘরের খাইয়া অপরের নিকট উমেদারী করিবেন, তাহাও তাঁহাদের স্বীকার! তথাপি আপন জন্মভূমিতে চাষ বাস করিয়া সুখে থাকিতে, তাঁহাদের মস্তকে অপমানের বোঝা যেন মাথায় আসিয়া চাপিয়া বসে। ধনীর পুত্রগণ, আলস্য-সলিলে ডুবিয়া ভোগবিলাসে পৈতৃক সম্পত্তি ক্ষয় করিতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন। তথাপি লাভকর ব্যাপারে মনঃসংযম করিয়া, ধনাগমের পথ পরিষ্কৃত করিতে কিছুতেই তাঁহারা সম্মত হইবেন না। বঙ্গদেশে দুরিদ্রতা বৃদ্ধির ইহা এক প্রধান কারণ। এই সকল কুসংস্কার বা বৃথা আত্মাভিমান, বঙ্গদেশের দুঃখ

চিন্তা করিয়া কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথ, কৃষিকার্য্য ও শিল্প-বাণিজ্যে অগ্রসর হইয়াছেন। গত ১৩০৫ সালের কার্য্য-বিবরণী হইতে পাঠকদিগকে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস, আপাততঃ দিতে হইতেছে।

বৎসরের প্রথম দিবস অর্থাৎ ১লা বৈশাখে আদি ব্রাহ্মসমাজের একটী সাম্বৎসরিক উৎসব হয়। কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথের যোড়াসাঁকোর বাটীতে এই উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। উক্ত বর্ষের ১ম দিবসেই এই উৎসব সমাহিত হয়। কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথের জনক পরম পূজনীয় শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহানুভবই, ইহার অনুষ্ঠাতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে উৎসবস্থল নির্দ্দিষ্ট ও সজ্জিত হয়। সে দিন কদলীবৃক্ষ বেষ্টিত, নানা জাতীয় লতা-পত্র মণ্ডিত, বেল, যুঁই, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি নানা সুসৌরভসম্পন্ন পুষ্পরাজি বিরাজিত মহর্ষি দেবের বসতি, যেমন সিদ্ধার্থের তপোবনোপম হইয়া উঠিল! নানা ফল ফুলে শোভিত ধূপ-ধূনা-চন্দন, দীপ, কুঙ্কুম-কস্তুরী প্রভৃতি সদ্‌গন্ধদ্রব্য দ্বারা সুবাসিত শঙ্খঘণ্টা নিনাদিত সেই তপোবননিভ নিবসতি-স্থলে সেই ভূত-ভবিষ্য বর্ষের সন্ধিস্থলে সেই অতীত মহাপুরুষদিগের কথিত ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সেই আলোক-অন্ধকারের মধ্যে দেবাদিদেব মহাদেবের অর্চ্চনা হয়। যথার্থই সেই সময়ে হৃদয়ের মধ্যে ভক্তি-প্রেমের শত-উৎস উৎসারিত হয়। ক্ষণকালের জন্য—সমাগত উপাসনানিরত ব্যক্তি সমস্ত, স্ব স্ব অস্তিত্ববিস্মৃতি-বারিধিতে নিমজ্জিত করিয়া দিয়া জগন্মাতায় আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক ভূমানন্দ লাভ করিয়া জীবন পবিত্র করেন। কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথ, এই উৎসব উপাসনান্তে একটী ভাগবত-সংগীত গান করিয়া সমুপস্থিত সভাস্থ সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই সুমধুর কালের মধুর কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর সংগীত, অদ্যাপি আমাদের কর্ণপ্রান্তে বার বার প্রতিধ্বনিত হইতেছে, রবীন্দ্রনাথের এই বৎসরের কার্য্য-বিবরণ ধারাবাহিক-রূপে সমালোচন করিলে বোধ হয়, যেন তিনি এই পবিত্র স্থানে বসিয়া বৎসরের প্রথম দিনে পবিত্র হৃদয়ে প্রশান্তমনে ১৩০৫ সালের কর্ত্তব্যকর্ম্ম স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার সংকল্পিত কর্ম্ম সকল কেমন করিয়া সম্পূর্ণ হইল, কিরূপে তাহা সকলের গ্রহণীয় হইল, যথাযথভাবে তাহা ব্যক্ত করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। [ক্রমশঃ]

অনুপমা।

—০:*:০—

রূপ-কথা।

(১)

"শ্রীচরণেষু—

"আমাদের বিবাহ হইবার পরে, আমি আপনাকে এই প্রথম পত্র লিখিতেছি। আপনি আমাকে দুই তিনখানি পত্র লিখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে সকল পত্রের উত্তরে এতদিন আমি কিছুই লিখি নাই। কেন লিখি নাই, আজ তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিব।

"আমরা উভয়ে শুভ পরিণয়বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা, রুচি-প্রবৃত্তির কথা, আমরা পূর্ব্বে কেহ কাহাকেও বলি নাই। আমাদের দেশের হিন্দু-সমাজের সে রীতি নহে, আমাদের উভয়ের অভিভাবকগণ একটা কিছু ঠাওরাইয়া আমাদিগের বিবাহ-কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়াছেন। বর-কন্যায় শুভদৃষ্টিও বিবাহের পূর্ব্বে হয় না; কিন্তু আপনি একবার বন্ধুগণের সহিত লুকাইয়া আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। আমি যে রূপসী, সে কথা সে সময়ে পাকে-প্রকারে বন্ধুগণকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমার পক্ষের কথা তখন বলা হয় নাই।

"আমার যখন বিবাহ হয়, আমার বয়স তখন ১৬ বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু আপনাদিগকে মিথ্যা করিয়া বলা হয়, আমার তখন মোট ১৩ বৎসর বয়স। এ মিথ্যার জন্য আমি দায়ী নহি। আপনি জানেন যে, আমাকে একটি মেম লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, তিনি ইংরাজ রমণী হইলেও,—খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিণী হইলেও, তিনি আমার শিক্ষয়িত্রী, ইষ্টদেবী স্বরূপিণী। তাঁহারই আদেশক্রমে আমি আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। আমার প্রগল্‌ভতা আপনি ক্ষমা করিবেন। আপনি উচ্চ শিক্ষায় বিমণ্ডিত, উদার প্রকৃতিক সাধুপুরুষ। আপনার কাছে মনের কথা সরলভাবে বলিলে, অবশ্যই আপনি মন্দ ভাবিবেন না; আমার দুরবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন।

"আমাদের বিবাহের বহু পূর্ব্বেই আমি শ্রীযুক্ত সিতেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সহায় স্বয়ং ভগবান এবং আমার শিক্ষয়িত্রী। সিতেশ বাবু যে আমার মনোবাঞ্ছার কথা জানেন না, তাহাও নহে; তিনি আমার নির্ব্বাচনে সুখী হইয়াছিলেন এবং আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার জন্য শুভ অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি কৌলিন্যমর্য্যাদা-শূন্য এবং দরিদ্রের সন্তান, আমার পিতা তাই আমাকে তাঁহার করে সম্প্রদান করিতে পারেন নাই। আপনি কুলীন, ধনীর পুত্র এবং স্বয়ং শিক্ষিত; তাই আমার পিতা দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া, অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিয়া আপনাকে জামাতার পদে বরণ করিয়াছেন। আপনাদের হিন্দুসমাজের দৃষ্টিতে আমি আপনার পত্নী, আপনি আমার স্বামী; কিন্তু যিনি সকল সমাজের সারভূত—সকল জাতির ইষ্ট দেবতা—সেই দয়াময় পরমেশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে আমি সিতেশ বাবুর স্ত্রী। আপনার প্রণয়-লিপির উত্তর দিতে হইলে, আপনার প্রণয়-আলিঙ্গনের প্রতি-আলিঙ্গন দিতে হইলে আমাকে দ্বিচারিণী সাজিতে হয়,—আমাকে সয়তানের সহায়ী সাজিতে হয়। রাজার আইন—সমাজের শাসন, সবই আপনার অনুকূল; আপনি আমার দেহ লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। কিন্তু আমি ত ভিতরের সকল কথা আপনাকে বলিলাম; যে দয়াময় আপনার আত্মায় অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই আপনাকে সুবুদ্ধি দিবেন, তিনিই আপনাকে সৎপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, ইহাই আমার ভরসা ইতি।"

"ক্ষমার্হা অনুপমা।"

(২)

ভাই পাঠক! হাসিও না; কিন্তু ইহাই আমার প্রথম প্রণয়-লিপি। বড় সাধ করিয়া অনুপমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, তাহার অনুপম রূপ-মাধুরী দেখিয়া, তাহার হাতে পিয়ান বাজান শুনিয়া, তাহার কণ্ঠে অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনিয়া, তাহার মুখে সেলি বায়রণ—বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির কবিতা পাঠ শুনিয়া, আমি দিশাহারা—জ্ঞানহারা হইয়া, বড় সোহাগে অনুপমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম। আমার হৃদয়-স্বর্গের নন্দন-বনের বন-দেবী করিবার জন্য আমার নিষ্কলঙ্ক প্রীতি-পর্য্যঙ্কে অনুপমাকে বসাইয়াছিলাম। কেমন করিয়া বলিব, অনুপমার কত রূপ; সেই ভাসা ভাসা বড় বড় চোখ দুইটি—সেই চাঁদ নিঙ্ড়ান চাঁদমাখান স্বচ্ছ কপোলযুগল,

মরি! কুঞ্চিত চুলগুলি গ্রীবার উপর পড়িয়া, খোপাটি গ্রীবার উপর হেলিয়া থাকিয়া, রাহু-কবলিত অর্দ্ধ-চন্দ্রের ন্যায় অপরূপ শোভা বিস্তার করিতেছিল। আর সেই দেহ-লতিকা!—সত্য সত্যই যেন স্বর্ণলতিকা। শাল-কাণ্ড বিলম্বিতা পুষ্পাভরণ-ভূষিতা বল্লরী যেমন ধীরপবনে ধীরে ধীরে কাঁপিতে থাকে, তেমনি অনুপমার দেহলতা লাবণ্য-কুসুমাভরণা হইয়া সোহাগভরে ধীরে ধীরে যেন সদাই কাঁপিতেছে।

আমি কি পাগল হইব, আমার অনুপমা আমাকে কেন এমন পত্র লিখিল? আমি কি করি!—আমি যে সে রূপের লোভ ছাড়িতে পারি না, আমি যে সে রূপের মোহ এড়াইতে পারি না, আমি যে সে রূপের জন্য সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াছি! আমার ওকালতী গিয়াছে, উপার্জ্জন বন্ধ হইয়াছে, লোক-লৌকিকতা উঠিয়াছে, পিতৃমাতৃ-সেবা ঘুচিয়াছে,—আমার ইহকালও নাই, পরকালও নাই। আমার রূপের কনক-কটরায় কে এমন হলাহল ঢালিল রে? আমার সুখের কামিনীকুঞ্জে কে এমন করাল ব্যাল ঝাড়িয়া দিল রে? আমার বিলাসের চন্দ্রমাক্রোড়ে কে এমন কলঙ্কের শশক বসাইয়া দিল রে!

আমি কি পাগল হইব! পাগল হইবার বাকিই বা কি? পত্রপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত আমার আহার-নিদ্রা নাই, সাজ-সজ্জা নাই, রহস্যালাপ নাই, কর্ত্তব্যজ্ঞানও নাই। ওহো! এ কি রূপের জ্বালা! এ কেমন প্রদাহ! বজ্র সূচিবেধের ন্যায় এ জ্বালা আমার ভিতর পুড়াইয়া খাক করিয়া দিতেছে, আমার সরস হৃদয়কে শুকাইয়া বালুকাপূর্ণ ভীষণ মরুতে পরিণত করিতেছে। সত্য সত্যই আমি পাগল হইলাম, সেই শিক্ষয়িত্রী ইংরাজ রমণী—সে কি রাক্ষসী, সে কি পিসাচী? কেন সে আমার সুখের পথে শ্মশানের অতি উষ্ণ চিতাভস্ম ঢালিয়া দিল? আমি মরিলেই যে বাঁচিতাম।

(৩)

পাগলের ন্যায় দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, আমার শৈশব-সুহৃদ প্রিয়বাবুর নিকট ছুটিয়া যাইলাম; তাঁহাকে পত্রখানি পড়িয়া শুনাইলাম, তিনি একটু মুচকি হাসিলেন। আমার বড় রাগ হইল। আমার মুখ দেখিয়া মনের ভাব বুঝিয়া, প্রিয়বাবু আর একটু হাসিয়া বলিলেন, "শরৎ! অমন জ্ঞানহারা হইও না, পত্রে এমন মারাত্মক কিছুই নাই। তুমি অনুপমাকে ত ত্যাগ করিতে পারিবে না। ত্যাগ করিবার কথা বলিলে তুমি

যে মরিয়া যাইবে! আর অনুপমাও ত্যাগের যোগ্যা নহেন, তিনি অতি রূপসী এবং সুশিক্ষিতা, তাঁহার পত্র শুনিয়া বুঝিলাম, তোমার ন্যায় তিনিও রূপমুগ্ধা এবং ভাববিহ্বলা। সিতেশবাবু সুপুরুষ, সিতেশ বাবুর চেহারায় এমন কিছু আছে, যাহা দেখিলে যুবতী কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়।"

আমি কাতরভাবে বলিলাম—"উপায় ?"

প্রিয়।—উপায় আছে বই কি! তোমার বাবাকে বলিয়া অনুপমাকে তোমাদের নিজের বাটীতে আনাও; নিজের কাছে রাখিও না, দমদমার বাগান-বাড়ীতে তাহাকে রাখিয়া দাও। তোমার বৃদ্ধা পিসিমাকে তাহার সঙ্গে থাকিতে বল, দাসদাসী থাকুক, দরবান বেহারা থাকুক। তিনমাস কাল সে বাগানে তোমার ছোট ভাই ভগিনীপতি প্রভৃতি কোন যুবকই যেন না যাইতে পারে। তুমি প্রত্যহ একবার করিয়া যাইবে; আর দেখিও, অনুপমা যেন সিতেশকে কোন পত্র লিখিতে না পারে; আর জনানা মিশনের সেই শিক্ষয়িত্রী ইংরাজ রমণী কিছুতেই যেন অনুপমার সাক্ষাৎ না পায়।

আমি।—ইহাতে কি হইবে, জবরদস্তিতে কি কাহাকেও ভালবাসান যায়! জোর করিলে অনুপমা একটা বিপদ ঘটাইতে পারে, আত্মহত্যা করিতে পারে।

প্রিয়।—তুমি পাগল হইয়াছ, তাই সকল কথা বুঝিতে পারিতেছ না। অনুপমা কেবল লেখা-পড়াই শিখিয়াছে, কেবল গান-বাজনা শিখিয়াছে, আর শিক্ষয়িত্রীর কাছে কেবল নাটক নভেল পড়িয়াছে; কাব্যগাথা পড়িয়া এবং বিলাতী ফ্রি লভের মর্ম্ম বুঝিয়াছে। অনুপমা ধর্ম্ম-কর্ম্ম শিখে নাই, সমাজ তত্ত্ব বুঝে নাই, কর্ত্তব্যাবধারণ করিতেও পারে নাই; কিন্তু অনুপমা হিন্দু গৃহস্থের কন্যা, হিন্দুসংস্কারে প্রতিপালিতা। অনুপমার প্রকৃতি হিন্দুউপাদানে গঠিত, অনুপমার প্রাণ হিন্দুয়ানীতে পূর্ণ। এই পত্রখানি নূতন যৌবনের প্রথম জোয়ারের—নূতন শিক্ষার প্রথম তাড়নায় রূপবিলাসের মোহে লিখিত। যদি তাহাকে কিছুদিনের জন্য স্বতন্ত্রভাবে রাখা যায়, যদি তাহার বিমূঢ় হিন্দু-প্রকৃতির উন্মেষের পক্ষে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে সে আবার তোমারই হইবে। তোমার পিসিমা সে কালের পাকা গিন্নি, তিনি কাছে থাকিয়া তাহাকে সদুপদেশ দিবেন, আর তুমি মাঝে মাঝে এক একবার দেখা দিয়া আসিও। অনুপমার নূতন যৌবনের প্রখর স্রোতের সরল পথে বিকৃত

ভাবের খালির বাঁধ পড়িয়াছে, তোমাকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে দেখিতে যুবতীর স্পৃহার প্রবাহ তোমার দিকেই ছুটিয়া আসিবে; তোমার অনুপমা তোমারই হইবে।

আমি।—এই উপায়ে কি ভালবাসা ফুটিতে পারে? আমি কেবল অনুপমাকেই চাই না, তাহার ভালবাসাকেও চাই।

প্রিয়।—ইংরাজী পড়িয়া তোমারও মাথা বিগড়াইয়াছে। ইংরাজী নাটক নভেলে যে প্রকার অনুরাগের কথা আছে, সে প্রকারের তীব্র অনুরাগ আমাদের ভাতখেকো বাঙ্গালীসমাজে সম্ভবে না। বিশেষ, সিতেশের প্রতি অনুপমার যে অনুরাগ, তাহা অনুরাগই নহে। সামান্য একটা খেয়ালমাত্র; অহঃরহ নাটক নভেল পড়িয়া যুবতীর মনের একটা বিকার মাত্র। বিকারের ঔষধ আছে, কিন্তু প্রকৃতির বিকৃতির ঔষধ নাই। অনুপমার এই বিকারের যে চিকিৎসা কর্ত্তব্য, তাহা আমি করিলাম। তুমি তিন মাসকাল ধৈর্য্য ধরিয়া থাকো। আমি হুরাশার দুষ্টশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বাড়ী আসিলাম, এবং প্রিয়নাথের উপদেশ মত সকল ব্যবস্থাই করিলাম।

(৪)

দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে, আজ আমার সুপ্রভাত, অনুপমা আজ একখানি পত্র লিখিয়াছে। পত্রখানি এই,—

"প্রিয়তম!

"ইহজীবনে আমার প্রায়শ্চিত্ত কি শেষ হইবে না। আমি বুঝিয়াছি, আমার প্রায়শ্চিত্ত তুষানল, সে তুষানলজ্বালা আমি ভোগ করিতেছি। জানিনা, কি কুক্ষণে পিতা আমাকে লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,—কি কুক্ষণেই আমি মিস ফক্সের ন্যায় শিক্ষয়িত্রীর হাতে পড়িয়াছিলাম! আমার সোনার সংসার—সুখের ঘর বাড়ী—রাজা শ্বশুর, অন্নপূর্ণা তুল্যা শাশুড়ী, ইন্দ্রতুল্য স্বামী, আমি পাইয়া হারাইলাম।

"আমার কি অপরাধ! আমায় যেমন শিখাইয়াছিল, তেমনি শিখিয়াছিলাম, যেমন বুঝাইয়াছিল, তেমনি বুঝিয়াছিলাম, আর যাহাকে সামনে পাইয়াছিলাম, তাহাকে আপন বলিয়াই আদর করিয়াছিলাম। আমি নারী মাত্র,—অবলা চিরবিহ্বলা, আমার অপরাধের এমন বিষম প্রায়শ্চিত্ত কেন নাথ! আমি ত যুবতীসুলভ কপট ব্যবহার করি নাই! পোড়া বুদ্ধিতে তখন যাহাল ভাবুঝিয়াছিলাম, তোমাকে তাহাই লিখিয়া জানাইয়াছিলাম।

"তুমি স্বামী, আমার দেবতার দেবতা, আমার ইহকাল ও পরকালের সর্ব্বস্ব। তুমি দয়া করিয়া তখন আমাকে ত্যাগ করো নাই, তাই আমি এখনও কুলাঙ্গনার পবিত্র আসনের অধিকারিণী হইয়া আছি। যে দয়া প্রভাবে সে দুঃসময়ে তুমি আমার রক্ষা করিয়াছিলে, সেই করুণা-গুণে তোমার পদপ্রান্তে একটু স্থান কি দিবে না? আমি কাঙ্গালিনী বনবাসিনী; সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন আমি আমার বনবাটীকার বাতায়নপথে বসিয়া থাকি, তখন দেখিতে পাই, তুমি বাগানে পদচারণা করিতেছ, প্রাণে বড় সাধ হয়, একবার ছুটিয়া গিয়া তোমার পদপ্রান্তে পড়ি, আর ঐ চারুচরণ যুগল হৃদয় ধরিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনের সকল ব্যথার কথা তোমাকে বলি; কিন্তু আমি যে রমণী, আমার রমণীসুলভ লজ্জা আসিয়া আমার ইচ্ছাপথে বাধা দেয়। আমার হৃদয়ের বাসনা হৃদয়ে উন্মীলিত হইয়া হৃদয়েই বিলীন হয়।

"ছাই লেখা পড়া! আমি যদি লেখা পড়া না শিখিতাম; আমি যদি নাটক নভেল না পড়িতাম, তাহা হইলে সেই ফুলশয্যার রাত্রি হইতেই আমি তোমার সকল সোহাগের অধিকারিণী হইতে পারিতাম।

"রক্ষা কর প্রভু! আমায় রক্ষা কর; তুমি না রাখিলে আমায় কে রাখিবে? তুমি আমার লজ্জা-নিবারণ, বিপদভঞ্জন; তুমি আমার এই তুচ্ছ নারীজীবনের ত্রাণকর্ত্তা; আমি তোমার দাসীর দাসী হইবার যোগ্যা নহি, আমি তোমার সেবিকা হইবার উচ্চ-আশা রাখি না; কিন্তু তুমি দয়া করিলে আমার ইহকাল ও পরকাল দুই বজায় থাকিবে। ইতি—"

"তোমার দাসী
অনুপমা।"

পত্রখানি পাঠ করিলাম, পাঠ করিবার কালে চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, বুদ্ধিকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, হৃদয়কেও বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম একি! আমি কি সত্য সত্যই জীবিত? ইহা কি প্রেতপুরির এক অলৌকিক কাণ্ড? আর প্রিয়নাথ! সে কি দেবতা না ভবিষ্যৎদর্শি ঋষি! ছুটিয়া গিয়া প্রিয়নাথের পদপ্রান্তে পত্রখানি ফেলিয়া দিলাম, সে কুড়াইয়া লইয়া পড়িল। আবার সেই হাসি,—নির্ব্বিকার প্রশান্ত মুখে আবার সেই মুচ্‌কি হাসি! হাসি দেখিয়া আমি ত আর নাই। দুই মাস পূর্ব্বে সেই ভীষণ পত্রখানি পড়িয়া প্রিয়নাথ হাসিয়াছিল, আজ এই প্রাণ-মন

পাগল-করা পত্রখানি পড়িয়া প্রিয়নাথ আবার হাসিল। উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত হইয়া আমি বলিলাম, "এমন করিয়া হাস কেন ভাই! বারে বারে এমন করিয়া আমায় দেখিয়া এবং আমার পত্নীর পত্র পাঠ করিয়া হাস কেন ভাই? তোমার হাসি দেখিলে যে আমি আত্মহারা হই।"

প্রিয়।—অত চঞ্চল হইও না, ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া আমি হাসিয়াছি। রোগী কেবল অনুপমা নহে; তুমিও রোগী। অনুপমার চিকিৎসার সঙ্গে তোমারও চিকিৎসা হইতেছে; তোমার পক্ষে স্বতন্ত্র পথ্যের ব্যবস্থা করি নাই।

আমি।—কিছুই বুঝিলাম না। তোমাকেও বুঝিতে পারিলাম না, তোমার ভাষাও বুঝিতে পারিলাম না।

প্রিয়।—না বুঝিবারই কথা। যে দিন মা তোমাকে বরণ করিয়া তোমার বিবাহ-যাত্রায় তোমাকে পাঠাইতে ছিলেন, সেই সময় মা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বাবা, তুমি কাকে আনিতে যাইতেছ? অবনতমস্তকে তুমি বলিয়াছিলে, মা, তোমার দাসী আনিতে যাইতেছি। বলিতে হয় বলিয়া, তুমি এমন কথা বলিয়াছিলে; নিজের মনের সহিত লুকাচুরী করিয়া মাতৃসন্নিধানে মিথ্যা কথা কহিয়াছিলে।

আমি।—কেন ভাই?

প্রিয়।—মায়ের দাসী আনিতে হইলে এত বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয় না। অনুপমার রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া রূপপূজা করিবার জন্য ছুটিয়াছিলে, তাই তোমার এত বিড়ম্বনা। হিন্দুর সংসার—দেবতার সংসার; সাকার সজীব দেবদেবী পিতা ও মাতা এই সংসারে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। এমন সংসারে বিলাস এবং রূপের সেবা স্থান পায় না। তুমি অঘটন ঘটাইতে চাহিয়া ছিলে, তাই তোমায় নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। আর দিন কয়েক যাউক, অনুপমা যখন শ্বশুর ও শ্বশ্রূর সেবার জন্য অস্থিরা হইবে, তখন তুমি তাহাকে পাইবে।

(৫)

আজ আমার সুপ্রভাত! এমন দিন বুঝি আমার ইহজীবনে আর হইবে না। মাতা ঠাকুরাণী দমদমার বাগান বাড়ীতে আসিয়াছেন। অনুপমা তাঁহার পদসেবা করিতেছে, মা আমায় ডাকিলেন, আমি তাঁহার প্রকোষ্ঠে যাইলাম, দেখি অনুপমা মায়ের এক জানুর উপর বসিয়া আছে, মা আমার

দিয়া বলিলেন, "তোদের ছেলে মানষী ঝগড়া রাখ্। আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে নিয়ে যাই, আমার এ জীবনের সকল সাদ মিটুক।"

হাসিতে হাসিতে আমরা সে দিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী আসিলাম। ছয় মাস পরে আমার শয়নকক্ষ আবার অধিকার করিলাম। আহারান্তে পানের ডিবা হাতে করিয়া কক্ষে আসিলাম এবং পর্য্যঙ্কোপরি বসিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে অনুপমাও আসিল, আসিয়াই সে আমার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিল; শ্রাবণের ধারার ন্যায় দুই নয়ন দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল আর মাঝে মাঝে বাষ্পগদগদকণ্ঠে অধরযুগল ফুলাইয়া ফুলাইয়া, "আমায় ক্ষমা কর" এই কথাটি বলিতে লাগিল, আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমার যৌবন-সুখের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; আমার সোহাগ-স্বপ্নের হরিণী, এমন করিয়া আমার চরণতলে কেন পড়িয়া থাকিবে!

আমি দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আমার কনক লতাকে উঠাইয়া লইলাম। আমার ইহকালের সুখ, আমার বাঙ্গালী জীবনের সংসার, আমার মনুষ্যত্ব, আমার পরকালের ভরসা,—সবই বজায় রহিল, এতদিন পরে আমরা দুই জনে হংসদম্পতির ন্যায় রূপসাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছি।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোকুলে-শ্রীকৃষ্ণ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, গোপগৃহে অন্নগ্রহণের কথা। এখন হইতেছে গোপিনী বিহারের কথা। হেরম্ব-হিতবাদীর কলঙ্ক ঘোষক মকর্দ্দমার সময় এদেশের কতিপয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আদালতে উপস্থিত হইয়া ঐ বিহার শব্দের যে প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া ছিলেন, সে প্রকার অদ্ভুত ব্যাখ্যা হইলে আমরা এখানে নিশ্চয়ই পরাস্ত হইব কিন্তু বনবিহার, গগনবিহার, পাদবিহার প্রভৃতি নির্দ্দোষ অর্থে বিচার করিলে কৃষ্ণচরিত্র কদাচ কলঙ্কিত বোধ হইবে না।

বোধ করুন, যমুনা কুলে কদম্বমূলে বসিয়া কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইলেন, গৃহস্থ গোপিনীরা গৃহকার্য্য ফেলিয়া কৃষ্ণদর্শনপিপাসায় অতি দ্রুত যমুনা

কুলে সমবেত হইল; ইহাতে কি কৃষ্ণের অথবা গোপিনীগণের বিষয় বাসনার কোনপ্রকার আভাষ পাওয়া যায়? গোপিনীরা কৃষ্ণপ্রেমে বিমুগ্ধ হইয়াছিল, একথা সত্য, কিন্তু সে প্রেম অন্য প্রকার। সে প্রেম হৃদয়ের;—বাহ্য বিহারের জন্য ইন্দ্রিয় বিকারের বাহ্য প্রেম নহে।

নহে কেন, তাহাও আমরা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ষোলশত গোপিনী না হউক, অন্ততঃ বিংশতি গোপিনীও বংশীর স্বরে আকৃষ্ট হইয়া এক সঙ্গে কৃষ্ণ দর্শনে বনমধ্যে যাইত; কেহ কেহ যমুনা হইতে জল আনিবার ছল করিয়া কৃষ্ণ দর্শনার্থ কদম্বতলে প্রধাবিত হইত; মধুর অধরে মধুর মুরলী ধারণ করিয়া মনোহর ভ্রূভঙ্গিম ঠামে বনবিহারী বনমালী মুরলীমোহন শ্রীকৃষ্ণ সেই সমবেত কামিনী-কুলের মধ্যস্থলে সহাস্য বদনে শোভা পাইতেন; তাহাতে কি বাহ্য প্রেমের কোন প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইত? ততগুলি সুন্দরী যুবতী কামিনী একত্র, কৃষ্ণ যদি,—একাদশ বর্ষিয় বালক কৃষ্ণ যদি ইন্দ্রিয় বশে তাহাদের মধ্যে কাহার প্রতি অধিক অনুরাগ দেখাইতেন, তাহা হইলে তত বিলাসিনীর মধ্যে কাহারও মনে কি কিঞ্চিৎ মাত্রও ঈর্ষার উদয় হইত না? বহু রমণী সাক্ষী রাখিয়া কেহ কি কখন কোন রমণীর নির্জ্জন প্রেমালাপের অভিলাষ রাখে? কখনই না। কৃষ্ণ সর্ব্বদাই বহু গোপিনী একত্র পাইয়া সানন্দে কৌতুক লীলা প্রদর্শন করিতেন। কুঞ্জবনে রাধিকার সহিত মিলন হইত, সেখানেও সঙ্গে থাকিত অষ্ট সখী। ইহা যদি গোপিনী বিহার হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে বিহারকে নির্দ্দোষ বিহার বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। স্বীকার যাঁহারা করিবেন, তাঁহারা কদাচ বালক শ্রীকৃষ্ণকে মাখনচোরা লম্পট বালক নামে কলঙ্কিত করিতে চাহিবেন না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

পরিতাপের বিষয়, বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতেই কৃষ্ণ চরিত্রে কলঙ্কার্পিত হইতেছে। যাঁহারা আপনাদিগকে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন, বৈষ্ণধর্ম্মানুসারে কার্য্য করেন, তাঁহারা অবশ্যই শ্রদ্ধার পাত্র;—তাঁহাদের মধ্যে যাহারা গোঁড়া, তাহারাই নানা অনর্থ সৃজন করিতেছে। জ্ঞানী লোকেরা বলেন, গোঁড়ারাই কৃষ্ণকে নষ্ট করিল। বিহার লীলা প্রসঙ্গে গোঁড়ারা বলে, সর্ব্ব রসের প্রধান রস আদি রস, সেই রসে গোপিনীরা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিল, সেই ভক্তিতেই অতি সহজে গোপিনীদের কৃষ্ণ প্রাপ্তি। গোঁড়াদের এই সিদ্ধান্তের প্রতি

কিছু মাত্র বিশ্বাস রাখিতে সাধুলোকের প্রবৃত্তি হয় না। কৃষ্ণের নামে কলঙ্ক দিয়া আপনারা অধর্ম্মে ডুবিয়া ইতরের নিকটে ধার্ম্মিক নামে যশস্বী হইবে, ইহাই গোঁড়াদের চেষ্টা। সে দুশ্চেষ্ট উত্তরকালে কিছুতেই ফলবতী হইবে না। কৃষ্ণের গোপান্ন ভক্ষণের প্রসঙ্গ তুলিয়া গোঁড়ারা দম্ভ করিয়া বলে, কৃষ্ণের আবার জাতি কি? নন্দদুলাল নন্দের গৃহে অন্নগ্রহণ করিয়া পালিত হইয়া ছিলেন, তাহাতে দুলালের দেবত্বই সপ্রমাণ হইতেছে।

অন্নগ্রহণ করিলেই দেবত্ব সপ্রমাণ হয়, নতুবা হয় না;—আদিরসে মিশ্রিত হইলেই কৃষ্ণপ্রেমে কামিনী-কুলের মুক্তিলাভ হয়, নতুবা হয় না;—গোঁড়াদের এই অদ্ভুত মীমাংসা তত্ত্বানভিজ্ঞ মূর্খ বৈষ্ণবদলের কতদূর অপকার করিতেছে, তাহা যাঁহারা চিন্তা করেন, ভারতের স্বেচ্ছাচার গোঁড়াকুল যত শীঘ্র সমূলে নির্ম্মূল হয়, তাহাই তাহারা মঙ্গল ভাবিয়া থাকেন। গোঁড়ারা বাস্তবিক কৃষ্ণকে চিনিতে পারে নাই;—যতদিন গোঁড়ামী থাকিবে, ততদিন পারিবেও না। কৃষ্ণ চরিতে তাহাদের কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই।

মানব সংসারে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা এবং কার্য্যকলাপ যত কিছু, তৎ-সমস্তই মহাভারতে বর্ণিত আছে। মহাভারতে অথচ কৃষ্ণের বাল্যলীলার কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই। মহাভারতের অভিনয়-রঙ্গে কৃষ্ণের প্রথম প্রবেশ কথন, মহাভারত পাঠকেরা তাহা জানেন। পঞ্চালরাজ্যে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় লক্ষ রাজা যখন একত্র হন, সেই সময় কৃষ্ণ বলরাম সেই সভায় প্রথম দর্শন দিয়াছিলেন; তদবধি ভারতক্ষেত্রে তাহাদের প্রথম কার্য্যের আরম্ভ। পঞ্চপাণ্ডব সেই স্বয়ম্বর সভায় ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন, কৃষ্ণ তাহা জানিতেন;—পাণ্ডবের সহিত কৃষ্ণের কি সম্বন্ধ,তাহাও কৃষ্ণ জানিতেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে কৃষ্ণ একবারও পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। লক্ষ্যভেদের পর দ্রৌপদীর বিবাহের সময় পাণ্ডবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রথম পরিচয়। তদবধি ভারত সংগ্রাম এবং যদুবংশ ধ্বংসকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণের বাল্যলীলা, নন্দালয়ে বাস, গোপান্ন ভোজন এবং গোপিনী বিহারাদির কোন প্রসঙ্গ মহাভারতে নাই। আছে কি?—রুক্মিণীর স্বয়ম্বর সভায় শিশুপাল যখন কৃষ্ণনিন্দা করেন, সেই সময়ে একবার শিশুপালের মুখে

পাওয়া যায়। শিশুপাল চিরদিন শ্রীকৃষ্ণের বিদ্বেষী ছিলেন, তাঁহার রচিত কুৎসার কথাকে কৃষ্ণের অভিজাত্যের সত্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যাহারা নিন্দা করে, তাহারা সকল কথা সত্য বলে না, ইহা সকলেই জানে; অতএব নিন্দুকের বাক্য প্রমাণে কৃষ্ণ চরিত্রের বিচার করা কদাচ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

অবতার বলিয়া স্বীকার করিলে কৃষ্ণ একটী আদর্শ অবতার, নমস্কার করিয়া অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে। মানব শিক্ষার অভিপ্রায়ে, দুষ্ট দমন, শিষ্ট পালনে ভূভার হরণ করণের অভিপ্রায়ে অবতারের উদ্ভব, পুরাণ শাস্ত্র প্রমাণে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। যাহাতে মানব জাতির মঙ্গল হয়, মানব দেহ পরিগ্রহ করিয়া কৃষ্ণ সেই উদ্দেশ্যে মানব সংসারে ছোট বড় সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন; সংসারের সুখ নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন নাই; অবোধ মানবের সম্মুখে কোনপ্রকার কুদৃষ্টান্ত রাখিয়া যান নাই! ব্রজের কৃষ্ণ, বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, মথুরার কৃষ্ণ, দ্বারকার কৃষ্ণ, এবং কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ, সর্ব্বত্র মঙ্গল দৃষ্টান্তই রাখিয়া গিয়াছেন। এমন মহিমান্বিত কৃষ্ণ চরিতে যাঁহারা কলঙ্কারোপ করিতে সাহস করে, তাহারা মানব-সংসারের অভিসম্পাত স্বরূপ।

কৃষ্ণ চরিত্র সুস্মিল, সুপবিত্র, নিষ্কলঙ্ক। অজ্ঞানান্ধকারাবৃত গোঁড়া বৈষ্ণবেরা আপনাদের পায়ে আপনারা কুঠারাঘাত করিতেছে, বুঝিতে পারিতেছে না। কৃষ্ণ কিরূপ, গোঁড়ারা তাহা জানে না। হস্তির এক এক অঙ্গ স্পর্শ করিয়া সাতজন অন্ধ যে প্রকারে হস্তিবর্ণন করিয়াছিল, অজ্ঞানান্ধ গোঁড়ারাও সেই প্রকারে কৃষ্ণবর্ণন করিতেছে। হস্তি দর্শক অন্ধেরা কেহ বলিয়াছিল, হস্তি সর্পাকার, কেহ বলিয়াছিল, হস্তি সূর্পাকার; কেহ বলিয়াছিল, হস্তি স্তম্ভাকার;—কেহ বলিয়াছিল, হস্তি ঢক্কাকার; ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। অজ্ঞাননেত্রে গোঁড়ারাও কৃষ্ণকে সেইরূপ দেখিতেছে।

ন্যায়শাস্ত্রবিশারদ একজন পণ্ডিত একদা রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশে কৃষ্ণ চারিপ্রকার হইয়াছেন। ভাগবতের কৃষ্ণ, মহাভারতের কৃষ্ণ, জয়দেবের কৃষ্ণ, এবং যাত্রার কৃষ্ণ। ভাগবতের কৃষ্ণ প্রেমের কৃষ্ণ; মহাভারতের কৃষ্ণ রাজধর্ম্মপরায়ণ রাজেন্দ্র কৃষ্ণ; জয়দেবের কৃষ্ণ রসিক কৃষ্ণ; যাত্রার কৃষ্ণটি অপকৃষ্ণ।

সত্যই তাহাই। গোঁড়ারা কোন্ ভাবে কোন্ কৃষ্ণকে লইয়া খেলা করিতেছে, তাহারা নিজেই তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কলঙ্ক ছিলেন, পুনর্ব্বার আমরা সেই কথা বলিতেছি। মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বে সর্ব্ব প্রথমে প্রতিযোগী কুরু-সৈন্য দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের মনবিকার জন্মিয়াছিল, যোগ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান করিয়া ছিলেন। যে মহাপুরুষের রসনা হইতে মহার্থ গীতা বাক্য উদ্গীরিত হইয়াছিল, সেই মহাপুরুষ গোকুলে শিশুকালে তস্কর ছিলেন, লম্পট ছিলেন, এ অপবাদ সহস্রবার অগ্রাহ্য !

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ছায়াসতী।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বিদ্যালয়স্থ একটী কক্ষে সামান্য পালঙ্কে ইন্দ্রপ্রিয়া চিন্তাকুল অন্তরে শায়িত আছেন। রাত্র দ্বিপ্রহর অতীত, নিদ্রা নাই, একদিকে মাতৃস্নেহ লজ্জাভয়, অপরদিকে নবীন প্রণয়বাসনা। বৃদ্ধা পরিচারিকা যশোদা তাহার নিজের দৈনিক কর্ম্ম ও আহারাদি করিতে অধিক রাত্র হইত, এক্ষণে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, ইন্দ্রপ্রিয়া জাগ্রত; সস্নেহে বলিল, "ইন্দু! কেন দিদি, এখনও জাগিয়া আছ যে?" ইন্দ্রপ্রিয়া কোন উত্তর দিলেন না। বৃদ্ধা ধীরে ধীরে ইন্দ্রপ্রিয়ার নিকটে উপবেশন পূর্ব্বক তাহার নবনীত-কোমল অঙ্গে হস্তমার্জ্জন করিতে করিতে বলিল, "ইন্দু! তোমায় একটী কথা বলিব, রাগ করিবে না ত?" ইন্দ্রপ্রিয়া চিন্তাকুল অন্তরে ভ্রু উত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন, "কি?" বৃদ্ধা নতমুখে অস্ফুটস্বরে রমণী মোহনের প্রার্থনা জানাইল, ইন্দ্রপ্রিয়া কম্পিত অন্তরে বলিলেন, "ঝি! মা তা হলে যে মুখ দেখবেন না, তাহার উপায় কি হবে?" বৃদ্ধা প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনাবাক্যে বলিল, "কেন গো! অমন জামাই হবে, মা রাগ করবেন কেন? এখন বল, যাবে ত? তা হলে যাইতে বলি।" ইন্দ্রপ্রিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "না ঝি! আমার ভয় করে। মাসিমা যদি টের পান, আর আমি কেমন করে অপর লোকের সঙ্গে বাস করবো।" বৃদ্ধা সান্ত্বনাবাক্যে

বলিল, "ভয় কি, মাসিমা টের পাবে না, আর একলাই বা থাকবে কেন, আমি ত সঙ্গে যাব।" ইন্দ্রপ্রিয়া নীরবে রহিলেন। ঝি আবার বলিল, "তবে কবে যাবে?" ইন্দ্রপ্রিয়া অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা।" পরিচারিকা আনন্দিত অন্তরে চিন্তাকুলা বালিকার সুশ্রুষা করিতে লাগিল। ভাবনায় ক্লান্তা বালিকা নিদ্রাভিভূতা হইলে ঝি আপনিও শয়ন করিল।

আকাশ অন্ধকার করিয়া বারিবর্ষণ করিতেছে। ১১ই শ্রাবণ বিদ্যালয়ে মহাগোলযোগ উপস্থিত, সকলেরই মুখে ভীতিচিহ্ন। ইন্দ্রপ্রিয়া যশোদা দাসীর সহিত অদৃশ্য! কেহই কিছু অনুধাবন করিতে পারিতেছে না; বিদ্যালয়ের কর্ত্রী কোন্নগরে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। কুসংবাদে তনয়াবৎসলা মাতা শোকে দুঃখে অভিভূতা হইলেন। উচ্চবংশে কালিমা পড়িল, এই চিন্তায় শোক ক্রমে ক্রোধে পরিণত হইয়া পুত্রকে বলিলেন, "পাপিষ্ঠার অনুসন্ধানে আবশ্যক নাই। যাহার দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে এতদূর সাহস, অধিক বয়সে সে যে কত মন্দ হইবে, তাহা বলিতে পারি না, তাহার চিন্তায় আর আবশ্যক নাই, মনে করিব—তাহার মৃত্যু হইয়াছে। বিদ্যালয়ে সে প্রধানা হইয়াছিল, আশা করিয়াছিলাম,—কন্যা আমার রূপে গুণে সমতুল্য হইবে; কিন্তু আমার যেরূপ দূরদৃষ্ট, কার্য্যেও সেইরূপ হইল। যশোদা দাসীকে যে এত দয়া করিতাম, সে তাহার উত্তমরূপ প্রতিশোধ দিয়াছে; অতএব অনুসন্ধান করিয়া কলঙ্ককালিমা আর উজড়ান করিবার আবশ্যক নাই।" নীরেন্দ্র শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা, ক্রোধের চেয়ে শত্রু নাই, রোষ পরবশ হইয়া কি নির্দ্দোষ বালিকাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিব?" এই বলিতে বলিতে নীরেন্দ্রের কণ্ঠ হইতে আর কথা নির্গত হইল না। স্নেহময় ভ্রাতা নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। শোকদলিতা মাতা পুত্রের ক্রন্দনে অধৈর্য্য হইয়া ভূমিতে লুঠাইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সে স্থানে আর একটী স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন, যাঁহার অন্তরে ইন্দ্রপ্রিয়ার পলায়নে কোনও ক্লেশ হয় নাই, বরং আনন্দ হইয়াছে। এই ঈর্ষান্বিতা অবলা নীরেন্দ্রের সহধর্ম্মিণী। ইন্দ্রপ্রিয়া সৌন্দর্য্যে ও সদ্‌গুণে মাতা ও ভ্রাতার অতি প্রিয় ছিলেন, এই কারণে কুটিলা ভ্রাতৃবধূর অত্যন্ত বিরাগভাজন ছিলেন। নীরেন্দ্রের স্ত্রী শত্রুকে উত্তোলন পূর্ব্বক সযত্নে মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "মা, কেন আর প্রাচীন দেহে নিষ্ঠুর কার্য্যের

নীরেন্দ্র মাতাকে বলিলেন, "মা, আমি প্রকাশ্যরূপে ইন্দ্রপ্রিয়ার সন্ধান লইব না। দুইজন গোয়েন্দা রাখিব, তাহারা গোপনে অনুসন্ধান করিবে; যশোদা দাসী ত লুকাইয়া থাকিবে না? সন্ধান পেলেই আমরা যাইব, এক্ষণে আমি কলিকাতায় চলিলাম, দুই চারিদিন বিলম্বে আসিব।" মাতা কোন উত্তর দিলেন না, নীরেন্দ্রের পত্নী কেবল বিরক্তভাবে স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, পুত্র প্রস্থান করিলে, ইন্দ্রপ্রিয়ার মাতা উঠিয়া যে কক্ষে কন্যা শয়ন করিত, সেই কক্ষের দ্বারে চাবিবন্ধ করিয়া বলিলেন, "এই দ্বারটির কিছুদিনের জন্য রুদ্ধ হইল।" ইন্দ্রপ্রিয়ার মাতা বা ভ্রাতা দুই বৎসর যাবৎ তাহার কোন সংবাদ পান নাই। তৃতীয় বৎসরের প্রারম্ভে এক-জন গোয়েন্দা আসিয়া বলিল, "যশোদা নূতন বাজারের নিকট চিৎপুর রোডে একখানি একতলা বাটীতে বাস করিতেছে।" [ক্রমশঃ]

শ্রীমনুজেন্দ্র দত্ত।

কাল ও আজ।

কাল সে এখানে ছিল, কাল ঘরে ছিল আলো,
দিয়ে গেছে—নিয়ে গেছে, সে আজ আঁধার কালো;
কাল তা'রে ব্যথা দিছি, জানিনাক কোন কাজে,
তা'র সে অশ্রুর স্মৃতি, আজ বড় প্রাণে বাজে!
কাল সে কাতর নেত্রে রুধেছিল মোর রোষ,
আজিকে পরাণ কাঁদে, এ ত নয় তা'র দোষ!
সুখের শয়নে কাল সে এনে দেছিল ঘুম,
আজ মনে পড়ে তা'র সেই শেষ—শেষ চুম।
কাল সে বলিয়া দেছে, "কেঁদ'না, আসিব ফের!"
আজ ভাবি, এই বুঝি শেষ দেখা জীবনের।
কাল সে ভরিয়েছিল হৃদয়ের অন্তঃপুর,
আজ সেই আশা-সাধ কে ভেঙে করেছে চুর?
ভাবিয়ে রেখেছি সুধু, আসিবে সে, হ'বে দেখা;—
হ'বে কি না হ'বে ফের, জানেন ভবেশ একা!

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী।

এ নহে সান্ত্বনা।

(১)

এ নহে সান্ত্বনা সখা শুধু অশ্রুজল !
ঝরিতেছে অবিরল,
যেই শোক অশ্রুজল,
তোমার নয়নে, তাতে মিশাতে কেবল
দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু আমার সম্বল !
এ নহে সান্ত্বনামাখা শুধু অশ্রুজল !

(২)

এ নহে সান্ত্বনা শুধু হতাশ নিশ্বাস !
আজি যে প্রলয় ঝড়ে,
ঘন আন্দোলন করে,
স্নেহ সুকোমল তব হৃদয় আকাশ ;
কেবল তাহার বেগে,
উড়িতেছে থেকে থেকে,
হৃদয়ে ভীষণ ঝঞ্ঝা শোকের উচ্ছ্বাস !
এ নহে সান্ত্বনা শুধু হুতাশ নিশ্বাস !

(৩)

এ নহে সান্ত্বনা সখা শুধু হাহাকার !
আনন্দ আলয়ে তব,
সদা আনন্দের রব
উঠিত ; এখন হায় কি দশা তাহার !
হারায়ে নয়নমণি,
পুত্রহারা বিষাদিনী,
হানে বুকে করাঘাত ক্ষণে শতবার ;
ভুবন ভরিয়া উঠে তাঁর হাহাকার !
থাকি এ সুদূর স্থানে,
তবু ভুলি প্রতিক্ষণে,
মর্ম্মভেদী নিদারুণ বিলাপ তাঁহার !
তাই উঠে প্রাণ হ'তে,
হৃদয়ের প্রতিঘাতে,
সুগভীর শোকধ্বনি প্রতিধ্বনি তার !
এ নহে সান্ত্বনা সখা শুধু হাহাকার।

(৪)

এ নহে সান্ত্বনা শুধু হৃদয় অনল !
ক্ষণস্থায়ী যে চিতায়,
ভস্ম হইয়াছে হায় !
সে সুন্দর কমতনু কুসুম কোমল ;
নিভিয়া গিয়াছে তাহা হয়েছে শীতল।
কিন্তু যেই শোকানলে,
তোমার হৃদয় জ্বলে,
দগ্ধ অনুক্ষণ জননীর বক্ষস্থল ;
সে অনল দুর্নিবার,
রাবণের চিতাকার,
প্রজ্জ্বলিত রবে সদা ; শত গঙ্গাজল,
কিম্বা সপ্তার্ণব নীরে না হবে শীতল !
নদ নদী সুশীতল,
উল্লঙ্ঘিয়া সে অনল,
হৃদয়ে জ্বেলেছে শিখা ভীষণপ্রবল !
এ নহে সান্ত্বনা শুধু হৃদয় অনল !

(৫)

কি দিব সান্ত্বনা সখা কি আছে সম্বল ?
বিদারিছে হাহাকার,
মুছাতে নয়নাসার,
নিভাইতে হৃদয়ের ভীষণ অনল,
না জানি প্রবোধ বাক্য হৃদয় বিফল !
এ নহে সান্ত্বনা সখা শুধু অশ্রুজল !

ভট্ট মোক্ষমূলর।

প্রাচ্যজ্ঞান পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যে এক্ষণে যথেষ্ট আদৃত, তাহার অন্যতম কারণ হইতেছে, আমাদিগের প্রতি একান্ত অনুরক্ত মহাত্মা ম্যাক্সমূলার। স্বর্গীয় ম্যাক্সমূলারের ন্যায় প্রাচ্যসংস্কারে অভিজ্ঞ, বহুভাষাবিৎ বলিয়া বিশ্ব-ব্যাপী যশোলাভ করিতে আর কেহ পারিয়াছেন, এমন কথা স্মরণ হয় না। সংস্কৃত-সাহিত্যের আকর ভারতবর্ষের পক্ষে এই সংস্কৃতানুরাগী পাশ্চাত্য বন্ধুর বিয়োগ শোকোদ্দীপক নিশ্চিতই। শোকের সময় শুচ্য বন্ধুর স্মরণ হয়, তাঁহার কার্য্যাবলীর স্বতই দৃষ্টিপথে আবির্ভাব হইতে থাকে। এই জন্যই অদ্য অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের জন্মবিবরণ, কীর্ত্তিকলাপার্জ্জন ও দেহবিসর্জ্জন যথাক্রমে স্মৃতিপথে প্রতিভাত হইতেছে বলিয়া, এই স্থানে প্রকটিত হইল।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে জর্ম্মণীর অন্তর্গত দেশগ্রামে সম্ভ্রান্ত মূলর বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন; ইহাঁর মাতৃবংশ ও পিতৃবংশ—উভয়ই সারদার অনুগৃহীত;—পিতামহ মহাকবি গেটের জনৈকবিশিষ্ট বন্ধু—শিক্ষা-বিভাগের প্রধান সংস্কারক বলিয়া মান্য, পিতা উইলহেল্‌ম মূলর সুপ্রসিদ্ধ

জর্ম্মাণ কবি! আমাদিগের দেশে অনেকেই বিদিত আছে, সারদার সহিত কমলার চিরবিবাদ; কবি সারদার পূজায় রত থাকিয়া, কাব্যামৃতে বিভোর হইয়া বলিতে পারেন;—যাও লক্ষ্মী অমরায়, যাও লক্ষ্মী অলকায়, আসিও না কবিজন-তপোবন স্থলে! আর তাই যেন রুষ্টা হইয়া কমলা কবির গুণরাশি দারিদ্র্যদোষে আবৃত করিতে প্রয়াস পান। জর্ম্মাণকবি উইলহেল্‌ম মূলর মহোদয়ের ভাগ্যে লক্ষ্মী সরস্বতীর যুগপৎ প্রসাদলাভ ঘটিয়া উঠে নাই। লক্ষ্মীর বিরাগ জন্যই পিতার যথেষ্ট আনুকূল্য না পাইয়া, কবিপুত্র ম্যাক্‌সমূলরকে বাল্যকাল হইতে জীবিকার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় শিক্ষার জন্য সচেষ্ট হইতে হইয়াছিল—স্বনির্ভরেই শিক্ষাসোপানে অধিরোহণ করিতে হইয়াছিল। বাল্যজীবনের এই সকল সঙ্কটই হইতেছে, তাঁহার অধ্যবসায় দৃঢ় করিবার কারণ—অক্ষুণ্ণ উন্নতির মূল!

সংসারে দোষবর্জ্জিত গুণ নাই! যেমন প্রাণহর বিষও অবস্থাবিশেষে প্রযুক্ত হইল, প্রাণরক্ষা হয়, তেমনই গুণরাশিনাশী দারিদ্র্যও অনেক সময় গুণকর হইয়া থাকে। দরিদ্রপুত্র অধ্যবসায়ী বালক ম্যাক্‌সমূলরের পক্ষে দারিদ্র্য বিদ্যাসাধনের সহায় হইয়াছিল। বাল্যজীবনের পরিচয় পাইয়া কেহ বলিয়াছিলেন, আপনি কেমন করিয়া এরূপ উন্নতিসাধনে সমর্থ হইলেন? প্রত্যুত্তরে ম্যাক্‌সমূলর মহোদয় বলিয়াছিলেন,—"দারিদ্র্য ও কঠোর পরিশ্রম আমার এই উন্নতিবিধান করিয়াছে।" আমরা জানি, সংযমী ব্রহ্মচারী না হইলে, বিদ্যাসাধন হয় না; নিঃসঙ্গতা, বিলাসহীনতা, স্ত্রীসঙ্গ-বর্জ্জিতা বিদ্যাসাধনের প্রধান সহায়। কিন্তু কমলার কোমল ক্রোড়ে যাঁহাদিগের আশ্রয়, তাঁহাদিগের পক্ষে অনুচরসঙ্গ, বিলাস-সাধন, মিষ্টভোজন, স্ত্রী রাক্ষসী-গণের সহসংলাপন প্রায়ই অনায়াসলভ্য। সুতরাং ভোগভূমির অধিবাসীর পক্ষেও, দারিদ্র্য বিদ্যাসাধন সম্বন্ধে অমৃতপ্রসাবী হওয়াই সম্ভবপর।

বালক ম্যাক্‌সমূলর ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্থানীয় হ্যকল্স বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন; তথায় সঙ্গীত-বিদ্যায় পারিদর্শী হইয়া বেশ সুখ্যাতি লাভ করেন। কবিপুত্রের রসগ্রহণশক্তির উৎকর্ষ থাকায়, তাঁহার সঙ্গীতে অনেক মহাত্মারই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল; তাই তাঁহার সঙ্গীত বিদ্যায় অধিকার দৃঢ় ও প্রতিষ্ঠা দিগন্তকসারিণী হওয়ায়, কবি পিতা মহাত্মা মূলরের মনে যে অনিবার্য্য আমোদের উৎস ছুটিয়াছিল, তাহা তৎকালিক

কিন্তু পিতা দরিদ্র; পুত্রপোষণ তাঁহার পক্ষে কষ্টকর! পুত্র-শিক্ষাসম্বন্ধে করেন কি? নিরুপায়! পুত্র কিন্তু এই সময় দরিদ্র পিতার গলগ্রহ বা ভারবিশেষ না হইয়া, স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থানজন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থের পুনর্লিপিকরণ-কার্য্যে ব্রতী হইয়া জীবিকার্জ্জনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন! ১৮৪১ সালে লিপজিক্ কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৪৩ সালে P P. D. উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। লিপজিক কলেজে এই বর্ষত্রয়-ব্যাপী শিক্ষাকালে তথায় বিখ্যাত পণ্ডিত হর্ম্মণ ও হাপ্ত অধ্যাপকতা করিতেন; তাঁহাদের অধ্যাপনার গুণে ম্যাক্সমূলরের সংস্কৃতশিক্ষায় ক্রমশই অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই উপাধি লাভের পরেই ম্যাক্সমূলর বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করেন; পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে তাঁহার সুকোমল কৌমার-হৃদয়ে সংস্কৃতানুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল বলিয়া, ইংলণ্ড হইতে এসিয়া গবর্ণমেণ্টের তৎকাল-সংগৃহীত হস্তলিখিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, বার্লিণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করেন; হিব্রু ও সংস্কৃতের চর্চ্চায় অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অচ্ছেদ্য আয়াস স্বীকার করিয়া, বিখ্যাত ভাষাবিৎ পণ্ডিত বপ্ ও সোলিঙের সাহায্যে সফলকাম ও কৃতার্থ হন।

অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ম্যাক্সমূলর বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া জীবিকার্জ্জনে নিযুক্ত হয়েন সত্য, কিন্তু বিদ্যার সাধনে বিরত হয়েন নাই। সংস্কৃত-সাহিত্যের রত্নে মাতৃভাষার উন্নতি সাধিতে কৃতসঙ্কল্প হন; তাঁহার জীবনস্রোত বিংশতি বর্ষ অতিক্রম করিতে না করিতে বিষ্ণুশর্ম্মকৃত হিতোপদেশের জর্ম্মাণ অনুবাদ রূপ উজ্জ্বল-রত্ন প্রকাশ পায়।

তাঁহার সংস্কৃত অধ্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানপিপাসা ক্রমশই বলবতী হইতে লাগিল। তৎপরে তিনি ফরাসী রাজধানী পারী সহরে গিয়া, তত্রত্য প্রাচ্য ভাষাবিৎ পণ্ডিত ইউজিন বুর্ণোর উপদেশলাভে স্বীয় জ্ঞানবৃদ্ধি করেন। এই পারী সহরে পণ্ডিত ইউজিনের সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণে আর্য্যদিগের পরম আদরের বস্তু বেদের উপর তাঁহার অনুরাগ সঞ্চারিত হইল। সেই জ্ঞানময় বেদের অধ্যয়নের ও তাহার যথেষ্ট প্রচারের জন্য সঙ্কল্প করিলেন; এই সঙ্কল্পের সাধনে দৃঢ়ব্রত হওয়াতেই ইহাঁর যশঃসৌরভ বিশ্বব্যাপী দিগন্তপ্রসৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইউজিন বুর্ণোর ওজাস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণ

তাঁহার সংস্কৃত অধ্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানপিপাসা ক্রমশই বলবতী হইতে লাগিল। তৎপরে তিনি ফরাসী রাজধানী পারী সহরে গিয়া, তত্রত্য প্রাচ্য ভাষাবিৎ পণ্ডিত ইউজিন বুর্ণোর উপদেশলাভে স্বীয় জ্ঞানবৃদ্ধি করেন। এই পারী সহরে পণ্ডিত ইউজিনের সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণে আর্য্যদিগের পরম আদরের বস্তু বেদের উপর তাঁহার অনুরাগ সঞ্চারিত হইল। সেই জ্ঞানময় বেদের অধ্যয়নের ও তাহার যথেষ্ট প্রচারের জন্য সঙ্কল্প করিলেন; এই সঙ্কল্পের সাধনে দৃঢ়ব্রত হওয়াতেই ইহাঁর যশঃসৌরভ বিশ্বব্যাপী দিগন্তপ্রসৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইউজিন বুর্ণোর ওজাস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণ

মুদ্রণ করিবার ইচ্ছা হয়। তাঁহার নিজের কথায় প্রকাশ, তদাকৃষ্টহৃদয়ে তাহার সাধন চিন্তায় আবিষ্ট থাকিয়া, যে ভাবের অনুভব করিয়াছিলাম, অদ্যাপি তাহার স্মরণ হইলে, সেই মহা দৃশ্য আমার দৃষ্টির সমক্ষে জাজ্বল্যমান বলিয়া প্রতিভাত হয়। পণ্ডিতপ্রবর আচার্য্য বুর্ণো তাঁহার কুশাগ্রসদৃশ সূক্ষ্ম বুদ্ধিবলে প্রাঞ্জল অথচ বিশদবাক্যে অদম্য উৎসাহে উদ্দীপ্তভাবে পূর্ণকক্ষ নির্ঝরধারার ন্যায় জ্ঞানধারার যে অবিরল স্রোত বহাইয়া ছিলেন—বিবেকের অবিরাম উদ্গীরণ করিয়াছিলেন, সেরূপ আর কখনও দেখি নাই। উৎসাহোৎফুল্লবদন বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্র ছাত্রগণে পরিবৃত বাগ্মিবরের সে সৌম্যমূর্ত্তি—সে মোহন দৃশ্য—কখন কি ভুলিতে পারা যায়? যাঁহার ছাত্রগণ গুণগরিমায় জগদ্বিখ্যাত—প্রাচ্যখণ্ডেও যাঁহাদিগের জ্ঞানের আলোক প্রতিফলিত, তাঁহাদের অনেকে আমাদিগের দেশীয় প্রাতীচ্যজ্ঞানবৃদ্ধের পরিচিত। গোল্ডষ্টূকার এবটবাভেলি গোরেশিও নেভ ও রথ—আমার সতীর্থ হইলেও, আমি সর্ব্বকনিষ্ঠ; যদিও ইতিপূর্ব্বে সংস্কৃত হিতোপদেশের অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলাম,—কালিদাসকৃত কাব্য মহাকাব্যগুলির অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, ষড়্দর্শন ও উপনিষদের পরিচয় পাইয়াছিলাম; অপিচ তদ্ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থেরই বিষয় অবগত ছিলাম না, তখন আমার দৃঢ় ধারণা ছিল, উপনিষদে যেমন অমৃতময়চ্ছন্দে সুললিত বাক্যজ্ঞানের উপদেশ আছে, এমন আর কুত্রাপি নাই। ইতিপূর্ব্বে যখন বার্লিণে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন পণ্ডিত মোলিঙের উপদেশে ইহার কোন কোন অংশ অনুবাদ করিয়াছিলাম সত্য,—রয়েল লাইব্রেরীর হস্তলিখিত পুস্তক হইতে ভাষ্যের কিয়দংশ উদ্ধৃতও করিয়াছিলাম বটে, এবং সেইদিকেই বিশিষ্টরূপ মনোনিবেশ করিবার সঙ্কল্পও করিতেছিলাম; কিন্তু তখন জ্ঞানময় বেদের কথা ভাবি নাই। কিন্তু যখন পণ্ডিত বুর্ণো মহোদয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বেদের মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণের সহিত তুলনায় উপনিষদের হীনতা দর্শাইলেন, তখন আমার মন বিস্ময়ে অভিভূত হইল। একদিন মহাত্মা বুর্ণো রোসেন সঙ্কলন ঋগ্বেদের প্রথমভাগের উপর বক্তৃতা করিতেছিলেন। তাঁহার সেই অমৃতনিঃস্যন্দিনী বক্তৃতা হইতে যে সারসঙ্কলনে সমর্থ হইয়াছিলাম, এবং তাহার সযত্নরক্ষিত হস্তলিখিত সায়ণভাষ্য হইতে যে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়া লইয়াছিলাম, তাহা এখনও

অধ্যাপক বুর্ণো আমার প্রতি সদয় হইয়া, তাঁহার হস্তলিপি পুস্তকগুলি পাঠ করিবার অনুমতি দিয়া আমাকে বিশিষ্ট অনুগৃহীত করিলেন; এবং বিশিষ্ট অংশগুলির উদ্ধার করিয়া লইতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহার নিকট শিক্ষার প্রারম্ভকাল অতীব কষ্টকর বোধ হইয়াছিল; সময়ে সময়ে নৈরাশ্যের বিকট হাস্যে মর্ম্মাহত হইতাম। আবার তাঁহার আশ্বাসবাণীতেই যেন নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হইতাম। কিন্তু তখন পর্য্যন্তও বেদ ও সায়ণাচার্য্যকৃত টীকার অংশাংশ মুদ্রাঙ্কণ করা ব্যতীত আর কোন অধিকতর আশা করিতে পারি নাই। মনে করিতাম, এতদতিরিক্ত আর কিছুই করিবার নাই। কোলব্রুকের ধারণা আমার ধারণার অনুরূপ। তিনি "হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র" শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহার কালে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, "বেদ এরূপ বৃহৎ গ্রন্থ যে, সম্পূর্ণ অনুবাদ অসম্ভব; এবং তদ্দারা অনুবাদকেরও তৃপ্তি হইবেই না, পাঠকের তৃপ্তি লাভ ত পরের কথা। অপিচ যে প্রাচীন ভাষায় তাহা লিখিত, তাহা অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ। কিন্তু ইহা এতই মহত্ত্বসম্পন্ন যে, ইহার সাহায্যে কি প্রাচ্য কি প্রাতীচ্য সকল প্রকার পণ্ডিতগণের যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা।" এইরূপ সত্যের প্রবল প্রসারে বহু পণ্ডিতের হৃদয়ক্ষেত্র বিপর্য্যস্ত থাকিলেও, ফরাসী পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক বুর্ণো ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিতেন। তিনি বলিতেন, বেদ প্রকাশ করিতে হইলে, মূল ও টীকার সহিত প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য; আর এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে ইউরোপের সংগৃহীত সকল পুস্তকেরই পাঠ মিলাইয়া দেখারও সবিশেষ প্রয়োজন। কতিপয় উদ্ধৃত শ্লোকের উপর নির্ভর করা উচিত নহে। তাহাতে দুরূহ অংশের বর্জ্জন হওয়াই সম্ভবপর।

দ্বাবিংশবর্ষীয় দরিদ্র যুবকের এই দুরূহ ব্যাপারের সাধনসঙ্কল্পে আগ্রহ হইল। ইহার পূর্ব্বে পণ্ডিত রোসেন বেদের প্রথম কিয়দংশের মুদ্রণ ও প্রকাশ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা অতি স্বল্পাংশমাত্র। ইউরোপের কুত্রাপি একখানি সমগ্র বেদ পাওয়া গেল না; জর্ম্মণী ও ফ্রান্সের পুস্তকাগারে সংগৃহীত গ্রন্থ হইতে ভিন্ন ভিন্ন অংশ উদ্ধার করিয়া শেষে ভারতের রত্নাধার ইংলণ্ডে গমন করিয়া, অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন; তথায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত বড্‌লিয়ান লাইব্রেরীতে যে সমস্ত হস্ত-

লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ পাইলেন, তাহার সহিত পূর্ব্ব সংগৃহীতাংশের পাঠ মিলাইয়া সমগ্র বেদের উদ্ধারের চেষ্টায় ব্রতী হইলেন। এই সময়ে প্রগাঢ় পণ্ডিত রাজনীতিকুশল জর্ম্মাণ রাজপুত ব্যারণ বুনসেনের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি এই জ্ঞানানুসন্ধিৎসু দরিদ্র জর্ম্মণযুবকের অধ্যবসায়ে সন্তুষ্ট হইয়া, বিশিষ্টরূপ চেষ্টায় ও ঐকান্তিক অনুরোধে ভারত-বাণিজ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বেদ-মুদ্রণের বিপুল ব্যয় ভারবহন করিতে সম্মত করাইয়াছিলেন! এখন হইতে তিনি নিশ্চিন্ত মনে বেদের মুল ও টীকা সংগ্রহে ব্রতী হইতে পারিলেন।

১৮৪৯ হইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ২৫ বৎসরের প্রগাঢ় পরিশ্রমে ম্যাক্সমূলর ঋগ্‌বেদের অনুবাদ সাঙ্গ করিয়া ছয়খণ্ডে মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ প্রকাশ কার্য্যে যে, তিনি তাঁহার বন্ধুর ব্যারণ বুনসেনের নিকট বিশিষ্টরূপ ঋণী, তাহা তাহার ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রবন্ধে প্রসঙ্গতঃ তিনি তাহার খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন;—তাহাতে প্রকাশ—

"বিংশতি বৎসর অতীত হইতে চলিল, আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু বুনসেন একদিন আমাকে তাঁহার লাইব্রেরীতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া, বলেন—ঋগ্বেদ অনুবাদ প্রকাশের জন্য আর চিন্তা করিতে হইবে না। তিনি অনেক দিন হইতে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, এই অমূল্য গ্রন্থের অনুবাদপ্রকাশের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিয়া, উহার ইংলণ্ড হইতেই প্রকাশ সঙ্গত বলিয়া ধারণা জন্মাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। উক্ত মহান্ বণিক্‌সম্প্রদায়ের কার্য্যপরিচালকগণ মহাত্মা বুনসেনের পরামর্শে উক্ত কার্য্যের ভার বহনে সম্মত হন; আর সেই শুভসংবাদ বন্ধুবর বুনসেন আমার নিকট জানাইয়া, আমার উদ্বেগ দূর করিয়া আমাকে প্রোৎসাহিত করেন। পরে তিনি আরও বলেন, 'এই কার্য্য লইয়াই, বন্ধো, তোমার জীবনযাপন হইতে পারিবে। খনি হইতে অবিশুদ্ধ ধাতুর উদ্ধার করিলেই, তোমার কর্ত্তব্য সাধিত হইবে না; ঐ অবিশুদ্ধ ধাতুর খনিজ মলাদির অপসারণ করিয়া, যতক্ষণ বিশুদ্ধিসাধনে সমর্থ না হইবে, ততক্ষণ তোমার কার্য্য সাঙ্গ হইবে না'।"

এই বিস্তৃত সময় কেবল বেদসঙ্কলনেই অতিবাহিত করেন নাই; ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বসম্বন্ধের উপদেশ

অধ্যাপনাকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বড্‌লিয়ান লাইব্রেরীর কিউরেটার পদে অভিষিক্ত হন। এই সময় হইতেই ইনি যশোগৌরবে ও উপাধিলাভে বিশিষ্টরূপ সম্বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এই সময় হইতে তিনি বহুসংখ্যক গ্রন্থের প্রণয়ন ও সঙ্কলন করেন; তাহার উল্লেখ করা এই সামান্য প্রবন্ধের উপযোগী নহে। তিনি ৫০খানি প্রাচ্য গ্রন্থে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা করিবার কালে তিনি কেম্ব্রিজ, এডিনবরা, গ্ল্যাসগো প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সময়ে সময়ে উপদেশ ও বক্তৃতা করিতে প্রায়ই ব্রতী থাকিতেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রবার্ট হার্ব্বার্টের দানপত্রের মতানুসারে "ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিকাশ" সম্বন্ধে বক্তৃতার জন্য বৃত্তি ব্যবস্থাপিত হইলে, তাহার বক্তা নিযুক্ত হয়েন, অধ্যাপক ম্যাক্‌সমূলর। তাঁহার অমৃতনিঃস্যন্দিনী বক্তৃতার শ্রোতৃগণের এত সমাবেশ হইত যে, দিনে দুইবার বক্তৃতা না করিলে, সাধারণের শ্রুতিতৃপ্তি সাধিত হইত না। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আদাম্ গীফোর্ড নামক একজন মৃত ধনী—স্কট্‌লণ্ডীয় বারিষ্টার তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি ধর্ম্ম-বিজ্ঞানসংক্রান্ত বক্তৃতার জন্য বৃত্তিরূপে দান করিয়া যান; তাহারও বক্তা নিযুক্ত হয়েন, অধ্যাপক ম্যাক্‌সমূলর। তাঁহার সকল বক্তৃতাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সকল পুস্তকের আদরও যথেষ্ট।

সে যাহাই হউক, যে ঋগ্বেদ প্রচারের জন্য, ম্যাক্সমূলর বিশ্ববিখ্যাত, সেই ঋগ্বেদের প্রথম সংস্করণের পুস্তকগুলি মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়ের দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রীত হয়; তাহার পর উহার পুনঃ সংস্করণের প্রয়োজন হইলে, ম্যাক্স-মূলর ভারতের ষ্টেট সেক্রেটরীর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন; কিন্তু ভারতীয় বিলাতী কর্ত্তা তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন নাই। অতঃপর ১৮৯০-৯২ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের স্বর্গীয় মহারাজ চারিখণ্ডে সংস্কৃত পুস্তকের মুদ্রণ ব্যয় বহন করিয়াছিলেন।

শ্রীঅঘোরনাথ শাস্ত্রী।

আঁধার মাণিক।

(১)

সকালের ফুল,　　শুকায় বিকালে,
আলোকের ধারে ঘোর অন্ধকারে।
সম্পদের ধারে　　বিপদ বিষম,
আজিকার হাসি কাল অশ্রুধার॥

(২)

নীলমেঘ কোলে　　চপলার হাসি
ক্ষণেকের তরে প্রকাশ পায়।
স্রোতস্বিনী বক্ষে　　লহরীর মালা
নিমিষের মাঝে মিলিয়া যায়॥

(৩)

প্রণয়ে বিরহ　　জীবনে মরণ
নশ্বর জগতে কি আছে সার।
ভাই পরিজন　　নিশার স্বপন
মানব জীবনে কিবা আছে আর॥

(৪)

মরিতে জনম　　তবে কেন ছাই
দুদিনের তরে খেলি এ খেলা।
আঁধারে জনম　　ডুবিব আঁধারে
ফুরাবে যখন জীবন বেলা॥

(৫)

নিরাশায় কেন　　করি হাহাকার
সুখনীরে কেন আবার ভাসি।
বুঝিতে পারিনা　　এ কেমন খেলা
দু-দিনের তরে ভালবাসা বাসি॥

(৬)

মাটির মানুষ　　ছাই মাটি নিয়ে
তাই নিশিদিন থাকে সে ভালো।
ভ্রমেও ভাবেনা　　পরাণ চাহেনা
আঁধার ঘরের মাণিক আলো॥

শ্রীশ্রীশচন্দ্র দে।

কবিতা কোরক।—শ্রীরাজচন্দ্র পাঁড়ে সঙ্কলিত। বিদ্যালয়ের বালক-গণের পাঠোপযোগী করিবার অভিলাষে রাজচন্দ্রবাবু এই পুস্তকখানিতে কতকগুলি সুনীতিপূর্ণ সরল কবিতা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সর্ব্বশুদ্ধ ত্রিশটী কবিতা আছে। তন্মধ্যে অষ্টাদশটী রাজচন্দ্রের নিজের রচিত, অবশিষ্ট দ্বাদশটী অপরাপর লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিগণের কবিতাবলী হইতে উদ্ধৃত। বিষয়-গুলির নির্ব্বাচন অতি উত্তম হইয়াছে; কবিতাগুলিও উত্তম; বালকেরা ইহা পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

বাবু রাজচন্দ্র পাঁড়ে অকবি নহেন, তাঁহার স্বরচিত কবিতাগুলি পাঠ করিয়া তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু কবিতাগুলির মধ্যে মধ্যে দুই একটী মিলদোষ এবং যতিভঙ্গদোষ দৃষ্ট হয়। যথা—৩য় পৃষ্ঠায় প্রাতঃউত্থানে

"মৃদুর সমীর পুষ্পে কাঁপিছে নলিনী;
পরিমল হরি মধুমক্ষি অভিমানী"—

এই দুই চরণে মিলদোষ এবং যতিদোষ, উভয়ই আছে। "নলিনীর" সহিত "অভিমানী"পদের সুমিল হয় না; দ্বিতীয়তঃ "পরিমল" হরি মধুমক্ষি অভিমানী, এই চরণের প্রথমে অষ্টাক্ষরা যতি ধরিলে মধুশব্দের পরে যতির বিরাম দিতে হয়;—পরিমল হরি মধু, মক্ষি অভিমানী,—যতিভঙ্গ জন্য সুতরাং এটা শুনিতে ভাল হয় না। আরও একাদশ পৃষ্ঠায় নীতিসারে—

"ঔষধিমন্ত্রের গুণে সর্প বশ হয়;
খলেরে করিতে বশ নাহিক উপায়॥"

এখানেও হয়, আর উপায় মিলদোষ। আরও সপ্তদশ পৃষ্ঠায় রাজভক্তি প্রসঙ্গে—

"যাঁহার রাজ্যেতে রহি যাঁর শস্য খেয়ে,
সুখেতে বেড়াও তুমি নাচিয়া গাহিয়ে।"

খেয়ে আর গাহিয়ে, এই দুটীতে মিলদোষ। তাহা ছাড়া "নাচিয়া গাহিয়ে", এরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না;—নাচিয়া গাহিয়া অথবা নাচিয়ে গাহিয়ে, এইরূপ হওয়াই উচিত। যাহা পাঠ করিয়া নীতি-শিক্ষার সঙ্গে বিদ্যালয়ের বালকেরা কবিতার লক্ষণ শিক্ষা করিবে, তাহাতে ঐরূপ দোষ থাকা শোভা পায় না। আশা করি, কবি ভবিষ্যতে ঐরূপ দোষগুলি পরিবর্জ্জন করিবেন।

BENGAL LIBRARY
11. APR. 19
525
585

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক পত্র ।)

নবম বর্ষ । } ১৩০৭ সাল, মাঘ । { ৭ম সংখ্যা ।

হায় মা ভিক্টোরিয়া !

হায় মা ! তোমার নাম পশিলে শ্রবণে,
বিপুল আনন্দস্রোত উথলিত মনে ॥
আজি কেন সেই নামে কর দিয়া শিরে,
ভাসিছে ভারতবাসী নিরানন্দনীরে ?
স্বর্গধামে পশিয়াছ পুণ্যবতী তুমি ।
তবশোকে অন্ধকার আজি আর্য্যভূমি ॥
শুধু আর্য্যভূমি নয় সমগ্র সংসার ।
তবশোকে সকলেই করে হাহাকার ॥
ভারতের মহারাণী বিলাতের রাণী
এ জগতে নাহি আর ! কি নির্ঘাত বাণি !
জননীরূপিনী ছিলে আমরা সন্তান ।
ফেলিয়ে কোলের ছেলে করেছ প্রস্থান ॥
হায় মা ! তোমারে মোরা চক্ষে হেরি নাই ।
ছবিতে মুদ্রাতে রূপ দেখিবারে পাই ॥
তবু যেন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীরূপ ধরি,
সম্মুখে উদয় আজি ভারত-ঈশ্বরী ॥
ছিলে মা দয়ার নদী স্নেহের প্রতিমা ।

আজি মা কোথায় তুমি! কোন্ পুণ্যধামে,
কাহারে করিছ দয়া? আছ কোন নামে?
আর কি তোমারে মাগো! উজল নয়নে,
হেরিবে না ভক্তিভরে পুত্রকন্যাগণে?
মা তোমার জন্মভূমি ইঙ্গোরঙ্গ ভূমি,
সেই ভূমি পরিহরি গিয়াছ মা তুমি!!
সেখানেও উঠিয়াছে শোকের উচ্ছ্বাস;
তবু তথা শতমুখে অট্টঅট্টহাস॥
একদিকে নিরানন্দ বিয়োগে তোমার,
অন্য দিকে বহিতেছে হর্ষ অশ্রুধার॥
মা তোমার সুখাসন রত্নসিংহাসনে,
বসিবে নব ভূপতি মুকুট ভূষণে॥

সে আনন্দে প্রজাবৃন্দ ভাসিছে উল্লাসে,
সুখদুঃখ একসঙ্গে খেলে মর্ত্তবাসে ॥
প্রবাদ কথার ছলে বলে বঙ্গবাসী,
একচক্ষে কান্না আর অন্য চক্ষে হাসি ॥
তাই ঘটিতেছে মাগো স্বদেশে তোমার,
এদেশে মা ভিক্টোরিয়া !　শুধু হাহাকার !!
লঙ্ঘিয়া ভারতবর্ষ তরিয়া সাগর,
রাজত্ব করেছ সুখে ত্রি-ষষ্ঠি বৎসর ॥
করুণার সিন্ধু তুমি তব করুণায়,
জুড়ায়েছে প্রজাপুঞ্জ শীতল ছায়ায় ॥
সে করুণা হারা হ'য়ে হারায়ে সে ছায়া,
ধরিছে ভারতবাসী শুধু মাত্র কায়া ॥
নিরপেক্ষ রাজনীতি করিয়া প্রচার,
ঘুচায়েছ সর্ব্ব দুঃখ সমস্ত প্রজার ॥
সবারে সমান দয়া, সমান বিচার,
বিতরণ করিয়াছ, লয়ে রাজ্যভার ॥
শ্বেত কৃষ্ণ বর্ণভেদ ছিল না তোমার ।
সমনেত্রে চাহিয়াছ বদন সবার ॥
সর্ব্ব প্রজা সুখে থাকে করে সদাচার,
সকলে পালন করে ধর্ম্ম আপনার ॥
এই স্বাধীনতা মাগো !　দিয়াছিলে সবে ।
জানিনা মা ভবিষ্যতে কিবা দশা হবে ॥
কে আর লইবে কোলে সন্তান বলিয়ে !
কে মুছাবে অশ্রুধারা স্নেহাঞ্চল দিয়ে !!
কে আর করিবে দয়া হেরি অসময় !
ভয় পেলে কেবা আর দিবে মা অভয় !
কে আর বিপদে ত্রাণ করিবে সন্তানে !
কে আর প্রবোধ দিবে শুভ আশা দানে !
অন্নকষ্ট মহামারী বিদ্রোহ দুর্ব্বার ।

দৈব বিপদের সঙ্গে করেছ সংগ্রাম।
তাই এত প্রিয় মাগো ভিক্টোরিয়া নাম॥
এখন অকূলে ভাসে তব পুত্রগণ,
কে বারিবে মহারাণি! তাদের ক্রন্দন!
সর্ব্বগুণে গুণবতী ছিলে রাজেশ্বরী।
নাম স্মরি পাদপদ্মে নমস্কার করি॥
বর্ষকাল পূর্ব্ব হতে কত অমঙ্গল,
কাঁপাইয়া দিয়াছিল মেদিনীমণ্ডল॥
ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, নিত্য মারীভয়,
ঘন ঘন মহাযুদ্ধ বহুপ্রাণি ক্ষয়॥
গ্রহগতি ভিন্নাকার, সঘনে গ্রহণ,
ঘটেছিল ধরাধামে কত কুলক্ষণ॥
এবারে বসন্তে শীতে অকাল বাদল,
ভয়ে ভয়ে গণিয়াছি বহু অমঙ্গল॥
সেই অমঙ্গল ফলে এবে অকস্মাৎ,
ভারতের শিরে যেন ভীম বজ্রাঘাত!!
উনবিংশ শত এক যৈশব বৎসরে,
দ্বাবিংশতি জানুয়ারি মঙ্গল বাসরে।
পালালে মা মহালক্ষ্মী তেজিয়া সংসার,
চিরদিনে পুন ফিরে আসিবে না আর!!
সবে কয়, সবে দেখে, ভারত ভিতর,
মকরে প্রখর হন দেব প্রভাকর॥
কিন্তু মা যেদিনে তুমি মুদিলে নয়ন,
সেদিনে ভারতসূর্য্য নিষ্প্রভ বরণ॥
সেদিনেও মকরের তরুণ যৌবন,
তথাপি মলিন ছিল রবির কিরণ॥
ছিলে মা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী নারীমূর্ত্তি ধরি,
মহারাণী মহালক্ষ্মী ভারত-ঈশ্বরী॥
লক্ষ্মীহারা হইলাম তোমার বিহনে,

সসাগরা রাজলক্ষ্মী সমান তোমার,
এ জগতে ভিক্টোরিয়া কেহ নাহি আর !!
অনিবার বারিধারা ঝরিছে নয়নে,
জ্যোতির্ম্ময়ী স্বর্ণ-কান্তি সদা পড়ে মনে ॥
ধরণীতে হাহাকার তাই শুধু নয়,
স্বর্গ মর্ত্ত সমভাব হেরি সমুদয়॥
আকাশে চাহিয়া দেখি আকুল লোচনে,
ঘুরিছে নক্ষত্র পুঞ্জ সন্ সন্ সনে ॥
গ্রহগাত্রে গ্রহ ঠেকি হয় চুরমার,
চন্দ্র সূর্য্য ঘোরে যেন ভব চক্রাকার ॥
রক্ত বর্ণ উল্কা যেন পড়িছে খসিয়া,
ভাস্মতে নিখিল বিশ্ব বহ্নি বিকাশিয়া।
অক্ষ লঙ্ঘি ঘনে যেন ঘুরিছে মেদিনী,
আকাশে উঠিছে যেন তোয়—তরঙ্গিণী ॥
তোমারে হরিয়ে কাল, নিঠুর করাল,
ঘটাইছে ধরণীতে বিষম জঞ্জাল।
কি হবে মা মহারাজ্ঞি ! হেন অলক্ষণে,
আর তুমি দেখিবে না করুণ নয়নে !!
সব যেন যায় যায় হেন শঙ্কা হয়,
শঙ্কা হয় ভবে যেন ঘটিছে প্রলয় !!
ভীষণ প্রলয় কাণ্ড ভীষণ আঁধার,
এ মহা প্রলয় তুমি হেরিবে না আর।
কোটি কোটি সুত সুতা শোকাচ্ছন্ন হয়ে,
কি হবে কি হবে ভেবে কাঁপিতেছে ভয়ে !
স্বর্গধামে পশিয়াছ স্বর্গনিবাসিনী,
সুখে থাক স্বর্গরাজ্যে রাজ্যবিলাসিনী !
তোমার পবিত্র আত্মা পবিত্র নয়নে,
চাহিবে মর্ত্তের পানে আশা আছে মনে ॥
পুত্র পৌত্র পরিজন অমাত্যবান্ধব,

রেখ মা করুণা দৃষ্টি ভারতের প্রতি,
স্বর্গ হতে বর্ষে যেন তব কৃপাজ্যোতি।
কাঁদিব মা তবশোকে জীব যতদিন,
দেব জ্যোতি অশ্রুধারা মুছাইয়া দিন!
এই নিবেদন মাগো উদ্দেশে তোমার,
উদ্দেশে শ্রীপাদপদ্মে করি নমস্কার!!

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মুক্তি।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

যাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য আছে, ঐহিক দুঃখ নিবারণের কোন অসম্ভাবনাই নাই, তথাপি তাঁহার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির আশা প্রবল বেগে প্রধাবিত হইয়া, ধর্ম্মসেতু পর্য্যন্ত ভগ্ন করিবার উপক্রম করে কেন? কেবল আনন্দের জন্য। সর্ব্বসম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াও যৎসামান্য একটী উপাধির আশায় প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে উদ্যত হয় কেন? কেবল আনন্দের জন্য। দরিদ্রের ধনী হইতে ইচ্ছা হয়, ধনীর রাজা হইতে ইচ্ছা হয়, রাজার চক্রবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা হয় কেন? কেবল আনন্দ লিপ্সার প্রবল প্রবর্ত্তনায়। ফলতঃ আনন্দ লিপ্সাই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু জীব অবিদ্যার কপট প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া অযথাস্থানে আনন্দের অনুসন্ধান করে, সুতরাং কৃতকার্য্য হইতে পারে না। যাহা ত্যাগ করিলে আনন্দ হয়, তাহা ভোগ করিয়া আনন্দলাভ করিতে চাহে সুতরাং বিপরীত ফল হইয়া থাকে। ভোগানন্দ ও ত্যাগানন্দে অনেক বৈলক্ষণ্য। ভোগ সময়েই ভোগানন্দের অনুভব হইয়া থাকে, ত্যাগানন্দ আজীবনস্থায়ী। এই দক্ষিণ আফ্রিকার তুমুল সংগ্রামে অসংখ্য মনুষ্যের জীবননাশ করিয়া, অসংখ্য অনাথাকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া ও অসংখ্য শিশুসন্তানকে পথের ভিখারী করিয়া বিজয়ীবৃন্দের যে আনন্দ হইল, ইহা কি চিরকাল থাকিবে? কখনই না। কিন্তু যিনি কতকগুলি নিকৃষ্ট পশুজাতির জীবননাশের উপক্রম দেখিয়া তৎপরিবর্ত্তে আপন অমূল্য জীবন অর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আজি যদি সেই পবিত্র কীর্ত্তি বুদ্ধদেব জীবিত থাকিতেন, তাহা

হইলে এখনও তাঁহার হৃদয়ে সেই পবিত্র আনন্দ পরিপূর্ণ থাকিত সন্দেহ নাই। যিনি কখনও আপন মুখের গ্রাস ক্ষুধাতুর দরিদ্র বালককে অর্পণ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, ভোগানন্দ ও ত্যাগানন্দের বৈলক্ষণ্য কি? যিনি কখনও আপন প্রাণের উপর উপেক্ষা করিয়া পদ্মানদীর প্রবল প্রবাহে নিমগ্নপ্রায় ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই জানেন, ভোগানন্দ ও ত্যাগানন্দের বিভিন্নতা কিরূপ? অধিক কি, যিনি কখনও ক্ষণকালের জন্য সংসারের সকল বিষয় বিস্মৃত হইয়া একাগ্রচিত্তে হরিগুণগান শ্রবণ বা কীর্ত্তন অথবা স্মরণ করিয়াছেন, ভোগানন্দের ও ত্যাগানন্দের আকাশ-পাতাল-বিভিন্নতা তিনিই বুঝিয়াছেন। ফলতঃ সংসার সম্বন্ধ অপসারিত হইলেই যে এক অপূর্ব্ব অপ্রাবৃত্ত আনন্দের আস্বাদন হইয়া থাকে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই প্রত্যক্ষ বিষয়। ঐরূপ সর্ব্ববাসনাবিহীন অন্তঃকরণে যে এক অপূর্ব্ব বিমলানন্দের অনুভব হয়, তাহাই মোক্ষানন্দের আভাস; উহা দ্বারাই মুক্তির আনন্দরূপতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। অতএব যখন নিখিল বাসনা ত্যাগ করিলেই প্রকৃত আনন্দ অনুভূত হয়, তখন জীব যে আনন্দ স্বরূপ তাহাতে আর অনুমাত্র সংশয় হইতে পারে না। সেই স্বরূপানন্দের আবরণেই দুঃখ এবং ঐ আবরণ উন্মোচনেই পরমানন্দ অর্থাৎ মুক্তি। যদি কোনও ব্যক্তি একটী পথভ্রষ্ট শিশুকে আপন গৃহে আনিয়া পরম যত্নের সহিত প্রতিপালন করে, তথাপি ঐ শিশু আপন জননীর অমৃতময় অঙ্কে উপবেশন করিতে না পাইয়া কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারে না এবং তাহার জননীর ক্রোড়ে উপনীত হইলেই অপার আনন্দ আস্বাদন করিতে থাকে, সেইরূপ পথভ্রষ্ট জীবও যতই সাংসারিক সুখ-ভোগে কালাতিপাত করুক, যতদিন আপন মূলস্বরূপ ব্রহ্মানন্দে অবগাহন করিতে না পারিবে, ততদিন কোনরূপেই সুখী হইতে সমর্থ হইবে না। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যের ফলে সেই আনন্দময়ীর অনন্দময় ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করিবে, সেইদিন বিমলানন্দ আস্বাদনে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

অতঃপর ইহাও চিন্তাশীলের চিন্তা করিবার বিষয় যে, যদি মুক্তাবস্থায় আনন্দের আশা না থাকিবে, তবে চতুর্বর্গের মধ্যে মুক্তিকেই সর্ব্বোচ্চ আসনে উপবেশন করাইবার কোনও কারণ নাই। আর ঐরূপ নীরস

শ্লোকাত্মক মহাভারত, চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে সংগ্রথিত রামায়ণ, এতদ্ভিন্ন বহু সংখ্যক তন্ত্র মন্ত্রাদির কিছুই প্রয়োজন ছিল না। কেন না, আনন্দই জীবের স্বরূপ এবং আনন্দলিপ্সাই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সুতরাং যাহাতে আনন্দ নাই, অর্থ-সাধ্য ও আয়াস-সাধ্য না হইলেও তাহাতে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। যখন আনন্দের আশা না থাকিলে মনুষ্য একটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যৎকিঞ্চিৎ চালনা করিতেও অভিলাষী নহে, তখন আনন্দহীন মোক্ষের সাধনমার্গের সুদারুণ কঠোরতা সহ্য করিতে কাহারও অভিলাষ হইতে পারে, এমন বোধ হয় না। যাহাতে একবারেই কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে উপদেশ দেওয়াও উপযুক্ত নহে, সুতরাং আর্য্যশাস্ত্রকারদিগের সাধনসম্বন্ধীয় উপদেশ সমূহও অনর্থক হইয়া পড়িল।

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ অনুক্ষণ জীবকে আক্রমণ করিতেছে। জীব প্রতিনিয়তই দুঃখভোগ করিতেছে, তথাপি মৃত্যু অভিলাষ করে না। আপন আপন অবস্থোচিত যৎকিঞ্চিৎ আনন্দের আশাই জীবনের অবলম্বন। অত্যন্ত হীনাবস্থ ও উৎকট রোগগ্রস্ত ব্যক্তিও সহজে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে চাহে না। অন্য কোন প্রকার সুখের সম্ভাবনা না থাকিলেও অন্ততঃ দেখিয়া শুনিয়া যে আনন্দ হয়, তাহারই অনুরোধে অবাহ্য দুঃখভারও কথঞ্চিৎ বহন করিয়া থাকে। সাংসারিক যন্ত্রণার আধিক্য বশতঃ অনেকে মৃত্যু কামনাও করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা মৌখিক বাক্য মাত্র, আন্তরিক অভিলাষ নহে। তবে যে সহস্রাধিক ব্যক্তির মধ্যে কোনও একজন কোথাও কখনও প্রাণত্যাগ করে, তাহা বিচারস্থানে প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করা যায় না; কেন না, যাহা স্বাভাবিক ও সাধারণ, তাহাই প্রমাণ, আর যাহা অস্বাভাবিক ও অসাধারণ, তাহা প্রমাণ বলিয়া কোনও বুদ্ধিমান্ গ্রহণ করেন না। এক্ষণে ইহা অনেকাংশে প্রতিপন্ন হইল যে, আনন্দলিপ্সা এতই বলবতী, যৎকিঞ্চিৎ আনন্দের প্রত্যাশা থাকিলে অসহ্য যন্ত্রণাও সহ্য করিতে কেহই পরাঙ্মুখ নহে। সেই আনন্দের গন্ধও যাহাতে নাই, এরূপ মুক্তির প্রয়োজন অতি অল্পই বোধ হয়। আবার গৌতমী ও কাপাদী মুক্তির কথা শুনিলে প্রয়োজনের প্রসঙ্গদূরে থাকুক, ভয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তাঁহাদের

জন নাই। এই দুঃখ-সঙ্কুল সংসারের মধ্যেও স্ত্রীপুত্রাদির মুখাবলোকন পূর্ব্বক যে ক্ষণিক সুখাভাসের অনুভব হয়, তাহাকেই পরমানন্দ জ্ঞান করিয়া এক প্রকার সুখে দুঃখে কালাতিপাত করি তাহাও ভাল, তথাপি মুক্তির কথায় কর্ণপাত করিতে অভিলাষ হয় না। অথবা যদি কাষ্ঠ পাষাণাদির ন্যায় জড়ভাবে অবস্থান করিতে হয়, তাহাও মূর্চ্ছা সদৃশী মুক্তি অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। সেই জন্যই কোন মহানুভব ভয়চকিত ভাবে বলিয়াছিলেন,—

"ন চ বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন॥

অর্থাৎ "বৈশেষিক মুক্তির অভিলাষ কখনই করিব না?" যদিও ঐ শ্লোকার্দ্ধ কোনও ব্যক্তি বিশেষের উক্তি, তথাপি মূর্চ্ছাপ্রায় মোক্ষের কথা; কথা শুনিলে বোধ হয় সকলেই একবাক্যে ঐ কথাই বলিবেন। যাঁহারা কোন প্রকার বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ হইয়া প্রকাশ্যভাবে ইহা স্বীকার করিতে না পারিবেন, তাঁহাদের হৃদয়ের সহিত বাক্‌শক্তির বিরোধ উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, অসাধারণ প্রতিভাশালী ঐ ঋষিদ্বয়ের সুবিমল মস্তিষ্ক এরূপ বেদবিরুদ্ধ অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইল কেন, তাহা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রচেতার চিন্তাতীত। পশ্বাদি ইতর জীব অপেক্ষা মনুষ্যত্ব অধিকতর আনন্দকর, সামান্য মনুষ্যত্ব অপেক্ষা রাজত্ব এবং রাজত্ব অপেক্ষা সাম্রাজ্য অধিকতর আনন্দের বস্তু, ইহাই আমাদের সাধারণ ধারণা ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। আবার আর্য্য শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখি, সাম্রাজ্য অপেক্ষা দেবত্ব, দেবত্ব অপেক্ষা ইন্দ্রত্ব এবং ইন্দ্রত্ব অপেক্ষা ব্রহ্মত্বই অধিকতর আনন্দজনক। শাস্ত্রকারগণ এইরূপ আনন্দকর ব্রহ্মলোকেরও মস্তকোপরি মোক্ষপদ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সেই মোক্ষপদ যে একপ্রকার মূর্চ্ছার সদৃশ হইবে, ইহা স্বীকার করিয়া, মহর্ষি গৌতম ও কণাদের সম্মান রক্ষা করিতে আমার মন মুখ উভয়েই অসম্মত। কাহারও পক্ষপাতী হইয়া কোন প্রবন্ধের অবতারণা করা উপযুক্ত নহে। সকলের অভিপ্রায় সমালোচনা করিয়া যাহা সুসঙ্গত বোধ হয়, তাহাই অকপটে প্রকাশ করা প্রবন্ধ লেখকের কর্ত্তব্য। আমি এই সামান্য বুদ্ধিতে অসাধারণ বিষয় আলোচনা করিয়া ইহাই উপলব্ধি করিয়াছি যে, মৃত্যুর পরে যদি দৈহিক কোনও চিদংশের অস্তিত্ব থাকে এবং সেই চিদংশের মুক্তি বলিয়া কোনও চরমাবস্থা স্বীকার করিতে হয়, তবে সেই অবস্থা পরম শান্তি ও পরমা-

গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(ছাই-খেংগো ক্রোরীয়ান্)

যখন প্রবল পরাক্রান্ত মুসলমান সম্রাট্ আওরঙ্গজেব, দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া এই বিশাল ভারতসাম্রাজ্য শাসন করিতেছিলেন; যখন (১৬৬৮ খৃঃ) দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের স্থাপয়িতা প্রাতঃস্মরণীয় হিন্দুর প্রলুপ্ত-গৌরবের পুনরুদ্ধারকারী হিন্দুকুলচূড়ামণি মহারাজ শিবাজী, হিন্দু-স্বাধীনতার পুনঃ সংস্থাপন-বাসনায় বিপুল অশ্বসেনার অধিনায়ক হইয়া রায়গড়ে দুর্গ নির্ম্মাণ পুরঃসর বদ্ধ-পরিকর হইতেছিলেন; যখন (১৬৬৪ খৃঃ) সুদক্ষ নবাব সায়েস্তা খাঁ, বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন; যখন ফরাসী ও দিনেমার, ওলন্দাজ, পর্ত্তুগিজ ও ইংরাজ প্রভৃতি য়ুরোপীয় বণিকেরা, পরস্পর প্রতিযোগিতা পূর্ব্বক বাঙ্গালার নানাস্থানে বাণিজ্য করিতেছিলেন; প্রায় সেই সময় সুবিখ্যাত নবদ্বীপের অগ্নিকোণে পূর্ব্বস্থলী (১) নামক গ্রামে একজন প্রধান বাঙ্গালীর উদ্ভব হয়। তাঁহারই নাম "গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।"

বঙ্গদেশের বিষয়, যতই আলোচনা করা যায়, ততই অবসন্নমতি হইতে হয়। অধুনাতন সময়ের বঙ্গবাসিগণ আপনাদিগকে চৌকস্, চতুর ও কাজের লোক বলিয়া মনে মনে কতই সন্তুষ্ট হন। তাঁহার লোকের নিকট অহঙ্কার প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করেন না। কিন্তু তাঁহারা দেখেন না—তাঁহাদের দেশের প্রকৃত ইতিবৃত্ত, রচিত হয় নাই। যে জাতির ইতিহাস নাই, সে জাতির আছে কি? সভ্য জাতিরা আমাদিগকে মানুষই জ্ঞান করেন না। এই জন্যই বর্ত্তমান সুসভ্য রাজপুরুষগণের নিকট এই বাঙ্গালী জাতির তাদৃশ আদর, কোথায় বল! যদি বঙ্গদেশের পূর্ব্বতন অবস্থার একখানিও প্রকৃত পুরাবৃত্ত থাকিত, যদি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জীবনবৃত্তান্ত থাকিত, যদি পূর্ব্বতন সামাজিক আচার-ব্যবহার-বিষয়ক গ্রন্থাদি থাকিত, তাহা হইলে, আমাদিগকে পদ্মা ও ভাগীরথীর অন্তর্গত আধুনিক চর-বাসী বনবাসী বলিয়া

---

(১) মতান্তরে 'কামারকুলী' গ্রাম, গোবিন্দচন্দ্রের জন্মভূমি কিন্তু আমরা গবেষণা দ্বারা, গোবিন্দচন্দ্রের বংশ-পরম্পরায় ও প্রাচীন লোকের প্রমুখাৎ শুনিয়া, যত দূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে—নবদ্বীপের উত্তরাংশে বর্ত্তমান বিখ্যাত পূর্ব্বস্থলী নামক গ্রামে তিনি প্রাদুর্ভূত হন।

উপেক্ষিত হইতে হইত কেন? তাহা হইলে আমরা "বড়-ঘরানা" বলিয়া সম্মানিত হইতাম এবং সুসভ্য প্রবল পরাক্রান্ত জাতিগণেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিতাম। উপরি-উক্ত ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত-সম্বন্ধে যে প্রকার গল্প শোনা যায়, বাঙ্গালার ইতিবৃত্ত-গ্রন্থে তাহার গন্ধবাষ্পও নাই বলিলে, অত্যুক্তি হয় কি? যাহাও কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও অত্যল্পমাত্র, ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয় নয়! অথচ তাদৃশ-গুণসম্পন্ন ব্যক্তির তাদৃশ কার্য্যই, ইতিহাসের প্রধান বিষয়। নবাব মুর্সিদ্ কুলি খাঁর ও জাফর খাঁর সময়ে, নাজির আহাম্মদ, সইয়াদ্ রেজা খাঁ, সৈয়দ্ খাঁ, একরাম খাঁ প্রভৃতি মুসলমান রাজপুরুষেরা, বাঙ্গালার রাজত্ব-সম্বন্ধে যে কার্য্য করিতেন, একজন বাঙ্গালীও (২) আপন সন্তানের সহিত সেই সময়ে বহু বৎসর তাদৃশ কোন কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা আপন অবস্থা, সমুন্নত করিয়া বিবিধ কীর্ত্তি-কলাপ দ্বারা চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। ইতিহাস পাঠ না করিয়া, জনশ্রুতির উপর কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? যে প্রকার শ্রুতিগোচর হয়, তাহাতে উক্ত বাঙ্গালীর পদ, উল্লিখিত মুসলমান রাজপুরুষগণের পদ অপেক্ষাও উচ্চতর ছিল বলিয়া বর্ত্তমান প্রাচীন লোকদিগের দৃঢ়বিশ্বাস। হয়, গোবিন্দচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত-সম্বন্ধে বঙ্গদেশীয় ও প্রাচীন লোকের জনশ্রুতি মিথ্যা বলিতে হইবে—না হয়, মুসলমান-রাজত্বের মুসলমান-ইতিহাসলেখক, ইতিহাস হইতে বাঙ্গালীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। এই উভয় তর্কের মধ্যবর্ত্তী হইয়া, স্থির সিদ্ধান্ত করিলে, প্রতীতি জন্মিবে—গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর যাদৃশ উচ্চ পদের গল্প শোনা যায়, বোধ হয়, তাদৃশ প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন

---

(২) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ সঙ্কলিত 'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাসের' ৩৮ পৃষ্ঠায় 'মুকুট রায়ের' নাম-মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—"যে সময়ে পর্ত্তুগিজদিগের প্রভাব-বিলয় হয়, যে সময়ে সাহাজান সম্রাট হইয়াছিলেন (১৬২৮ খৃঃ); যে সময়ে সম্রাট, ইস্‌লাম খাঁ মাশহাদিকে বেহারের সুবাদার নিযুক্ত করেন (১৬৩৭ খৃঃ), তাহার অল্পকাল মধ্যে (১৬৩৮ খৃঃ) চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা মুকুটরায় আরাকাণরাজের অধীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্ব মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন।" এই 'মুকুট রায়'

পদ, তাঁহার হয় নাই। ফলতঃ, যেমন শ্রুত হওয়া যায়, সেরূপ না হইলেও, যখন ডেপুটী গবর্ণর রাজা রাজবল্লভ, পেস্কর দর্পনারায়ণ প্রভৃতি এদেশীয়-গণের নাম, ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, তখন বাঙ্গালা বিহার, উড়িষ্যার "ক্রোরীয়ান্" বলিয়া খ্যাত, গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বিষয়, বাঙ্গালার ইতিহাসে বিবৃত হওয়া, নিতান্তই উচিত ছিল, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ কৈ? দ্বিতীয় টীকায় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' হইতে যে বৃত্তান্ত, সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা, গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিজের বৃত্তান্ত নহে। তাহা, তাঁহার পুত্রের (৩)। যাহা হউক, যখন গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে কোন বিষয়, বাঙ্গালার ইতিহাস-গ্রন্থে কোনও লিপিবদ্ধ প্রমাণ নাই—তখন কেবল জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই, গোবিন্দচন্দ্রের চরিত্র-সম্বন্ধিনী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল।

নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে বর্ত্তমানে বিখ্যাত "পূর্ব্বস্থলীতে" (কোন কোন গ্রন্থকর্ত্তা বলেন, 'কামারকুলিতে' বা 'কুমারখুলিতে'—কিন্তু বাস্তব পক্ষে যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, বর্ত্তমান পূর্ব্বস্থলীতেই) গোবিন্দচন্দ্রের জীবন-সাগরের সমুদয় তরঙ্গ, দেখা দিয়াছিল। এক ঘর দুঃখী বৈদিক ব্রাহ্মণের তথায় নামে মাত্র বাস ছিল। সাধ্বী স্ত্রী এবং ৭।৮ (সাত বা আট) বৎসর-বয়স্ক একমাত্র পুত্র লইয়া ব্রাহ্মণ, অতীব কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। বালকটী, বাল্যকালে বিলক্ষণ দুষ্টস্বভাব-সম্পন্ন ছিল। এক দিন প্রতিবেশী বালকগণ ও আমাদের বর্ণনার বিষয়ীভূত উক্ত বালক, একত্র খেলা করিতেছিল। কে, কি দিয়া, ভাত খাইয়াছে, কথাপ্রসঙ্গে সেই কথা উঠিল। সকলের কথা, ফুরাইয়া গেলে, এক বালক, কথায় কথায় কহিল—"মা, যেরূপ লাউ-চিঙ্ড়ি রাঁধিয়াছিলেন, তোমরা কেহই, সেরূপ খাও নাই।" বর্ণিত বালক, গৃহে আসিয়া মাতার নিকট লাউ-চিঙ্ড়ি খাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিল। মাতার হাতে এক কপর্দ্দকও মাত্র নাই যে, তদ্দ্বারা মৎস্য ক্রয় করেন। এ দিকে বালকের ভয়ঙ্কর আব্দার! সেই সময়ে হঠাৎ একজন মৎস্য-বিক্রয়িণী, গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। জননী, উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, সাড়ে পাঁচ গণ্ডা কড়ির

(৩) 'গোবিন্দচন্দ্র'-নন্দন "মুকুট রায়ের" নিকট যথাসময়ে সমুপস্থিত

(৪) দামে ধারে মৎস্য ক্রয় করিলেন এবং মেছুনীকে বলিয়া দিলেন, "বাছা, ফিরিয়া যাইবার সময় কড়ি লইয়া যাইও।" লাউ-চিঙ্ড়ির আয়োজন হইল দেখিয়া, গোবিন্দের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তখন খেলিতে বাহির হইলেন। জননী, পাক প্রস্তুত করিতে গমন করিলেন। মধ্যাহ্ন-কাল উপস্থিত। মৎস্যজীবিনী, পাড়ায় পাড়ায় মৎস্য বিক্রয় করিয়া, গোবিন্দ-জননীর নিকটে আসিয়া, বিক্রীত মৎস্যের মূল্য চাহিল। গোবিন্দের মাতা, তখন মূল্য-প্রদানে অসমর্থ। তিনি বলিলেন—"বাছা, এখন এক কড়া কড়িও, আমার হাতে নাই। আর একদিন আসিয়া লইও। আজ এস।" ইহাতে মৎস্যজীবিনী, অসন্তুষ্ট হইয়া যার পর নাই, নানাপ্রকার কূট কটূতর অকথ্য ভাষায় গোবিন্দের জননীকে লক্ষ্য করিয়া গালি দিল। কেহ কেহ বলেন—সে, রন্ধন-করা মাছগুলি, তরকারি হইতে বাছাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে মৎস্যজীবিনী, তাহাই করিয়াছিল। গোবিন্দের পিতা, এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া, বিলক্ষণ বিরক্ত হইলেন। পুত্রের জন্য ছোট লোকের গালি খাইতে হইল বলিয়া, স্ত্রীর সম্মুখে পুত্রোদ্দেশে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। ইতোমধ্যে গোবিন্দ, গৃহে আসিয়া আহার করিতে বসিল। গোবিন্দ, মাছের তরকারিতে মাছ না পাইয়া, নিজ-জননীকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা! মাছ কৈ?" জননী, ক্রন্দন করিতে করিতে, মেছুনীর বৃত্তান্ত, আদ্যোপান্ত গোবিন্দকে বলিলেন। কেহ কেহ কহেন, কর্ত্তার আদেশে গোবিন্দকে ছাই খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল। অদ্যাবধি পূর্ব্বস্থলীর আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই, "ছাই-খেগো চক্রবর্ত্তী" বলিয়া, গোবিন্দের জীবনবৃত্তান্তের অবতারণা করিয়া থাকে। ইহা, প্রকৃত না হইলে, পূর্ব্বস্থলীর লোকে, কেন তাঁহাকে "ছাই-খেগো গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী" বলিবে? ঘটনা, যাহাই হউক. ফলতঃ দারিদ্র্য-নিবন্ধন এই ব্যাপারোপলক্ষ্যে গোবিন্দের মনে একটি নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। ভোজন হইতে বিরত হইয়া, সেই আট বৎসর বয়স্ক বালক গোবিন্দ বলিলেন—"মা! আমার নিমিত্ত ভাবিও না। যদি টাকা উপার্জ্জন করিতে পারি, তবে আবার ঘরে ফিরিয়া আসিব। নতুবা এই জন্মের মত শেষ বিদায়

---

(৪) পূর্ব্বস্থলীতে অদ্যাপি কড়ি প্রচলিত আছে। তথায় এক পয়সায়

লইলাম”। এই কথা বলিয়া পিতৃ-মাতৃ-চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক গাত্রমার্জ্জনী (গামছা) গোবিন্দচন্দ্র, স্কন্ধে করিয়া, বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

কোথায় যাইবেন, কি ই বা করিবেন, তদ্বিষয়ে গোবিন্দের লক্ষ্য স্থির ছিল না। ভ্রমণ করিতে করিতে, তিনি, ভাগীরথী-তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটী তাল-তরুর কুলায়ে পাখীর বাচ্ছা হইয়াছে। পক্ষি-শাবক-গ্রহণে লোলুপ হইয়া, তিনি, বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। পাখীর বাসায় যেমন হস্ত-প্রসারণে উদ্যত হইয়াছেন, অমনই এক ভয়ঙ্কর বিষধর, তন্মধ্য হইতে অর্দ্ধ-নিষ্ক্রান্ত হইয়া, দংশনোন্মুখ হইল। এমন অবস্থায় ভয়ে অভিভূত হইয়া, শাখা হইতে পড়িয়া যাওয়াই সম্ভব। কিন্তু গোবিন্দ, তৎক্ষণাৎ উপস্থিত বুদ্ধিবলে এরূপে বিষধরের গলা টিপিয়া ধরিলেন যে, সে, আর দংশন করিতে পারিল না। সর্প, দংশনে অক্ষম হইল বটে, কিন্তু লাঙ্গুল দ্বারা তাঁহার অঙ্গুলি দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিল। গলা ছাড়িয়া দিলে, সর্পে, দংশন করিবে। সুতরাং এক হস্তের আনুকূল্যে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করাও, নিতান্ত সুকঠিন। প্রস্তুতবুদ্ধি বালক, আপনাকে এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া, তদ্দণ্ডেই একটী সদুপায়ের উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিলেন। যে ক্ষমতা, নিরাশ্রয় দুঃখী বালককে ভবিষ্যতে সম্ভ্রমসূচক গুরু-ভার-বহ রাজকীয় পদে উন্নত করিয়াছিল—পাঠকগণ, তালী-তরুর শিখরদেশে নাগ-পাশ-বদ্ধ সেই বালকের নবীন জীবনে ঐ দিন সেই সামর্থ্যের অঙ্কুর দেখিতে পাইলেন।

গোবিন্দচন্দ্র, অসাধারণ-প্রত্যুৎপন্নমতি-প্রভাবের বলে অপর হস্ত দ্বারা সর্পের লাঙ্গুলের অগ্র ভাগ ধরিয়া খোলেন,—আর তালের বাখ্‌ড়ার সুতীক্ষ্ণ অগ্র ভাগ দ্বারা সর্পকে ছিন্ন করিয়া, ভূতলে নিক্ষেপ করিতে থাকেন। সেই সময়ে এক জন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, যদৃচ্ছা-ক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জনশ্রুতি এই—তিনি তৎকালে নির্দ্দিষ্ট-গুণবিশিষ্ট একটী শিষ্যের অন্বেষণ করিতেছিলেন। সহসা তালবৃক্ষোপরি বালকের দিকে দৃষ্টিসংযোগ হওয়ায়, তিনি অদ্ভুত নাট্যের অভিনয় দেখিলেন। তিনি বৃক্ষারূঢ় বালকের অসাধারণ প্রত্যুৎপন্ন মতি ও অতি-সাহস দেখিয়া, মনে মনে স্থির করিলেন, সেই বালকই, তাঁহার যোগ্য শিষ্য হইবে। কিয়ৎ ক্ষণের মধ্যেই বালক, আরব্ধ কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া গাছ হইতে নামিলেন। সন্ন্যাসী, তাঁহার ভাল করিবার আশা দিয়া, সঙ্গে

বাচ্ছা দিতে পারেন, তবেই আমি আপনার সঙ্গী হই।" সন্ন্যাসী, পক্ষি-শাবকের প্রলোভন দেখাইয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। সন্ন্যাসী, তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়া মন্ত্রসিদ্ধির উপায় বলিয়া দিলেন এবং কহিলেন—"গোবিন্দ! ভবিষ্যতে তুমি বড়লোক হইবে; কিন্তু অস্ত্রাঘাতে তোমার মৃত্যু হইবে। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী, সম্পূর্ণ-রূপে ফলবতী হইয়াছিল। অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া, গোবিন্দ, পরিব্রাজকের সহিত শেষে দিল্লী গমন করেন।

কিংবদন্তী আছে, সন্ন্যাসীর বরে সামান্য যত্নে আরব্য ও পারস্য ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন, এ কথা এক সত্য। অন্য দিকে বিনা যত্নে ও বিনা অধ্যবসায়ের সাহায্যে বিদ্যাভ্যাস হয় না, এটীও দ্বিতীয় সত্য। অতএব এমন স্থলে উপরি-উক্ত জনশ্রুতি, সত্য বা মিথ্যা বলিয়া বোধ করা যাইতে পারে। অনুমানে ইহাই, প্রতীত হয়—হয়, প্রোক্ত দুই ভাষায় সন্ন্যাসীর জ্ঞান ছিল, তাই তিনি স্বয়ংই, গোবিন্দকে শিক্ষা দেন। না হয়, দিল্লীতে তাঁহার তৎকাল-প্রচলিত বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। স্বল্প সময়ে ও স্বল্প শ্রমে অসাধারণ অধ্যবসায়, স্বাবলম্বন ও অত্যাশ্চর্য্য স্মরণশক্তির বলে তাদৃশ বিদ্যা-ধন-উপার্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই, লোকে কহে—"বিনা ব্যয়ে, বিনা যত্নে সন্ন্যাসীর বরে তিনি বিদ্বান্ হইয়াছিলেন।"

ফলতঃ, এতাদৃশ-প্রতিভা-সম্পন্ন বালকের শিক্ষা-গ্রহণ বিষয়ে অনেক কৌতুক ও আমোদজনক উপদেশ পাইবার আশা করা যাইতে পারে; কিন্তু এ-দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সবিশেষ বিবরণ কিছুই সংগ্রহ করা যায় না। গোবিন্দ, বাল-স্বভাব-সুলভ চপলতার বশীভূত হইয়া, আরবীর সুললিত যে কবিতা, মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে করিতে, দিল্লীর রাজপথ দিয়া পদব্রজে করিতেছিলেন, তাহা, তৎকালীন সম্রাটের "রায় দাঁইয়ার" (দেওয়ানের) কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, বালককে নিকটে আহ্বান করেন। দেওয়ান, গঠন-সৌন্দর্য্যে ও মুখশ্রীতে অসাধারণ মতি-মত্তার লক্ষণ-দর্শনে গোবিন্দকে বড়ই ভালবাসিলেন; আশ্রয় দান করিয়া, তাঁহার উন্নতি-সংসাধন-সংকল্পে সবিশেষ মনোযোগী হইলেন। তিনি দেওয়ানের অনুগ্রহে বহুদিন সেইস্থানে থাকিয়া, বহুবিধ বিষয়-কার্য্য শিখিয়া কাজকর্ম্ম করেন। শেষে যে কার্য্য করিয়া, তাঁহার প্রচুর সম্পত্তি ও দেশাবচ্ছিন্ন খ্যাত লাভ হয়,

অনুকম্পায় ক্রমান্বয়ে অনেক রাজকর্ম্মে নিয়োজিত হন। দেওয়ান, অপাত্রে অনুগ্রহ বিতরণ করিতে পারেন কি? গোবিন্দের অসাধারণ গুণ ও সমুদয় কার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শিতা-দর্শনে তিনি মোহিত হইয়া, তাঁহার প্রতি দয়া করিতে বাধ্য হন। নিজের একটু মনুষ্যত্ব না থাকিলে, কেবল পরানুকূল্যেই, কাহারও কখন কি প্রকৃত বড়লোক হওয়া সম্ভাবিত? অনেকে, সহায় নাই বলিয়া, আক্ষেপ করেন; কিন্তু অকারণ সহায়, অতি অল্পলোকেরই থাকে। যাহা হউক, গোবিন্দ, ক্রমে সম্রাটের শ্রুতিগোচর হইলেন। এই ঘটনাতেই, তাঁহার গুণ ও ক্ষমতার পর্য্যাপ্ত পুরস্কার হইল। কার্য্য ও কারণ এই উভয়ে, এরূপ অত্যাশ্চর্য্য-সম্বন্ধ-যুক্ত যে, তাহাদের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র বৈষম্য থাকিবার যো নাই। আপাত-দৃষ্টিতে বোধ হইতে পারে, গোবিন্দের যেরূপ যোগাযোগ হইল, যাঁহারই সম্বন্ধে সেরূপ হইবে, তাঁহারই তাদৃশী উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু কার্য্য-কারণের ভাব পর্য্যালোচনা করিলে, বোধ হইবে, যোগাযোগ আপনা হইতে হয় না। এ সংসারে কয় ব্যক্তি, অতুচ্চ তালী-তরু-শিখরে তাদৃশ বিপন্ন হইয়াও, অদ্ভুত ও প্রস্তুত বুদ্ধি-প্রদর্শনে পারগ হয়?

তৎকালীন সম্রাট্, এক সময়ে গোবিন্দকে দেখিতে চাহিলেন। দেওয়ান, সম্রাট্-সাক্ষাৎ-করণোপযোগী আয়োজন করিয়া দিলেন। গোবিন্দ, স্বকীয় বিদ্যা, বুদ্ধি ও কার্য্য-দক্ষতা দর্শাইয়া, সম্রাটের এতাদৃশ স্নেহ ও সন্তোষ আকর্ষণ করিলেন যে, সম্রাট্, তাঁহাকে প্রার্থনার অধিক পুরস্কার-প্রদানে বাধ্য হইলেন। বাদশা, "বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা" এই তিনটী শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক পদ-সঞ্চালনে নিকটস্থ তিনটী তাকিয়া স্থান-ভ্রষ্ট করিলেন। গোবিন্দ, ইহার অর্থগ্রহ কিছুই করিতে না পারিয়া, একপ্রকার অসন্তুষ্ট হইয়াই, রাজসভা হইতে বিদায় হইলেন। গোবিন্দচন্দ্র, রাজসভা হইতে প্রত্যাগত হইয়া, দেওয়ান-জীকে কহিলেন,—"মহাশয়! এমন বাতুল সম্রাটের নিকট আমায় পাঠাইয়াছিলেন কেন?

প্রবাদ, প্রচলিত যে, দিল্লীর রাজ-পথে একটি বৃহদাকার প্রস্তর, পতিত ছিল। সেই প্রকাণ্ড প্রস্তরে অস্পষ্ট অক্ষরে পারসী ভাষায় কি একটি কবিতা, বা অন্য কিছু ক্ষোদিত ছিল। তৎকালিক কি হিন্দু, কি মুসলমান—বড় বড় পারসীবিৎ পণ্ডিত কেহই, তাহার অর্থ করিতে সমর্থ হন

প্রস্তর-ক্ষোদিত কবিতা, আর অন্যান্য যাহা কিছু, ক্ষোদিত ছিল, তৎসমুদয়ই—অম্লান বদনে পাঠ করিয়াছিলেন। তাহাতে সম্রাট্, সন্তুষ্ট হইয়া, পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সর্ব্বপ্রধান রাজস্ব-সচিবের পদ সমর্পণ করেন। (৫)

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

শকুন্তলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, "কবিষু কালিদাস শ্রেষ্ঠঃ"। আমরা যে শুধু ঐ কয়েকটী কথা যখন তখন আবৃত্তিমাত্র করিয়া কবিকে সম্মান করিয়া থাকি, তাহা নহে। আমাদের নিকট প্রায় সমুদায় প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের গল্পের নায়ক কালিদাস, কবিত্বপূর্ণ শ্লোক বা হেঁয়ালীর রচয়িতা কালিদাস। আমরা কল্পনায় কালিদাসকে কখনও মূর্খ করি, আবার, কখন বা তাঁহাকে সরস্বতীর বরপুত্র করিয়া তুলি, কখন তাঁহাকে নির্ব্বোধের শেষ করি, আবার কখন বা তাঁহাকে বুদ্ধিমানের চূড়ান্ত করিয়া থাকি। আমাদের যেন বিশ্বাস, এক কালিদাস ভিন্ন ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই। আর কোন দেশের কোন কবির ভাগ্যে এরূপ ঘটিয়াছে কি না শুনি নাই। অথচ আমাদের দেশেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়-দিগের কৃত একটী সমালোচন শ্লোক প্রচলিত আছে; যথা—"কাব্যেষু

---

(৫) আরও প্রবাদ আছে—গোবিন্দচন্দ্র, রাজসভায় সম্রাটের নিকট পারস্য-ভাষায় অদ্বিতীয় বিদ্বান্ প্রতিপন্ন হইলেন। বড় বড় পারসিবিৎ পণ্ডিতেরা, যে সকল লেখা পড়িতে পারেন নাই, সেই সকল লেখা, গোবিন্দ-চন্দ্রের হস্তে দিয়া, বাদশা বলিয়াছিলেন,—"এই লেখার ব্যাখ্যা কর।" গোবিন্দ, অক্লেশে পাঠ করিয়া তাহা সম্রাট্কে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সেই

মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ”। সমালোচক মহাশয় নাটকে ও কাব্যে প্রভেদ করিয়া কাব্যে মাঘকে ও নাটকে কালিদাসকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া অবশেষে কালিদাসেরই জয় গাহিয়াছেন। নাটক রচনা করিয়াই কালিদাস এত সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। "অভিজ্ঞান শকুন্তল" কালিদাস কৃত নাটক দুইখানির মধ্যে উৎকৃষ্টতর। অতএব "অভিজ্ঞান শকুন্তলের" কবি বলিয়া তাঁহার এত আদর। সেই "অভিজ্ঞান শকুন্তলে" কি আছে, আজ আমরা তাহা দেখিব; দেখিব, কিরূপ একখানি নাটক রচনা করিয়া তিনি যাবতীয় কবির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। দেখিব, কেন "কবিষু কালিদাস শ্রেষ্ঠঃ।"

স্বর্গীয় ভূদেববাবু এই শকুন্তলাকে একটী গোলাপ ফুলের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, "ইহার দিগন্তব্যাপী সৌরভে স্ববন্ধু বান্ধবে উল্লাসপূর্ণ হওয়া যায়।" আমরা তাঁহার কথা অনুসরণ করিয়া আজ স্ববন্ধু বান্ধবে সেই তের বৎসর পূর্ব্বে উজ্জয়িনীতে প্রস্ফুটিত চির অম্লান গোলাপটীর দিগন্তব্যাপী সৌরভে উল্লাসপূর্ণ হইতে চেষ্টা করিব।

অভিজ্ঞান শকুন্তলের উপাখ্যান ভাগ কালিদাসের সম্পূর্ণ নিজের নহে। মহাভারতের আদিপর্ব্বে বর্ণিত শকুন্তলা উপাখ্যানটি ইহার মূলভিত্তি। মহাভারতের শকুন্তলা এইরূপ,—"চন্দ্রবংশে দুষ্মন্ত নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার রাজধানী হস্তিনাপুরে। একদিন তিনি মৃগয়া করিতে করিতে হঠাৎ মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে উপনীত হন। সে সময়ে কণ্ব আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার পালিতা-কন্যা শকুন্তলা রাজার অতিথি সৎকার করেন। রাজা শকুন্তলার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, শকুন্তলা সম্মত হইলে গান্ধর্ব্ববিধানে উভয়ের বিবাহ হয়। এখন কণ্বের ফিরিবার পূর্ব্বেই দুষ্মন্ত স্বীয় রাজধানীতে ফিরিয়া যান। কণ্ব আশ্রমে আসিলে, সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করেন। এদিকে শকুন্তলা গর্ভবতী হইয়াছিলেন। যথাসময়ে সেই আশ্রমেই তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। সেই পুত্রের যখন ছয় বৎসর বয়স, তখন কণ্ব তাহার সহিত শকুন্তলাকে রাজার নিকট প্রেরণ করেন। রাজা শকুন্তলাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন বটে, কিন্তু সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া তাড়াইতে চেষ্টা করিলেন। দৈববাণী হইল, 'শকুন্তলা তোমারই

সুপুত্রের ন্যায় শকুন্তলাকে গ্রহণ করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।”

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ‘পদ্মপুরাণ’ নামে একখানি গ্রন্থ আছে। সেই গ্রন্থের স্বর্গখণ্ডে শকুন্তলার একটী উপাখ্যান আছে। সেই গ্রন্থের গল্পের সহিত কালিদাসের নাটকের গল্প কতকটা মিলে। অনেকে বলেন, কালিদাস “পদ্মপুরাণে” শকুন্তলার গল্প যেরূপ পড়িয়াছিলেন, একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া তদবলম্বনে একখানি নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা এই স্থলে আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের কথা উদ্ধৃত করিলাম, “The eighteen Purans were mainly composed in the Vikramadityan Age, although they have been largely added to in subsequent times, even after the Mahomedan Conquest.” * “Vikramadityan Age” বলিতে আমরা এরূপ বুঝি যে, যে সময়ে বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিতেন বরং তাহার কিছুকাল পরে, তথাপি একদিনও আগে নহে, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সম-সাময়িক। অতএব সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন পুরাণগুলি বড়জোর কালিদাসের সম-সাময়িক। তাহার মধ্যে “পদ্মপুরাণখানি” আছে কি না, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে কেমন করিয়া শপথ করিব যে, কালিদাসের গল্প পৌরাণিক গল্পের অনুকরণ? আর বহু ব্যক্তি যে পথে গিয়াছেন, তাহাই প্রশস্ত বলিয়া ও কথা স্বীকার করিলেও, কালিদাসের তাহাতে অগৌরব নাই; কেন না, তাঁহার গল্প আরও প্রাণমুগ্ধকারী। লোকে পুরাণ ভুলিবে, তবু কালিদাসের শকুন্তলাকে ভুলিবে না।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

---

* A Brief History of Ancient and modern India by Mr.

বাঙ্গালা ভাষার লেখক।

পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে। অধুনাতন যশোহর জেলার অন্তর্গত বনগ্রাম মহকুমার অধীন কায়রাগ্রামে পৈতৃক বাস। ইহাঁরা কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ। প্রায় দশ এগার পুরুষ হইতে বঙ্গদেশে বাস। পূর্ব্ব-পুরুষগণের অনেকেই বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত ছিলেন। তজ্জন্য কৃষ্ণনগরের রাজগণের নিকট হইতে বহু-পরিমিত ভূমি বৃত্তি পান। বীরেশ্বর বাবুর পিতামহের নাম ৺কনকচন্দ্র পাঁড়ে। ইহাঁর তুল্য দাতা ও অতিথিপ্রিয় লোক বিরল ছিল। তেজারতি ও ভূ-সম্পত্তিতে ইহাঁর আয়ও নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু সমস্ত অর্থ ইনি পূজা ও অতিথি-সেবাতেই ব্যয় করিতেন। এই অতিথি-সেবার জন্য কনকচন্দ্র সাধারণের নিকট রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। পূর্ব্বদেশের সমস্ত লোক তৎকালে তাঁহাকে রাজা বলিত। ব্রাহ্মণের উপর কনকচন্দ্রের বড়ই ভক্তি ছিল। তদীয় স্ত্রীও তদনুরূপ গুণবতী ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিত। তিনি পতির সহগামিনী হইয়াছিলেন। যে সময় কনকচন্দ্রের মৃত্যু হয়, তখন ইহাঁর পুত্র মৃত্যুঞ্জয়ের বয়স ষোড়শবর্ষমাত্র। তিনিই জ্যেষ্ঠ। এই বয়সে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয় ও ভগিনীদ্বয়কে স্ব-মতে রাখিয়া সংসারের উন্নতি করেন। ইহাঁদের সৌভ্রাত্র ঐ প্রদেশে উপমা-স্থল হইয়াছিল। সকলে ইহাঁদিগকে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন বলিতেন। ভ্রাতৃগণকে সর্ব্বপ্রকারে সন্তুষ্ট রাখিয়া পৈতৃক অতিথিসেবার ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া এবং সমস্ত পূজা পার্ব্বণাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াও, প্রভূত পরিমাণ ভূসম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং বাসভবনের জন্য এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ বাসভবন,—কলিকাতা জোড়াসাঁকোর নূতন বাজারের শ্যামাচরণ মল্লিকের বাটীর অনুকরণে প্রস্তুত এবং উহা অপেক্ষা অধিক ছোটও হইবে না। মৃত্যুঞ্জয় নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। সংস্কৃত ও পারসী উভয় ভাষাতেই তিনি অধিকারী ছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ও ব্যবহারশাস্ত্রেও তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ঔষধ ও পথ্য বিতরণে বহুতর দরিদ্রের প্রাণ তিনি রক্ষা করিতেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার যশঃ প্রচার হইয়াছিল। সকলেই তাঁহাকে ভক্তির সহিত ভালবাসিত। তাঁহার স্বভাব অতি নির্ম্মল ছিল। ইহাঁর তিন পুত্র ও দুই কন্যা। বীরেশ্বর ...

কৃষ্ণনগর কলেজে বীরেশ্বর বাবু অধ্যয়ন করেন। কিন্তু ভয়ানক শিরোরোগ উপস্থিত হওয়ায়, ডাক্তারগণের পরামর্শে ইহাঁকে পাঠ ত্যাগ করিতে হয়। পরন্তু লেখা পড়ার প্রতি সবিশেষ অনুরাগ নিবন্ধন, সেই রোগের সময়ও অধ্যয়ন করিতে ইনি বিরত হন নাই।

স্বদেশের প্রতি বাল্যকাল হইতেই বীরেশ্বর বাবুর অনুরাগ। সেই অনুরাগহেতু ইনি বাঙ্গলা বহুতর পুস্তক পাঠ করেন ও নিজের যত্নে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। এই ভয়ানক শিরোরোগের সময়ও বীরেশ্বর বাবু লীলাবতীর ন্যায় কঠিন সংস্কৃত অঙ্কপুস্তক, অন্যের সাহায্য ব্যতীত, নিজে পড়িয়া নিজে অনুবাদ করেন। ঐ লীলাবতীই বীরেশ্বর বাবুর প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। ১৭।১৮ বৎসর বয়সে ইনি ঐ পুস্তক অনুবাদ করেন। ইহার পূর্ব্বে পাঠত্যাগের অব্যবহিত পরেই বীরেশ্বর বাবু "ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত" প্রণয়ন করেন; কিন্তু এই বিষয়ে আরও পুস্তক বাঙ্গলায় প্রকাশিত হইয়াছে শুনিয়া সে পুস্তক প্রকাশ করেন নাই। কোন পুরাতন বিষয় লিখিতে বা কাহারও সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইহার প্রবৃত্তি ছিল না এবং এখনও নাই। এদেশের কাহারও কাহারও ধারণা, Arithmetic-এ যে সকল অঙ্ক আছে, এদেশের লোকে তাহা কখন জানিত না; দেশের এই অযথা কলঙ্কমোচনের জন্য বীরেশ্বর বাবু লীলাবতী প্রচার করেন। বীজগণিত, গোলাধ্যায়, গণিতাধ্যায় প্রভৃতি বিষয় বাঙ্গলায় প্রকাশ করার বলবতী ইচ্ছা তাঁহার ছিল; কিন্তু সে সকল পুস্তক এদেশের লোকে পড়ে না বলিয়া, তিনি তাহা প্রণয়ন করেন নাই। এমন কি বীরেশ্বর বাবুর লীলাবতী বহুকাল পূর্ব্বে সেই এক-বারমাত্র ছাপা হইয়াছিল, আজিও তাহার কিছু অবশিষ্ট আছে।

ইহার পর বিজ্ঞানসার, উপক্রমণিকা, শিশুবিজ্ঞান, লোকচরিত ও বাঙ্গলা শিক্ষা ১ম ও ২য় ভাগ এই সকল গ্রন্থ বীরেশ্বর বাবু প্রণয়ন করেন। বিজ্ঞান-সার ও শিশুবিজ্ঞান, এই দুই গ্রন্থ ইংরাজির অনুবাদ; কিন্তু ইহার প্রণালী পদ্ধতি নূতন ধরণের। স্কুলের ছাত্রগণ কেবল বিদেশীয়গণের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করে দেখিয়া, স্বদেশীয় মহাত্মাগণের বৃত্তান্ত, বীরেশ্বর বাবু আর্য্যচরিত নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। বাঙ্গলা ভাষার মূলতত্ত্ব শিক্ষাসৌকার্য্যের উদ্দেশ্যে "বাঙ্গলাশিক্ষা" গ্রন্থ বীরেশ্বরবাবু প্রণয়ন করেন। পদার্থবিদ্যা ভিন্ন অন্য বিজ্ঞান বাঙ্গলায় ছিল না বলিয়া, পাঁড়ে মহাশয় বিজ্ঞানসার লিখেন। ইহাতে প্রায়

ইহার কিছু পরে, পাঁড়ে মহাশয়ের স্কন্ধে বৈষয়িক কার্য্যের ভার পতিত হয়। সেই সময় বৈষয়িক অনেক গোলযোগও তাঁহার ঘটিয়াছিল। সেই জন্য পাঁড়ে মহাশয় কয়েক বৎসর যাবৎ সাহিত্যালোচনা করিতে পারেন নাই। তাহার পরে তিনি আর একটী কার্য্যে মন দেন; দেশে স্কুল নাই দেখিয়া, একটী স্কুল স্থাপন করেন। পাঁড়ে মহাশয় যে সময়ে কৃষ্ণনগরে পঠদ্দশায় ছিলেন, সেই সময়ে সেইখানেই দরিদ্রদিগের জন্য একটী বিনা বেতনের স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার নাম দরিদ্র বিদ্যালয় ছিল। তিনি চলিয়া আসার পর সেই স্কুলে বেতন লওয়ার নিয়ম হয়। ঐ স্কুল আজিও আছে এবং এক্ষণে ঐ স্কুলই কৃষ্ণনগরের শ্রেষ্ঠ বঙ্গবিদ্যালয়রূপে পরিগণিত হইয়াছে। আপন গ্রামের ও চতুস্পার্শ্বস্থ গ্রামের বালকদিগের সুবিধার জন্যই তিনি স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। শিক্ষকগণকে অধ্যাপন কার্য্যে সমধিক উপযোগী করিবার জন্যে তিনি নিজে শিক্ষা দিতেন। এই সমস্ত বিষয়ে ব্যস্ত থাকায়, সাহিত্যালোচনার কিছুমাত্র অবসর পাইতেন না। কিন্তু এই সময়ে তাহার মনে দার্শনিক চিন্তার উদয় হইল। ভ্রমণে, শয়নে, যখন তিনি সময় পাইতেন, তখনই নানারূপ দার্শনিক চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল।

এই সময় জ্ঞানাঙ্কুর পত্রের সম্পাদক,—পাড়ে মহাশয়কে ঐ পত্রে লিখিতে অনুরোধ করায়, পাঁড়ে মহাশয় ঐ সকল চিন্তা,—মানবতত্ত্ব নাম দিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় জ্ঞানাঙ্কুরে তিনি অল্পই লিখিতে পারিতেন। কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর পাঁড়ে মহাশয়ের গৃহবিবাদের সূচনা হইল। তাহাতে তিনি পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং "নববাস" নামে একখানি দেশী বস্ত্রের দোকান খুলিলেন। একদরে বস্ত্র বিক্রয়ের পথ ইনিই কলিকাতায় প্রথম দেখান এবং তাহাতে দেশী কাপড় লোকে অধিক ব্যবহার করিয়া দেশীয় তাঁতিগণের অন্ন সংস্থানের উপায় করেন, তাহা উপায়বিধান জন্য অল্পমূল্যে দেশীকাপড় বিক্রয় করিতে পাঁড়ে মহাশয় আরম্ভ করেন। এই সময়ে জ্ঞানাঙ্কুর উঠিয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

ছায়াসতী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নিষ্ঠুর নৈরাশ।

"হা বিধি এ বিধি বুঝিতে পারিলি,
কমল কোরকে কীটের বাস ;
বিপাকে বধিতে সরলা হরিণী
শবরে গোতিয়া রেখেছে ফাঁশ।"　　বঙ্গসুন্দরী।

কলিকাতার অন্তর্বর্ত্তী গড়পার গ্রামে একটী সামান্য বাটীতে রাজপুত্র রমণীমোহনের বিবাহ অতি সংগোপনে নিষ্পন্ন হইল। বরকর্ত্তা, অতুল বাবু, কন্যাকর্ত্তা কুমারের অপর বন্ধু কমল মিত্র ; স্ত্রী আচার কমল মিত্রের পরিবারেরা করিল, যে ব্রাহ্মণ বিবাহের মন্ত্রপাঠ করিল, সে দক্ষিণাস্বরূপ একশত টাকা প্রাপ্ত হইল। পরিণয়ের দুইদিবস পরে রমণীমোহন ইন্দ্রপ্রিয়াকে লইয়া বাগ্‌বাজারের খালধারে মনোহর উদ্যান বাটীকায় রাখিলেন। বিবাহের একমাস পরে একদিবস ইন্দ্রপ্রিয়া রমণীমোহনকে বলিলেন, "নাথ! আমার মার জন্য মন অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, তুমি আমায় মার কাছে নিয়া চল।" রমণীমোহন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "না প্রিয়ে! এক্ষণে তোমার যাওয়া হইতে পারে না, কি জানি যদ্যপি তাঁহারা রাগত হইয়া অপমান করেন।" ইন্দ্রপ্রিয়া সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "তবে আমি কতদিনে মাকে দেখিতে পাইব।" রমণীমোহন গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সময়ে হইবে, অগ্রে আমি তাঁহাদিগকে শান্তনা করিব, পশ্চাৎ তোমায় লইয়া যাইব।" দম্পতির কথোপকথনে বাধা দিবার জন্য অতুল উপস্থিত হইলেন। রমণীমোহন অতুলকে বলিলেন, "ইন্দ্রপ্রিয়া মাতাকে দেখিবার জন্য বড়ই ইচ্ছুক।" অতুল হাসিয়া বলিল, "সে এক্ষণে হতে পারে না।" বালিকা ইন্দ্রপ্রিয়া মুখে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। উদার রমণীমোহন ইন্দ্রপ্রিয়ার ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "কি হইবে ভাই! উহার ক্রন্দনে আমার ক্লেশ

হইতেছে।” অতুল বিরক্ত অন্তরে বলিল, “যাও, ধরা দিয়ে জেল খাটগে।” কুমার বলিলেন, “কেন বিবাহ করিয়াছি, তাহাতে কারারুদ্ধ হইব কেন?” অতুল শ্লেষ করিয়া বলিল, “হাঁ, আমি কি না রাত্রে গোপনে আসিয়াছি, অতএব তোমার ভয় কি?” কুমার চিন্তান্বিত অন্তরে বলিলেন, “তুমি ভাই তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাহাতে মিল হয়, এমন একটা উপায় কর।” অতুল মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, “কুমার! সময়ে সকলেই হইবে—এক্ষণে হইতে পারে না। কারণ তাঁহাদের কন্যাকে চুরি করায় নির্ম্মলকৌলিন্যে কলঙ্ক কালিমা পড়িয়াছে। অতএব এক্ষণে তাঁহারা জানিতে পারিলেই ভয়ানক ক্রোধবশতঃ পুলিশ কেশ করিবেন।” কুমার বলিলেন, “তবে তুমি এক্ষণে বড়বাজারে যাও, কিশোরীমোহন জহুরী একছড়া দোনরী মুক্তার হার দিবে, লইয়া আইস। আমি যাই, ইন্দ্রপ্রিয়াকে সান্ত্বনা করিগে।” অতুলবাবু একখানি ভাড়াটিয়া গাড়িতে উঠিয়া গাড়োয়ানকে বলিলেন, “বড়বাজারে চল।” অতুল বাবুর চিন্তাস্রোতও গাড়ির গতি অনুসারে চলিতে লাগিল। সুন্দরী! ইন্দ্রপ্রিয়া কি একদিনের জন্য আমার হইবে না, রাজকুমার কখনই উহাকে চিরদিন পাইবেন না। সুন্দরী রাজবধূ সময়ে অতুলকরে আজ্ঞাকারিণী হইবে। হায়! কি পুণ্যে রমণী-মোহন এত ঐশ্বর্য্য ও দেবদুর্লভা রমণী পাইয়াছ? পাপিষ্ঠের চিন্তার জন্য গাড়ি থাকিল না, জহুরীর দোকানে পঁহুছিল, অতুল লাফাইয়া জহরতের বিপনীতে উঠিল। যে সময় ইন্দ্রপ্রিয়া, কুমার ও অতুলকে ত্যাগ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে উঠিয়া আসেন, তখন যশোদা দাসী ইন্দ্রপ্রিয়ার তাম্বুল প্রস্তুত করিতেছিল। দাসী বালিকাকে রোদন করিতে দেখিয়া ব্যস্তভাবে ক্রোড়ে ধারণ করত তাঁহার শয়নকক্ষে লইয়া গেল। বালিকা ইন্দ্রপ্রিয়া কৌচে শয়ন করিয়া মুখ গোপন করত অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। যশোদা কাতর হইয়া বলিল, “কেন ইন্দু এত কান্দিতেছ? আমার মাথা খাও বল?” ইন্দ্রপ্রিয়া অর্দ্ধস্ফুটিতস্বরে বলিলেন, “ঝি, আমার মার জন্য মন কেমন করিতেছে।” যশোদা সান্ত্বনা করিয়া বলিল, “তার জন্য আবার কান্না কেন? দুমাস পরেই মায়ের কাছে যাবে? আমি বাবুকে বলিব, ছি দিদি! কান্‌তে নাই—অসুখ কর্‌বে।” এই সময়ে রমণীমোহন কক্ষে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রপ্রিয়ার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন,

পূর্ব্বক বলিলেন, "প্রিয়তমে! অনর্থক ক্রন্দন করিয়া কেন আমাকে যাতনা প্রদান করিতেছ, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমায় ক্লেশ দিতেছি না। আমি যত শীঘ্র পারি, তাঁহাদের সহিত সম্মীলিত হইতে চেষ্টা করিব। ইন্দ্র-প্রিয়া! তোমার জন্য একছড়া দোনরী মুক্তার হার আনিতে দিয়াছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমনুজেন্দ্রনাথ দত্ত।

আর্য্য-জাতির পশু-চিকিৎসা।

এক সময়ে কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, কি রাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি,—সকল বিষয়েই—আর্য্যগণ সকলের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আর্য্যজাতির সে পূর্ব্ব গৌরব—এখন বিপর্য্যস্ত, আর্য্যজাতির সেই সর্ব্বভেদী প্রতিভা এখন কালকবলে কবলিত; আর্য্যজাতির সেই সর্ব্ব প্রবেশক সূক্ষ্ম দৃষ্টি এখন তিমিরাবৃত! আর্য্য বংশধরগণ আপনার পূর্ব্ব পুরুষের অতুল গৌরবের কথা, এখন সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে! ইহা স্মরণ করিয়া কোন্ হৃদয়বত্তা না দুঃখিত হইবেন? আর্য্যজাতির অধঃপতনের দিনে, আর্য্য সন্তানের আত্মারও যথাসাধ্য অধোগতি হইয়াছে।

আমাদের জটা বল্কলধারী—ফলমূলাহারী—বৃক্ষতলসেবী—ঋষিগণের মস্তিষ্ক হইতে, একদিন যে অনন্ত রত্ন প্রসূত হইয়াছিল,—তাঁহারা যে মানব জীবনের অন্তর্কোটরে প্রবেশের পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন,—আমাদের এমন দুর্দ্দিনে—এমন অধঃপতনের দিনে—বিধর্ম্মীগণও সে কথা স্বীকার করিতেছেন! তাই অতীত ধর্ম্ম ও শাস্ত্রাদির পুনরাবৃত্তি করিয়া অনুতপ্তহৃদয়ে হিন্দু আজ আপনার মহত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন! জাতীয় উন্নতির প্রতি হিন্দুর, আবার দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, ইহা ভরসার কথা—সুখের কথা—আনন্দের কথা! যাঁহারা পাশ্চাত্য আদর্শে সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, আজি তাহারা আপনাদের "হারানিধি-অন্বেষণে—ব্যগ্র! একথা ভাবিলে, সত্যসত্যই আনন্দে আত্মহারা হইতে হয়, গর্ব্বের সহিত কেমন একটু আত্মাভিমানও আসিয়া পড়ে!

হিন্দুর সেই পূর্ব্ব গৌরব-স্পৃহা, নবীন উদ্যমে হিন্দুর হৃদয়ে আবার

হিন্দুকে হিন্দুর হিন্দুত্ব বুঝাইতেছেন—হিন্দুকে কর্ত্তব্য দীক্ষায় দীক্ষিত করিতেছেন—সাধককে ইষ্টদেবতার ধ্যান শিখাইতেছেন! এইটুকু করিতেছেন বলিয়াই আজ আমাদের বড় আনন্দের—বড় সুখের—বড় ভালবাসার জিনিষ। আজ এ সমুদয় আমাদের "ইষ্টদেবতার আশীর্ব্বাদ ফল।" এই অনুগ্রহ আমরা ইহজীবনে বিস্মৃত হইব না। আর যে মহাত্মাগণ "হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারা আমাদের হৃদয়ের একমাত্র পূজনীয়—প্রাণের অধিক প্রিয়—আত্মার চেয়ে আত্মীয়। তাঁহাদের পবিত্র মূর্ত্তি—আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে অক্ষয় অক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। হিন্দু-হৃদয়, তাঁহাদের কাছে কখনও অকৃতজ্ঞ থাকিবে না।

কাল যায়, কার্য্যও যায়, থাকে কেবল তাহার স্মৃতিমাত্র। সেই স্মৃতির জন্যই হিন্দু আজ আপনার জিনিষ, আপনার বলিয়া চিনিয়া লইতে শিখিয়াছে। হিন্দুর এই নবজীবনের পুনরভ্যুদয়ের দিনে—হিন্দুর প্রাচীন গ্রন্থ "পশু চিকিৎসা" সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। একখানি হস্তলিখিত পুঁথির কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এবং অপ্রকাশিত। "বাগ্‌ভট" গ্রন্থের টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ অরুণদত্ত এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। যে কয়েকটী মাত্র শ্লোক আমরা পাইয়াছি—তাহাতে আর কোনও উপকার হউক না হউক—আর্য্য ঋষিগণের পশু চিকিৎসা সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা ছিল—তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে। গ্রন্থখানি সামান্য হইলেও—আমাদের গৌরবের নিদর্শন। নিম্নে মূল শ্লোক এবং তাহার অনুবাদ দেওয়া গেল।

সহচরস্য মূলস্য রক্ত সূত্রেণ বন্ধনাৎ।
মূর্দ্ধি সর্ব্ববিধো নশ্যেৎ জ্বরো বাজি শরীরজঃ॥

সহচরের (পীত ঝিণ্টী) মূল, রক্ত সূত্রের দ্বারা মস্তকে বন্ধন করিলে, অশ্বের সর্ব্ববিধ জ্বর নষ্ট হয়।

কাঞ্জিকেন সমং লোধ্রং নিষ্পিষ্যাঙ্গেষু লেপনাৎ।
জ্বরো নাশং সমায়াতি তুরগস্য সুনিশ্চিতং॥

কাঞ্জিকের সহিত শোধকাষ্ঠ বাটিয়া অশ্বের অঙ্গে প্রলেপ দিলে, অশ্বের জ্বর নষ্ট হয়।

লতা কস্তুরিকা মূল চর্ব্বণ করিলে অশ্বগণের মুখরোগ নষ্ট হয়।

পদ্ম বীজাশনেনৈব কাস রোগঃ প্রশাম্যতি।

পদ্মবীজ ভক্ষণ করিলে, অশ্বের কাশরোগ নষ্ট হয়।

অসিতস্য তিলস্যাপি সুরয়া সহ ভক্ষণাৎ।

বাত রোগঃ প্রনষ্টঃ স্যাৎ সর্ব্বো বাজিগণস্যহি॥

মদ্যের সহিত কৃষ্ণতিল ভক্ষণ করিলে, অশ্বের সর্ব্ববিধ বাতরোগ নষ্ট হয়।

অশ্বানাং সহ মদ্যেন গুড়চী বিশ্ব ভক্ষণাৎ।

শাখাগতং নিহন্ত্যাশু বাত রোগং সুদারুণং॥

মদ্যের সহিত গুলঞ্চ ও শুঁঠ ভক্ষণ করিলে, অশ্বের শাখাগত বাতরোগ নষ্ট হয়।

ছর্দ্দিরোগে সমুৎপন্নে বাজিনাং তৎ প্রশান্তয়ে।

উত্তপ্ত লৌহদণ্ডেন দগ্ধং কুর্য্যাৎ পদদ্বয়ং।

অশ্বের বমন রোগ উপস্থিত হইলে, উত্তপ্ত লৌহদণ্ড দ্বারা দুইটী পা দগ্ধ করিয়া দিবে।

তণ্ডুলেন সহাশ্বস্য ধাতকীপুষ্প ভক্ষণে।

অতিসারঃ প্রবলোঽপি নাশ মায়াতি তৎক্ষণাৎ॥

তণ্ডুল ও ধাতকীপুষ্প ভক্ষণ করিলে, অশ্বের প্রবল অতিসার তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়।

কাঞ্জিক পানাদশ্বস্য তন্দ্রাদাহৌ বিনশ্যতঃ।

কাঞ্জিক পান করিলে, অশ্বের তন্দ্রা এবং দাহ রোগ নষ্ট হয়।

রসাঞ্জন গৈরিকায়া র্হরিদ্রায়াশ্চ বাজিনাং।

অঞ্জনেন বিনষ্টঃ স্যাৎ রোগো নেত্র সমুদ্ভবঃ॥

রসাঞ্জন গেরিমাটী, এবং হরিদ্রার অঞ্জনে, অশ্বের নেত্ররোগ নষ্ট হয়।

পলাশ বীজ চূর্ণস্য বারিণা মিশ্রিতস্য চ।

ধারণা দ্বাজিলা মাস্যে মুখ-পাকো বিনশ্যতি॥

জলের সহিত পলাশ বীজ চূর্ণ মুখে ধারণ করিলে, অশ্বের মুখ-পাক নষ্ট হয়।

বন্ধুক পুষ্পং বল্লীয়াৎ কর্ণ রোগোপশান্তয়ে।

শ্রবণে বাজি-রাজীনাং তেন নূনং প্রশাম্যতি॥

কৃমিলিখেৎ কোষ্ঠস্থঃ খর্জ্জুর পত্র ভক্ষণাৎ।

খর্জ্জুর পত্র ভক্ষণ করিলে, অশ্বের কোষ্ঠগত কৃমি নষ্ট হয়।

শ্রীব্রজবল্লভ-কাব্যতীর্থ-কাব্যকণ্ঠ বিশারদ।

টাকা।

[১]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
তুমি যা'র ঘরে নাই,
বলি, তা'র মুখে ছাই;
"লক্ষ্মীছাড়া" অভিধানে, কর অতঃপর॥

[২]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
তুমি যা'র আছ ঘরে,
মান্য, গণ্য, সবে করে;
পুত্র, পরিবারে তা'রে, তোষে নিরন্তর॥

[৩]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
(তুমি) সতীরে অসতী কর,
সুজাতির জাতি মার;
আচণ্ডাল ধনী হ'লে পায়ত আদর?॥

[৪]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
কলিতে নীচের ঘরে,

[৫]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
তাই লক্ষ্মী নীচগামী,
পতিপ্রাণা ফেলে স্বামী ;
অর্থ মদে হয়ে মত্ত, আকাঙ্ক্ষা বিস্তর ॥

[৬]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
(তুমি) অসাধ্য সাধন কর,
অজ্ঞানে সজ্ঞান কর ;
সৃষ্টি ছাড়া, কার্য্য কর, ওহে সৃষ্টিধর ॥

[৭]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
(কিবা!) উজ্জ্বল সুগোল কায়,
'রাণী মূর্ত্তি' আঁকা গায় ;
পয়সায় ষোল গণ্ডা, নহে তুচ্ছ দর ॥

[৮]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
ঠুন্ ঠুন্ কিবা! শব্দ,
আবাল, বণিতা, অন্ধ ;
বৃদ্ধ, যুবা, শুনে স্তব্ধ, ধ্বনিতে যাহার ॥

[৯]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
তুমি টাকা চমৎকার!
কি গুণ বলিব আর!
তোমা বিনা ত্রিসংসার হয় যে আঁধার ॥

[১০]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
রোগ, শোক, তুমি নাশ,
গলায় পরাও ফাঁস ;

[১১]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
(তুমি) একতিল হ'লে ছাড়া,
সৃষ্টি শুদ্ধ যায় মারা;
"হা! টাকা! হা! টাকা!" বলে, করে হাহাকার!

[১২]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
পাপ, পুণ্য, যাই বল,
সকলি তোমারি কল;
তুমি পার ফেলিবারে যা'তে ইচ্ছা কর॥

[১৩]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
যে যত তোমায় পায়,
সে তত তোমায় চায়;
ধরা, সরা জ্ঞান করে, পে'লে অতঃপর॥

[১৪]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
(কবি) ভুবন কিষণ বলে,
যা' কিছু অর্থের বলে;
ধনী, খুনী, পাপ করে, হয় সে উদ্ধার॥

[১৫]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
কল্পতরু তুমি টাকা,
থেকো'না আমায় ফাঁকা;
মনতি আমায় রেখ, কোটী নমস্কার॥

[১৬]

ধন্য টাকা! ধন্য বটে! মহিমা তোমার!
বৃক্ষ ফ'ল তুমি হ'লে,
ধামা ভরি ঘরে তুলে;
টপাটপ্ গালে ফেলে, হতে'ম সুস্থির॥

[১৭]

রূপার চাক্তিরে! মরি! কি গুণ তোমার!
নাহি সাঁস, নাহি আঁটী;
নাহি খোসা, নাহি শুঁটী;
(কিবা!) চক্‌চকে পরিপাটী;
ইচ্ছা হয় সদা ঘাঁটী, এমন সুন্দর! ॥

শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র।

তুমি।

তুমি　　উজ্জ্বল যেন　　প্রভাত রবি
দীপ্ত নয়ন ধারা;
তুমি　　মধুর যেমন　　বাসন্তী রাতে
কৌমুদী দিশেহারা;
তুমি　　স্নিগ্ধ যেমন　　শোক-তাপহরা
পূত জাহ্নবী বারি;
তুমি　　শীতল যেমন　　মলয়-সমীর
অধীর যাতনাহারী;
তুমি　　মুক্ত যেমন　　মানস-কুঞ্জে
পিকবর-মধু-তান;
তুমি　　পবিত্র যেন　　ত্রিবেণী-তীরে
কি মহা যোগের স্থান;
তুমি　　ফুল্ল যেমন　　নব নলিনীর
অধরে অমর হাসি;
তুমি　　কোমল যেমন　　উদ্যান-মাঝে
ক্ষুদ্র ভূমিকা-রাশি;
তুমি　　সুন্দর যেমন　　পর্ব্বত-কোলে
একটী রজত-ধারা;
তুমি　　লক্ষ যেমন　　জলধি-ভ্রান্ত
শাবকের ধ্রুবতারা;

তুমি দুর্লভ যেন মরুশাহারায়
সুধা-প্রস্রবণ ক্ষীণ ;
তুমি দয়াময়ী যেন আলোক-স্তম্ভ
সাগরে সহায়হীন ;
তুমি নূতন যেমন ঘোম্‌টার মাঝে
বধূর চাহনি নব ;
তুমি অতুল যেমন চির অতুলনা
ওই মুখখানি তব ;
তুমি প্রশান্ত যেন পাদপ অশোক
নম্র, বিনত-ধীর ;
তুমি শান্তিদায়িনী আঁখি-কোণে যেন
এক ফোঁটা অশ্রু-নীর।

কালিদাস চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা।

পালফ্রেণ্ড।—পরিচ্ছদ মানব সৌন্দর্য্যের একমাত্র উপাদান ; বাহ্যিক বেশ-ভূষার ব্যক্তিমাত্রকেই ইতর ভদ্র কি মধ্যবিত্ত, তাহা অনায়াসেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে ; দেশকাল ও পাত্রভেদে,—বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশে বিবিধ নূতন নূতন পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবহার চলিয়াছে ;—এই পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তুত কার্য্যে যাঁহারা নূতনত্ব দেখাইতে পারেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত এবং আদর্শস্থানীয় হইয়া থাকেন। কলিকাতা পাল ফ্রেণ্ড কোম্পানী ইহার দৃষ্টান্ত স্থল,—আমরা কলিকাতার ৩৪৬ নং অপার চিৎপুর রোডের পাল ফ্রেণ্ড কোম্পানীর সততা, কার্য্যতৎপরতা ও নূতন ধরণের কাট ছাঁট দেখিয়া সবিশেষ প্রীত হইয়াছি।

আমরা সুবিখ্যাত ভিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কসের প্রস্তুত এক শিশি কারবলিক টুথ পাউডার উপহার পাইয়াছি, ইহার দ্বারা দন্তধাবণ করিলে দাঁত বেশ পরিষ্কার হইয়া মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়।

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক পত্র।)

নবম বর্ষ। } ১৩০৭ সাল, ফাল্গুন। { ৮ম সংখ্যা।

ভিক্টোরিয়া-জীবনী-প্রসঙ্গ।

ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নাম এ ভারতবর্ষে কে না জানে? বালক ও বৃদ্ধ, পুরুষ ও স্ত্রী, ধনী ও দরিদ্র সকলেই মহারাণীর নাম জানে এবং তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। আমরা মাতৃ-স্তন্যপানের সহিত সেই পবিত্র নাম-সুধা পান করিয়াছি, আমাদের রুধিরের সহিত সে অমৃতময় নাম বিমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, পরে ক্রমেই বড় হইয়াছি, ক্রমেই তাঁহার দেবী-জীবনের অশেষ পুণ্যময়ী কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা যে মহারাণীকে রাজ্ঞী বলিয়া মান্য করি, ভক্তি করি, তাহাই নহে, তাঁহাকে নিতান্ত আপনার জন বলিয়া স্বীয় মাতৃবৎ শ্রদ্ধা করি। সকলেই জানেন, সেই অশেষ সদ্‌গুণাধার, স্ত্রীজন-সুলভ কোমলতামণ্ডিতা আমাদের মাতৃবৎ শ্রদ্ধার ও ভক্তির পাত্রী মহারাণী ভিক্টোরিয়া আর ইহজগতে নাই; তিনি এ নশ্বর জগতের ক্ষণবিধ্বংশি শরীর পরিত্যাগ করিয়া গত ২২শে জানুয়ারী (১৯০১) মঙ্গলবার মঙ্গলময়ের চরণে লীনা হইয়া স্বর্গীয় শান্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদি পরিবারবর্গ, অসীম রাজ্যের প্রজাকুল, সকলেই তাঁহার জন্য আন্তরিক সন্তপ্ত ও শোকভারাক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহার সুবিশাল রাজ্যের সর্ব্বত্রই নানারূপ সভা সমিতি, এবং নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার বিয়োগবেদনা পরিব্যক্ত করা হইতেছে। সকল দেশের স্বাধীন রাজন্যবর্গও তাঁহার জন্য আন্তরিক শোক ও তাঁহার আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

করিতেছেন। বাস্তবিকই আজ পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক এই পুণ্যবতী রমণীর পবিত্র গুণাবলী স্মরণ করিয়া খেদ প্রকাশ করিতেছে। এটি একদিকে যেমন দুঃখের চিত্র, অন্যদিকে আবার আনন্দেরও চিহ্ন বটে! ইহা হইতে তাঁহার জীবনের মহত্বের আমরা বিশিষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই। যাঁহার অভাব আজ সমস্ত পৃথিবী অনুভব করিতেছে, তিনি বড় সামান্যা রমণী নহেন। তাঁহার রাজগুণ অপেক্ষা হৃদয়ের মহত্বেই তিনি এরূপ মহৎ সম্মানের অধিকারিণী হইয়াছেন। মহৎ জীবনী আলোচনা করিলেও পুণ্য আছে, এজন্য আমরা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনের কতকগুলি ঘটনা আলোচনা ব্যপদেশে এই আদর্শ রমণীর নাম কীর্ত্তন দ্বারা স্বীয় আত্মার পবিত্রতা সম্পাদন করিতে আসিয়াছি। পাঠকবর্গ বিশেষতঃ পাঠিকাবর্গ ইহাতে কিছু উপকৃত হইতে পারেন এবং স্বীয় স্বীয় জীবন এইরূপে গঠন করিতে চেষ্টা করিতে পারেন, ইহাও একতম উদ্দেশ্য। মহারাণীর স্মৃতিচিহ্ন নানা জনে নানাপ্রকারে স্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন—সে অবশ্য ভাল কথা! কিন্তু আমাদের পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহাদের তাদৃশ কোন অর্থ সঙ্গতি নাই, তাঁহাদিগের নিকট এবং পাঠিকা সাধারণের নিকট এই প্রসঙ্গে আমি একটা স্মৃতিচিহ্নের প্রস্তাব করি যে, তাঁহারা এই পুণ্যবতী মহিলার জীবনের মহত্ব ও সৎগুণাবলী আলোচনা দ্বারা স্বীয় স্বীয় জীবনে সেই সব গুণ প্রদর্শন করিতে চেষ্টমানা হইবেন, এবং নিজ নিজ কন্যা, পুত্র, বধূ প্রভৃতিকেও সেই সব আদর্শগুণে ভূষিতা করিতে সর্ব্ব প্রযত্নে চেষ্টা করিবেন। এই চেষ্টায় সফলতা লাভ করিলে তাঁহার স্মৃতিরও যেমন সম্মান করা হইবে, তেমনই এদিকে আমাদিগের বঙ্গের সংসারের লক্ষ্মী স্বরূপিণী রমণীগণও অনেক উপকৃতা হইবেন। ইহাতে অর্থব্যয় নাই, পরিশ্রম নাই, কেবল একটু আন্তরিক নিবিষ্ট চেষ্টা মাত্র। ভরসা করি, পাঠক-পাঠিকাগণ আমার এ প্রস্তাবটির সারবত্তা বিবেচনা করিবেন, এবং তদনুসারে চেষ্টা করিয়া মহারাণীর পুণ্য স্মৃতির গৌরব রক্ষা করিবেন।

আমরা এস্থলে মহারাণীর ধারাবাহিক জীবনী আলোচনা করিব না, তাহা অনেকেই অনেক সংবাদপত্রাদিতে পাঠ করিয়াছেন। তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিয়া রাখিতেছি যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাজা

৩য় জর্জ্জের চতুর্থ পুত্র এড্ওয়ার্ড ডিউক অব কেণ্টের কন্যা। ইঁহার মাতা জর্ম্মন রাজবংশীয়া। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মে ইনি স্বীয় পিতার প্রাসাদ কেনসিংটনে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজ্য-ভার প্রাপ্ত হন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইনি জর্ম্মন রাজপুত্র এলবার্টএর সহিত বিবাহিতা হন। এই বিবাহের ফলে তিনি নয়টি সন্তানের জননী হন। বর্ত্তমান সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড তাঁহার দ্বিতীয় সন্তান ও জ্যেষ্ঠপুত্র। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি আমাদের ভারতবর্ষের অধীশ্বরী হন এবং তদুপলক্ষে ঘোষণা পত্র প্রচার দ্বারা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সুবিচার হইবার অভয় প্রদান করেন। ১৮৮৮ সালে জুবিলী এবং ১৮৯৭ সালে হীরক জুবিলি হয়। বর্ত্তমান ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ২২শে জানুয়ারী মঙ্গলবার রাত্রে তাঁহার মৃত্যু হয়।

যে সমস্ত সৎগুণ থাকিলে মানুষ নরদেব বলিয়া গণ্য হয়, ভগবানের কৃপায় মহারাণীর সে সমস্তই ছিল। স্ত্রীজনোচিত কোমলতা, স্নেহ, দয়া, মায়া ইত্যাদি ত তাঁহার চরিত্রের অলঙ্কার ছিল, তদ্ব্যতীত সত্যনিষ্ঠা, বিলাসহীনতা, আত্মসংযম, নিরহঙ্কারিতা ইত্যাদি গুণও তাঁহাতে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান ছিল।

সন্তানের ভবিষ্য জীবনের মঙ্গলামঙ্গল যে পিতা মাতার উপরই একমাত্র নির্ভর করে, একথা অবিসংবাদী সত্য। পিতা মাতার গুণ অলক্ষ্যে সন্তানের জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়, আবার তাঁহাদের দোষও তদ্রূপ সন্তানে সংক্রান্ত হয়, এজন্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই তাহার সুশিক্ষার বিষয় পিতামাতার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এ বিষয় বেশী বলিবার স্থান বর্ত্তমান প্রবন্ধে নহে, ভবিষ্যতে তাহা বিশদ করিয়া বলিবার ইচ্ছা থাকিল; তবে মহারাণীর জীবনের এই সব সৎগুণের জন্যও যে তিনি তাঁহার পিতামাতার নিকট ঋণী, তাহা বলিবার জন্যই ঐ কথার উল্লেখ করিতে হইল। মহারাণীর পিতা ডিউক মহোদয় অত্যন্ত পরোপকারী, বিলাসিতা বর্জ্জিত, কলানিপুণ এবং নিরহঙ্কার ছিলেন, ভৃত্যগণকে পর্য্যন্ত তিনি বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন লইতেন। যদিও মহারাণীর দুর্ভাগ্য বশতঃ ঈদৃশ পিতার স্নেহ

তথাপি পিতৃগুণাবলী যে তিনি সম্যক্ লাভ করিয়া ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা মহারাণীকে সৎগুণ-মণ্ডিতা করিতে বিশেষ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া ছিলেন। তিনিও অশেষ সৎগুণশালিনী মহীয়সী রমণী ছিলেন; তাঁহার স্নেহের ধন একমাত্র কিনোদস্থান 'ড্রিনা' (মহারাণীর বাল্যের আদরের নাম—পূর্ণ নাম আলেক্ জন্দ্রিনা), যাহাতে সৎগুণের আধার হন, সে বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক যত্ন ছিল; দোষ দেখিলে তিরস্কার করিতে তিনি পরাঙ্মুখী হন নাই। কন্যার শিক্ষার জন্য 'লেজেন' নাম্নী একটি শিক্ষয়িত্রীও নিযুক্তা হইয়াছিলেন। যাহা হউক, মাতার এইরূপ ঐকান্তিকী চেষ্টার ফলে মহারাণী বাল্যবয়সেই স্বীয় চরিত্রের মাধুর্য্যে প্রত্যেকেরই স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, কন্যার মধ্যে যাহাতে বিলাসিতা অহঙ্কার আদি প্রবেশ করিতে না পারে, মাতা সে জন্য বিশেষ সতর্ক ছিলেন। ঈশ্বর কৃপায় তাঁহাতে সে সব দোষ প্রবেশ করিতেও পায় নাই। রাজকুমারী বাল্যকাল হইতেই স্নেহময়ী, দয়াবতী, নিরহঙ্কারা! শিক্ষা বিষয়েও তাঁহার একান্ত আগ্রহ ছিল, এবং তাহাতে মেধার পরিচয়ও বিশেষরূপেই তিনি প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তিনি সর্ব্বদা শিক্ষয়িত্রীর আদেশানুবর্ত্তিনী ছিলেন। বড় ঘরের মেয়ে বলিয়া একদিনও শিক্ষয়িত্রীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। আমাদের দেশের অনেক বড় ঘরের বালিকার পক্ষে এই আদর্শ বিশেষ-রূপে অনুকরণীয়।

তিনি বাল্য হইতেই নিরহঙ্কার—আমাদের দেশের বড় ঘরের বালক-বালিকাগণ বাল্য হইতেই নানাপ্রকারে, তাঁহারা যে বড় মানুষের ছেলে মেয়ে, এই শিক্ষায় অভ্যাস্ত হয় এবং তখন হইতেই আর সকলকে তুচ্ছ তৃণজ্ঞান করিতে আরম্ভ করে। সেটি একটি মহৎ দোষ। মাতৃগণ অনেক সময় সে অভ্যাসে তাহাদিগকে সাহায্য করেন, এটা কতদূর সঙ্গত তাহা তাঁহারা বিবেচনা করিবেন—সে অহঙ্কার ভবিষ্যতে কত ভাল ফল প্রদান করে, তাহাও একবার বিবেচ্য।

মহারাণী অসঙ্কোচে নিজ বাল্যসঙ্গীতসখীর সহিত মেজের মাদুরে বসিতেন এবং নিজের মূল্যবান্ খেলনকগুলি স্বেচ্ছায় তাহাকে দান

পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক বালক-বালিকাই এরূপ স্বার্থত্যাগ করিতে পারে না। এমন কি, নিজ নিজ ভাই বোনের সঙ্গে পর্য্যন্ত এই সব পুতুল আদি লইয়া ঝগড়া-দ্বন্দ্ব করে, সেটা তাহাদের মাতৃগণের প্রশংসার বিষয় নহে।

মহারাণী ৯।১০ বৎসর বয়সে যে বুদ্ধির ও সৎবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিতেছি, তাহা হইতেই সকলে বুঝিবেন যে, কালে তিনি যে একজন আদর্শ সতী রমণী হইবেন, তাহার পরিচয় তখনই তিনি প্রদান করিয়াছিলেন।

কোন সময় মহারাণী দুই একজন সঙ্গিনীসহ গাড়ীতে বেড়াইতে বেড়াইতে এক জহুরীর দোকানের নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন। এই সময় দেখিলেন, একটি রমণী একছড়া হার পছন্দ করিতেছেন। রমণী বহুকষ্টে একছড়া মনোমত হার বাছিয়া তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। জহুরী একটা উচ্চ মূল্য হাঁকিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাপেক্ষা কম মূল্যে ঐ হার বিক্রয় করিতে পারে কি না?" জহুরী বলিল, 'না।' রমণী তখন ক্ষুণ্ণা হইয়া হার প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, "তবে আর হার লওয়া হইল না। আমার অবস্থা এমন নহে যে, অতমূল্য একছড়া হারে ব্যয় করিতে পারি।" রমণী চলিয়া গেলেন। রাজকুমারী সবই দেখিলেন, এবং পরে জহুরীর নিকট ঐ রমণীর সম্বন্ধে সমস্ত শুনিয়া তিনি এত প্রীতা হইলেন যে, নিজে মূল্য দিয়া ঐ হার ছড়া কিনিয়া ঐ রমণীকে পাঠাইয়া দিলেন এবং সঙ্গিনীর দ্বারা ঐ সঙ্গে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখাইয়া দিলেন যে, আপনি এই হারছড়াটি বিশেষ পছন্দ করিলেও অবস্থাতিরিক্ত মূল্য বিধায় তাহা ক্রয় করিতে বিরত হইয়া যে সৎবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন, সে জন্য রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া এই হার আপনাকে উপহার দিলেন। তিনি আশা করেন, আপনি এইরূপ স্বীয় অবস্থা বিবেচনায় চিরকাল চলিবেন, এইরূপ অবস্থা বুঝিয়া চলার উপরই স্ত্রীজাতির সংসারে সুখ-শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা নির্ভর করে।" এই ৯।১০ বৎসর বয়সেই স্বীয় অবস্থা বুঝিয়া চলিবার কর্ত্তব্যতা বিষয় কিরূপ

দাবী করিতে অনেক সময় তাঁহারা স্বামীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করেন না। মহারাণীর বাল্যবয়সের এই অমূল্য উপদেশটি তাঁহাদের হৃদয়ে গ্রথিত হওয়া উচিত।

আর একবার মহারাণী একটি বড়ই পছন্দসই একটা খেলানা কিনিয়া দোকানের বাহিরে আসিতেছেন, এমন সময় একজন দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার নিকট নিজ দৈন্য জ্ঞাপন করিল, সঙ্গে আর অর্থ না থাকায় তিনি পুতুলটী ফেরৎ দিয়া সেই অর্থ দরিদ্রকে দান করিয়া স্বীয় স্বর্গীয় হৃদয়ের পবিত্র স্নেহ-ধারার পরিচয় প্রদান করিয়া ছিলেন। এইরূপে অনেক প্রকারেই তিনি স্বীয় চরিত্রের মাধুর্য্যের পরিচয় বাল্যেই প্রদান করিয়া ছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে বাল্যকালে দেখিয়া ছিলেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলেন, তিনি মিষ্টভাষিণী, মিতব্যয়িনী, সত্যভাষিণী, নম্র, ধীরা, অথচ সৎসাহস সম্পন্না ছিলেন। যখন রাজ-সিংহাসন প্রাপ্তির বিষয় একরূপ স্থিরই হইল, তখনও তাঁহার মাতা পাছে কন্যা এ সংবাদে অহঙ্কৃতা হন, এজন্য তাঁহাকে এ সংবাদ জানান নাই, কিন্তু শেষে যখন জানান হইল, তখন তিনি বলিয়া ছিলেন, "রাণী হওয়া বড় কঠিন কার্য্য, সকল প্রজার সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিধানের জন্য অনবরত দেখা আবশ্যক। আমাকে যদি তাই হইতে হয়, আমি ভাল ভাবে তাহা করিতে চেষ্টা করিব, ভগবান আমাকে সাহায্য করিবেন।" আহা! একথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন, যেখানে কষ্ট, যেখানে বেদনা, যেখানে আর্ত্তনাদ, সেখানেই তাঁর মাতৃহৃদয় অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার অংশ গ্রহণ করিয়া প্রজাকুলকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। তাঁহার সহানুভূতি সর্ব্ববিধ বিপদে সর্ব্ব শ্রেণীর উপর বিস্তৃত ছিল। স্নেহ মমতা রমণী হৃদয়েরই গুণ; রমণীগণ এই গুণে মণ্ডিতা হইলেই সংসারের শান্তিদায়িনীরূপে নানা শোক-তাপক্লিষ্ট পুরুষগণকে শান্তির শীতল ছায়া দান করেন। মহারাণী রাজপদ প্রাপ্ত হইলেই স্বীয় বাল্যসখী দরিদ্র কন্যাগণকে ভুলেন নাই; তাহাদিগের বিপদে আপদে সান্ত্বনা দিয়াছেন, সাহায্য করিয়াছেন এবং স্পষ্ট বলিয়াছেন, ইংলণ্ডের রাণী হইলেও তাহাদিগকে তিনি কখন ভুলিবেন না। এটা বড় কম ঔদার্য্যের পরিচয় নহে। অনেক দরিদ্র কন্যা

চিনিতে পারাও অপমান জ্ঞান করেন এবং নানাপ্রকারে স্বীয় গর্ব্ব চিহ্ন সমস্ত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই বিশাল রাজ্যেশ্বরীর ব্যবহারটা মনে করিলে ভাল হয়।

দয়া ও ক্ষমাগুণের পরিচয় মহারাণীর জীবনে এত অধিক পাওয়া যায় যে, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করা অসম্ভব। তিনি ইংলণ্ডের রাণী হইলে পর একজনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়, তখন সেই আদেশপত্রে রাজ-স্বাক্ষরের প্রয়োজন হইত, এজন্য মহারাণীর নিকট সেই আদেশ-পত্র স্বাক্ষরের জন্য আনীত হয়। মহারাণীর কোমল হৃদয় সে কঠোর আদেশ প্রদানে অক্ষম হইল। তিনি অনেক ভাবিয়া "ক্ষমা করিলাম" লিখিয়া দিলেন। এইরূপ আরও কয়েকটী ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় শেষে নিয়ম হইল, ঐরূপ আদেশপত্রে স্বাক্ষরের আর আবশ্যক হইবে না। আহা! তাঁহার ন্যায় স্নেহের হৃদয় কি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে পারে?

একবার মহারাণী কোনও দরিদ্রা মহিলার মৃত্যু-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া শুনাইতে ছিলেন, পরে ধর্ম্মযাজক আসিলে "তিনিই ইহার উপযুক্ত ব্যক্তি" বলিয়া তাঁহাকে ঐ কার্য্য করিতে দিয়া চলিয়া যান।

বাহ্য-জাঁকজমক মহারাণীর জীবনে আদৌ ছিল না, তিনি তাহা ভালও বাসিতেন না। অনেক সময় তিনি একাকী ভ্রমণ করিতেন এবং দরিদ্র প্রজাগণের সঙ্গে অজ্ঞাতভাবে মিশিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং নানারূপে সমবেদনা প্রকাশ করিতেন।

তাঁহার বিবাহ ব্যাপারেও তাঁহার হৃদয়ের মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজকুমার আলবার্টকে অশেষ গুণসম্পন্ন ও উদার হৃদয় জানিয়া তাঁহার প্রতি তিনি বিশেষ অনুরাগিণী হন; রাজকুমারের চরিত্র বিশেষরূপে জানিয়াই তিনি এরূপ প্রেমবতী হইয়া ছিলেন, এবং তাঁহার সহিত বিবাহিতা হওয়াই তাঁহার একমাত্র ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তথাপি তিনি গুরুজনের আদেশের ও সম্মতির অপেক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতেও তাঁহার চরিত্রের কোমলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা ভালবাসিতেন না। যাহা হউক, যখন তিনি

জানিলেন, এ বিবাহে সকলেই আনন্দের সহিত সম্মতি দিলেন, রাজকুমারও বিশেষ প্রফুল্লচিত্তে স্বীকৃত হইলেন, তখন তিনি নিরতিশয় আনন্দিতা হইয়াছিলেন। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে সতী পবিত্রতার যে সমস্ত লক্ষণ পাঠ করা যায়, মহারাণীতে সে সবই প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "রাজপুত্র আলবার্ট নিষ্কলঙ্ক, দেবোপম চরিত্রবান্, তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি আর তিনি দেখিতে পান না, আলবার্ট অতি উচ্চ, তিনি নিজে অতি তুচ্ছ। আলবার্টের স্ত্রী হইতে পারেন, এরূপ গুণ তাঁহার কিছুই নাই। রাজকুমার তাঁহাকে বিবাহ করিয়া বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ ও অসীম স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সর্ব্ব-প্রযত্নে এমন দেবোপম স্বামীকে সুখী করিতে চেষ্টা করিবেন, কিন্তু তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন, তাহাতে সন্দেহ। আলবার্টকে সুখী করাই তাঁহার জপমালা হইবে, ইত্যাদি প্রকারে স্বীয় পাতিব্রত্য তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। যখন বিবাহের সময় তাঁহারা ধর্ম্মমন্দিরে সমবেত হইলেন, তখন একটা কথা উঠিল যে, ইংলণ্ডের রাণী তাঁহার একজন প্রজা আলবার্টকে (কারণ ভিক্টোরিয়া বংশানুক্রমে রাণী হইলেও তাঁহার স্বামী রাজা নহেন, প্রজাগণ তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। তিনি ইংলণ্ডের একজন অধিবাসী, রাণীর প্রজা মাত্র) কেমন করিয়া বলিবেন যে, তিনি আলবার্টের অধীন থাকিবেন, মান্য করিবেন ইত্যাদি, সুতরাং প্রস্তাব হইল, মন্ত্র ও প্রতিজ্ঞার পাঠের পরিবর্ত্তন করা হউক। রাণী এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "সাধারণ স্ত্রীলোক যেরূপ ভাবে বিবাহিতা হইয়া থাকেন, তিনিও সেইরূপেই বিবাহিতা হইতে চাহেন। ইংলণ্ডের পবিত্র ধর্ম্মমন্দিরের যথানির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারেই তাহা সম্পন্ন হইবে। স্বামী সকল অবস্থাতেই স্ত্রীর পূজনীয়! সাধারণ স্ত্রীভাবে তিনি বিবাহ সম্বন্ধীয় সকল প্রতিজ্ঞাই পাঠ করিতে ইচ্ছুক আছেন।" কি সুন্দর কথা! কি আত্মগৌরব বিসর্জ্জন! তিনি সতী, তিনি তাঁহার আরাধ্য প্রাণের দেবতা স্বামীর নিকট অধীনতা, বাধ্যতা স্বীকার করিবেন না? এই তাঁহার মনের ভাব! ধর্ম্মযাজক প্রতিজ্ঞা পাঠ করাইলেন, ভিক্টোরিয়া বিশেষ আন্তরিকতার সহিত স্বীকার করিলেন। তিনি আলবার্টকে স্বামীরূপে বরণ করিয়া তাঁহাকে মান্য করিতে,

আপদে বিপদে, সুখে দুঃখে তাঁহার সঙ্গিনী হইতে এবং তাহার প্রতি আজীবন অক্ষুণ্ণভাবে অনুরক্তা থাকিতে স্বীকৃতা আছেন। বলা বাহুল্য, এ পবিত্র প্রতিজ্ঞাও তিনি অক্ষুণ্ণভাবে পালন করিয়াছেন, রেখামাত্রও বিচ্যুতি ঘটে নাই।

মহারাণীর বিবাহের জীবন যে কিরূপ স্বর্গীয়সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা কি বলিব! মহারাণীর মতে আলবার্ট অপেক্ষা পবিত্র, মহৎ এবং হৃদয়ের বস্তু আর পৃথিবীতে নাই। একদণ্ড তাঁহার সঙ্গ ছাড়া হইলে, মহারাণী অন্ধকার দেখিতেন, সব তাঁহার নিকট শূন্য বলিয়া বোধ হইত। স্বামী নিকটে থাকিলে তিনি সর্ব্বদা আনন্দসাগরে মগ্ন থাকিতেন। স্বামীর চরণে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া হৃদয় ঢালিয়া কেমন করিয়া তাঁহাকে সুখী করিবেন, এই চিন্তাতেই তিনি অস্থির হইতেন। স্বামীর সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্যই করিতেন না, এমন কি, রাজকার্য্যে পর্য্যন্ত স্বামীর উপদেশ লইতেন এবং কিসে প্রজার কল্যাণ হয়, সে বিষয়ে পরামর্শ করিতেন। রাজকুমারও এমন সাধ্বী স্ত্রী পাইয়া তাঁহার প্রতি যে বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ তাঁহাদের দুই হৃদয়ের যেন মণিকাঞ্চনযোগ হইয়াছিল এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে তাঁহাদের যুগল জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। এদিকে মহারাণী যখন সন্তানের মাতা হইলেন, তখন সন্তানগণের সুশিক্ষা দানের বিষয় তাঁহারা উদাসীন্য অবলম্বন করেন নাই। এত বড় একটা রাজ্যের রাণী হইলেও তিনি ধাত্রীর হস্তে সন্তান পালনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই, তাহাদের শিক্ষাসহবৎ ইত্যাদির বিষয় স্বয়ং লইতেন এবং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। যাহাতে সন্তানগণ বিলাসী অহঙ্কৃত না হয়, সে বিষয় তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সন্তানগণকে কখন জাঁক-জমকের পোষাক পরিতে দিতেন না, কখন কোন অবিনয় দেখিলে তাহা মার্জ্জনা করিতেন না। একবার তাঁহার কয়েকটী সন্তান একটি পরিচারিকার মুখ আমোদ স্থলে কালি দিয়া চিত্রিত করিয়া দিয়াছিলেন, মহারাণী তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ দোষী সন্তানগণকে ডাকাইয়া যুক্তকরে পরিচারিকার নিকট স্বীয় স্বীয় দোষের জন্য রীতিমত ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া তবে ছাড়েন। আমাদের

বিড়াল কুক্কুরের তুল্যই জ্ঞান করে এবং যথেচ্ছ ব্যবহার করে! পরিচারিকার প্রতি অত্যাচার করিলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এটা অনেক মাতার বিশেষতঃ বুড় ঘরের অনেক রমণীর নিকট স্বপ্ন ও কল্পনাতীত ঘটনা! সন্তানিগণকে বাগানের কাজ, অন্যান্য ক্রীড়া ইত্যাদিতে সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন, এবং আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দিতেন। সামান্য সামান্য কাজকর্ম্মে চাকরদের উপর নির্ভর করিয়া থাকা তিনি ভালবাসিতেন না। রাজকন্যা হইলেও কন্যাগণকে রন্ধন, সূচিকর্ম্ম, গৃহস্থিত আসবাবের শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত, গৃহিণীপনা ইত্যাদি বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন এবং যাহাতে তাহারা এ বিষয়ে অনুরাগিণী হয়, সেদিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাহার ফলে কন্যাগণও সকলেই সুগৃহিণী, এবং আত্মম্ভরিতা ও বিলাসিতা-বর্জ্জিতা হইয়াছেন। এইরূপে তিনি মাতৃ-কর্ত্তব্য সর্ব্বথা পালন করিয়াছিলেন।

মহারাণী সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন যে, স্বামীর বিরহযাতনা যেন তাঁহাকে সহ্য করিতে না হয়। কোন্ সতীরমণী সে প্রার্থনা না করেন? কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ বলিয়া তাঁর সে প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। বিংশ বৎসরকাল অনাবিল স্বামী-প্রেম-ভোগ ও স্বামী-সেবা করিবার পর বিধাতার অখণ্ডবিধানে তাঁহাকে স্বামীহারা হইতে হয়। উঃ! সে সময় মহারাণীর পক্ষে কি ভীষণ! মহারাণীর হৃদয়গ্রন্থি যেন ছিন্ন হইয়া গেল! স্বামীর শয্যাপার্শ্বে সতী বসিয়া তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হওয়া পর্য্যন্ত যুক্তকরে ভগবানের নিকট তাঁহার আত্মার কল্যাণ জন্য প্রার্থনা করিলেন, পরে যখন সব ফুরাইল, প্রাণপ্রিয়তম এ নশ্বরলোক পরিত্যাগ করিলেন, তখন মহারাণী লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন—উঃ! সে বেদনার—সে মর্ম্মন্তুদ কষ্টের সতীর বৈধব্য-যন্ত্রণার দৃশ্যের আর বিস্তৃতি কাজ নাই; তাহা সহজেই অনুমেয়। মহারাণী সেই শোকের তরুণ আঘাত সহ্য করিতে বড়ই বেগ পাইয়াছিলেন। শেষে আত্মসংযম ও ভগবানে নির্ভর শীলতার বলে তাহা বাহ্যে সংযত করিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে সে দুর্ব্বিসহ শোকবহ্নি চিরকাল তিনি অনুভব করিয়া গিয়াছেন এবং স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে প্রকৃত হিন্দু বিধবার ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন

গিয়াছেন। বিধবা হইবার পর তিনি কোনও প্রকার আমোদ-প্রমোদে যোগদান করেন নাই, রাজোপযোগী বিলাসাদি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রত্যহ স্বামীর পবিত্রমূর্ত্তি দর্শন এবং ধ্যান তাঁহার নিত্য ব্রত ছিল। জাঁক-জমক কোন দিনই তিনি ভালবাসিতেন না, বিধবা হইবার পর হইতে তো তাহা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এমন কি, ঘরের আস্‌বাবগুলি নূতন রঞ্জিত হইবার সময়ও যদি তেমন উজ্জ্বল রং দেওয়া হইত, তাহা হইলে তিনি তাহা বদ্‌লাইয়া ফেলিতেন।

মহারাণী যে পবিত্রতার আদর্শ ছিলেন, তাহা তাঁহার অনেক কার্য্যে ও কথাতেই বুঝিতে পারা যায়। যখনই স্বামীর নাম মনে করিতেন, তখনই নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিত।

মহারাণীর রাজত্বকালে দেশবিদেশে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে তাঁহার সহানুভূতি ছিল না। তাঁহার মন্ত্রীগণই সেজন্য দায়ী। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রজাগণের প্রাণহানি দেখিয়া তিনি অশ্রুপাত করিয়াছেন, আহত সৈনিকগণের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বৃদ্ধকালে বুয়রযুদ্ধে প্রজাক্ষয় দেখিয়া তিনি যথেষ্ট মনস্তাপ পাইয়াছিলেন, তাঁহার কোমল হৃদয় দুঃখকষ্ট দেখিলেই গলিয়া যাইত এবং তাহা হইতে পবিত্র মন্দাকিনীর পূতধারার ন্যায় সহানুভূতি অশ্রু প্রবাহিত হইত। ভারতের দুর্ভিক্ষে, প্লেগে লোকধ্বংশের সংবাদ শুনিয়া তিনি যেরূপ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় ভাণ্ডার হইতে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ন্যায় হৃদয়েরই উপযুক্ত! সকলেই যেন এ স্থলে একথা মনে রাখেন, তিনি রাণী হইলেও রাজকোষের অর্থ তিনি যথেচ্ছ ব্যয় করিতে পারেন না। সে বিষয় মন্ত্রীগণ ও পার্লামেণ্ট সভার মত ও পরামর্শ লইতে হয়।

যখন তিনি ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করেন, তখন যে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়, তাহা প্রজা সাধারণের ধর্ম্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ না করিয়া জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে গুণের আদর ও সম্মান সুবিচার করা হইবে বলিয়া প্রচার করা হয়, তাহাতে সকলেই বিশেষ সুখী হইয়াছিল। ভারত ও ভারতীয় প্রজাকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। ভারতীয় ভাষা শিক্ষাতেও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল।

তাঁহার পবিত্র জীবনের সদ্‌গুণাবলীর সম্যক আলোচনা করা এরূপ

স্থলে সম্ভব নহে। তিনি আদর্শরমণী, আদর্শজননী, আদর্শসতী এবং আদর্শ রাজ্ঞী ছিলেন। স্বকর্ম্মার্জ্জিত পুণ্যলোকে তাঁহার আত্মা এখন শান্তিলাভ করিতেছে, কিন্তু তাঁহার পবিত্র নাম প্রাতঃস্মরণীয়রূপে চিরকাল সকলের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে এবং তাঁহার আদর্শ জীবনের পুণ্যকথায় অনেক হৃদয় উন্নত হইবে, ইহা নিশ্চিত। আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ এই পুণ্যবতীর গুণাবলীতে স্বীয় স্বীয় হৃদয় স্বীয় স্বীয় সন্তানগণকে ভূষিত করিয়া তাঁহার পুণ্যস্মৃতির সম্মান করুন, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা। শান্তি! শান্তি! শান্তি!!!

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

হোলী।

কবে, কতকাল পূর্ব্বে, শ্রীমথুরা পুরে;
ভাদ্রমাসে, কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী তিথিতে
কংস-নিপাতন হেতু, কংস কারাগারে
শুভক্ষণে হয়েছিল কৃষ্ণ অবতার
নারায়ণ, অংশরূপী শ্রীমধুসূদন?
স্মরণে আসে না তাহা, না হয় নির্ণয়
বহুদূর, নির্ণিবারে দ্বাপরের কথা!
গোকুলে শৈশবলীলা, গোষ্ঠে গোচারণ,
কৈশোরে মধুর ভাবে বৃন্দাবন লীলা—
[redacted] বিবিধ প্রকার!
কৃষ্ণলীলা সারাৎসারা বৃন্দাবন লীলা।
নমি আজি কৃষ্ণপদে প্রেম ভক্তিভাবে!
বাসনা পুরাও কৃষ্ণ! এই ভিক্ষা করি।
গাইব তোমার গীত, মঙ্গল আচরি—
রাধা সহ কেলী কুঞ্জে হোলী নাম যার।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি বসন্ত মধুর,

প্রবাহে মলয়ানিল বাসন্তী পূর্ণিমা ;
চারিধারে ঝিকিমিকি দক্ষসুতাগণ।
হাস্যমুখী বসুন্ধরা, কৌমুদী মাখিয়া
গলে পরি ফুল হার বিতরি সুবাস,
মাতাইতে ছিলা সতী, ভাবুক মানস।
সেই দিনে কৃষ্ণচন্দ্র, সেই শুভদিনে—
দুলে ছিলা মধুকুঞ্জে শ্রীরাধিকা সহ,
সুধাময় সুপবিত্র বৃন্দাবন ধামে।
বৃন্দাবন ; আহা মরি ! চন্দ্রিকা পরিয়া—
কি শোভা ধরিয়া ছিল চিত্ত-বিমোহিনী.
সে শোভা মোহিনী শোভা, মম নেত্রপথে
ধরিয়া দিতেছে যেন আকাশ কুমারী
কল্পনা ; প্রসন্নমুখী দেবী দয়াবতী।

চেতন যমুনা জল, কদম্ব চেতন,
সচেতন গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন শিলা,
চেতন কুঞ্জের রেণু, চেতন লতিকা,
চেতন পাদপাবলী, চেতন পল্লব,
চেতন কুসুমকুল, চেতন বাঁশরী,
চেতন সমগ্র কুঞ্জ ; রাজসমাগমে
যেমন সুন্দর সভা সাজায় মানব,
তেমনি প্রকৃতি [illegible] হাসিয়া,
সাজালেন দেবতা পুণ্য বৃন্দাবনে !
সকলেই কথা কয়, সকলেই হাসে।
প্রহরী বসন্তরাজ, কোকিল নিকর।
এতগুলি এক সঙ্গে মিলিয়াছে হেথা,
আগমনে মধুময়ী বাসন্তী পূর্ণিমা।

পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে প্রথম কৌতুক—
রণরঙ্গে অগ্নিক্রীড়া, মেঢ়াসুর বধ।
চাঁচর তাহার নাম বিখ্যাত সংসারে।

পূর্ব্বদিনে সেই ক্রীড়া করি সমাধান,
পূর্ণিমায় দুলিলেন দোল্ দোল্ দোল্,—
প্রেমময় কৃষ্ণচন্দ্র বেষ্টিত গোপিনী ;
বামভাগে শোভাময়ী বৃকভানু সুতা
শ্রীরাধিকা ; প্রেমময়ী, কৃষ্ণ মনোহরা।
দোলমঞ্চে দুলিলেন কিশোরী কিশোর।
উভয়ে সমান ভঙ্গী, উভয়েই বাঁকা !
দাঁড়াইল অষ্ট সখী মণ্ডল আকারে।
হাস্যাননা ব্রজাঙ্গনা, পিচিকারী হাতে ;
সুবাস আবীরপূর্ণ যমুনার বারি—
বর্ষিছে যুগল অঙ্গে। গিরি মুখে যেন
ঝর ঝর ঝরে ঝরে ঝরণার জল !
লালে লাল, ক্যাসা লাল, শ্রীনন্দ-দুলাল ;
লালে লাল রাসেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা ;
লালে লাল সখীপুঞ্জ, ব্রজের গোপিনী—
কৃষ্ণপ্রেম-পিপাসিনী, রূপে চন্দ্রকলা।
হাসিমুখে বলিতেছে, দুলাইছে দোল,
"রাসেশ্বরী আমাদের আজি দোলেশ্বরী !"
গগনধ্বনিত করি সুমধুর স্বরে—
গাইতেছে হোলীগান মধুর মধুর !
কাঁপাইছে মৃগ চক্ষু, হেলাইছে গ্রীবা,
গাহিছে প্রেমের গীত, নাচিয়া ঘুরিয়া ;
তালে তালে বাজাইছে বসন্ত সমীর ;
শুনিলে মোহিত হয় সবার শ্রবণ !
রূপবতী যত গুলি গোয়ালা কুমারী—
হেসে হেসে ধরিতেছে পরিহাস গীত !
হানিছে রাধারে বাণ, কটাক্ষে ব্যঙ্গিয়া। *
কৃষ্ণকেও হানিতেছে চোখ চোখ শর !

---

* ব্যঙ্গিয়া—ব্যঙ্গ করিয়া।

সবাই আনন্দে পূর্ণ, রসিক-রসিকা,
কানুসনে সকলেই খেলিতেছে হোলী ;
হাসিমুখে বলিতেছে, হোলী খেল হরি !
বড় সাধ আছে মনে, বহুদিন আশা—
খেলিব তোমার সঙ্গে বসন্ত ঋতুতে—
প্রেমখেলা হোলীখেলা, মধুময় প্রেম !
কাল অঙ্গ লালেলাল, রাধিকারমণ !
কি সাজ সেজেছ হরি ! আমরি আমরি !
ওই লালে আরো লাল দিব মিশাইয়া
বলিতেছে ছড়াতেছে শ্রীঅঙ্গে আবীর !
ছুড়িছে কুঙ্কুম কেহ, বাঁকায়ে নয়ন ;
বনমালা লালে লাল, লাল পীতধড়া,
লালে লাল শিখিপুচ্ছ, ঢাকা ভৃগুপদ,
লাল কুঞ্জ, লাল কৃষ্ণ, কুঞ্জ বনমালী !
রসিকের চূড়ামণি, রাখাল কানাই—
হেসে হেসে প্রতিশোধ দিতেছেন তার !
রাধিকা হরিকে দেন, রাধিকারে হরি,
কি মধুর হোলী খেলা, শ্রীকৃষ্ণের দোল !
গোপিকা কৃষ্ণকে দেয়, কৃষ্ণ গোপিকায়,
প্রেমের চূড়ান্ত খেলা, বসন্ত বাসরে !
তাই বলে কৃষ্ণ প্রেম গোপীরাই জানে !
ফুরাল দোলের লীলা, হোলীর বিশ্রাম।
ফলার হইল কিনা, বলে না কল্পনা।
এইত কৃষ্ণের দোল, এ দোলের প্রেমে
আবীরের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম ছড়াছড়ি !
পবিত্র সকল অঙ্গ, দেবতার খেলা,—
প্রেমভাব, ভক্তিভাব, গোপিকা হৃদয়ে
একসঙ্গে বাস করে, তারি পরিচয়
দেখাইল গোপীকারা, শ্রীকৃষ্ণের দোলে !
নিন্দুকেরা নাম দেয়, গোপিনী বিহার !!

বহু বহু গোপবধূ, যুবতী সুন্দরী—
কৃষ্ণপাশে একসঙ্গে ছুটে ছুটে আসে,
এককালে একসঙ্গে জড় হয় সব ;—
কোন প্রেমে আসে তারা, একসঙ্গে মিলে ?
যাচে তারা কোন্ প্রেম, কৃষ্ণ সন্নিধানে ?
কভুনা, কভুনা, কভু সম্ভবে কি তাহা ?
দশমবর্ষের শিশু ইন্দ্রিয়বিলাসী
এ কথা যাহারা ভাবে, বাতুল তাহারা।
সুপবিত্র কৃষ্ণলীলা, সুপবিত্র গাথা,
সুপবিত্র হোলী খেলা, সুপবিত্র রাস।
হায়রে ! এদেশে আজি, সেই হোলী খেলা—
সুনিত্য পবিত্র যাহা, বৃন্দাবন মাঝে,
সেই সুপবিত্র হোলী এদেশে এখন—
কি বিকট ভীমামূর্ত্তি করেছে ধারণ !!
ব্রজবাসীনামধারী, পশ্চিমের যত
হিন্দুস্থানী খোট্টা আছে, এ হোলীতে তারা—
মাখিয়া আবীর অঙ্গে, বাঁধিয়া কোমর,
নাচিতে নাচিতে রঙ্গে, বাজায়ে মাদল—
কত শত গীত গায়, মুখে বলে হোলী,
কিন্তু মুখে কাঁটা খোঁচা বাধেনা তখন !!
যাহা ইচ্ছা, তাহা বলে, অকথ্য খেঁউড় !!
তাহাতেই সবে মত্ত, কৃষ্ণ কথা দূরে !
মথুরার ক্ষত্রকুল উজ্জ্বল রতন—
পুণ্যব্রত বসুদেব দেবকী কুমার,
রাধাকে তাঁহার মামী সাজায় খোট্টারা !
সাজাইয়া ক্ষান্ত নয়, খেঁউড় গান গেয়ে
উচ্চরবে ; মাতোয়ারা, দলে দলে চলে—
বড় বড় রাজবর্ত্মে, বাদ্যভাণ্ড লয়ে
নেচে নেচে গীত গায় ! কি পবিত্র গীত !

এইত পশ্চিমে হোলী! আরো কিছু বলি।
আমাদের জন্মভূমি, ইহ বঙ্গদেশে
কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, পূর্ণিমার দোলে!
যেমন যাত্রার সং, নানা রঙ্গে সাজে,
তেমতি পথিক লোকে নানা রং মেখে—
অবসাদে চলে যায়, চাহেনা পশ্চাতে।
রং মাখা কেহ কেহ প্রেমানন্দে মেতে
হাস্যমুখে হল্লা করে, কতই আহ্লাদ।
কেহ কেহ সং সেজে মুখ ভারী করে!
একদিনে না ফুরায়, পর্ব্ব অবসানে
তিন দিন জের চলে, লোকে সাজে ভূত!
শ্রীকৃষ্ণের হোলী খেলা বঙ্গে এই দশা!!
আবীরের সমাদর আছে অতি কম!
ছাই, মাটী, ম্যাজেণ্ডার কালী জুলী, কাদা,
তারি জলে পিচিকারী, তারি যোগে ছাবা!
ষাঁড় দাগা দেগে দেয়, বেচারা পথিকে!!
নরনারী ভেদাভেদ নাহি করে কেহ!
মেয়েদের দুরবস্থা আরো বেশী করে!!
লজ্জায় মরিয়া যায় বাজারের মেয়ে!
এর চেয়ে বেশী আর বলা ভাল নয়।
কেবল বাজারে মেয়ে, সে কথাও নয়;
গঙ্গাস্নানে কুলবালা রাস্তায় আসিলে,
তাহাদেরো সাজা দেয় ডান্‌পিটে ছোঁড়া!
আরো এক হোলী খেলা হয়েছে রটনা,
সকলের চেয়ে সেটী আরো বেশী ভয়ঙ্কর!
সহরের গলি পথে, কিছু কিছু দূরে,
আবাশের দোতলার বারাণ্ডা হইতে
বিষ্ঠা বৃষ্টি হয়ে থাকে পথিকের গায়!!
ছিছি কি ঘৃণার কথা! পাহারা পুলিশ—
বিপক্ষের কাছে কিছু সেলামীর লোভে,

ধূলাতে ডুবায়ে দেয় রাজার আইন !!
      হায় কি দুঃখের কথা ! বৃন্দাবন-লীলা
নন্দলাল গোপালের বসন্তের দোল,—
নিকুঞ্জ আনন্দময় যে দোলের ভাবে,
সেই দোল কি নরক, এই বঙ্গদেশে !!
আ মল ধর্ম্মের ভাব ভুলিয়াছে সবে,
হর্ষ প্রমোদের ভাব ছাড়িয়া দিয়াছে,
নূতন হোলীর মূর্ত্তি করেছে গঠন,
বিরূপ, কুৎসিৎ, ঘৃণ্য বীভৎস বিকল !
সকলেরি সমভাব, শৃগালের ডাক !
রাজ্যময় হীনপ্রভা হতেছে বিস্তার,
হোলীর প্রকৃত ভাব, কিছু নাহি আর !!
সত্য বটে, কেহ কেহ ভক্তি উপচারে—
দোল দেয় রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দুটিকে ;
জানায় সাত্বিকী পূজা বিতরে আশীষ,—
বিতরে বান্ধবগণে সুখাদ্য বিবিধ,
সঙ্গীত আমোদে করে যামিনী যাপন ;
সত্য বটে ; সত্য, কিন্তু সংখ্যা বড় কম !
      কাঁদিতেছে জন্মভূমি, এই মনস্তাপে !
যাচিতেছে কৃপাবিন্দু, মিনতি করিয়া—
এই আর্য্য সমাজের ভূষণ যাঁহারা,
উদ্দেশে মনের দুঃখে, তাঁহাদের কাছে
এই ভিক্ষা ভক্তিভাবে—আর্য্য পুত্রগণ !
শ্রীকৃষ্ণের হোলী দোল সুপবিত্র কর !
যাহা ছিল, তাহা পুনঃ, ফিরাইয়া আনো ;
ঘুচুক লোকের নিন্দা, ঘুচুক উৎপাত।
কত কত অনাচার মিশিয়াছে দোলে,
ব্রহ্মজ্ঞানী ছেলে বলে অসভ্য পার্ব্বণ !!

জয় জয় রাধাকৃষ্ণ ! জয় বৃন্দাবন !
জয় গোবর্দ্ধন গিরি ! জয় কুঞ্জ ধাম !
জয় কৃষ্ণ প্রবাহিণী কলিন্দনন্দিনী
যমুনা ! গোপিনী জয় ! হোলী পর্ব্ব জয় !
পূর্ব্বাপর হোলী দেখা হইল আমার,
রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণে করি নমস্কার !!

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

নরক দর্শন।

শাস্ত্রের মহিমা অনন্ত। আর্য্যশাস্ত্রে যাঁহাদের বিশ্বাস অটুট, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, জগতের মানবগণকে কোন না কোন প্রকার পাপস্পর্শ করে, সেই পাপে তাহাদিগকে নরক ভোগ করিতে হয়। কলিযুগেই পাপীর সংখ্যা অধিক। কলিযুগের প্রথম রাজা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। যাঁহারা মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে জানেন। যুধিষ্ঠিরের আত্মায় বিন্দুমাত্র পাপস্পর্শ করে নাই। তথাপি ধর্ম্মের শাসন এতদূর যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের প্ররোচনায়, যুধিষ্ঠিরকে সামান্য একটু কপটতার আশ্রয় লইতে হয়; সেই সামান্য পাপে তাঁহাকে চরমে একবার নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল। পাপের শাসন আর্য্য শাস্ত্রে যে প্রকার বর্ণিত আছে, তেমন আর কোন শাস্ত্রেই নাই। এইখানে আজ আমরা আর একটি যুধিষ্ঠিরকে উপস্থিত করিব।

কে তিনি?—মিথিলার রাজা বিপশ্চিৎ। ধর্ম্ম-শাস্ত্রে, ব্যবহার-শাস্ত্রে, যত প্রকার পুণ্য কার্য্যের বিধান আছে, রাজা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় রাজা বিপশ্চিৎ নিত্য নিত্য অবিচ্ছেদে সেই সকল পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন; কোন প্রকার পাপ কার্য্যে তাঁহার মতি যাইত না। তাঁহার দুই মহিষী ছিলেন;—পীবরী আর সুশোভনা। সেই উভয় রাণির মধ্যে সুশোভন পরমরূপবতী, গুণবতী, এবং পুণ্যবতী ছিলেন; রাজা তজ্জন্য তাঁহাকেই অধিক ভাল বাসিতেন; পীবরীর

রাণী অথবা রাজকন্যা হইলে রূপ কিরূপ হয়, সাধারণে তাহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন; রাণী পীবরী অরাণী অথবা অসুন্দরী ছিলেন না; অথচ তাঁহাকে পতির অবহেলা ভোগ করিতে হইত। কারণ এই যে, রাণী পীবরী পার্থিব সংসারের ব্যবহারানুসারে কার্য্যাকার্য্য বিচার করিয়া চলিতেন; রাজাকে তাহা ভাল লাগিত না। সংসারে সকল কার্য্যেই প্রায় কিছু না কিছু অকার্য্যের মিশ্রণ থাকে, রাজা বিপশ্চিৎ সেই জন্য সংসারকে বড় ভয় করিতেন; সেইজন্যই সংসারানুরাগিণী রাণী পীবরীর প্রতি তাঁহার কিছু কিছু অযত্ন ছিল।

জীবনকালের মধ্যে ইহসংসারে রাজা বিপশ্চিতের কেবল ঐ মাত্র পাপাংশ। পূর্ণচন্দ্রে যেমন কলঙ্ক, গঙ্গাজলে যেমন বিন্দুমাত্র শুন মূত্র, রাজা বিপশ্চিতের পবিত্র হৃদয়ে সেই প্রকার ঐ ক্ষুদ্র পাপাংশ। ভারতের ন্যায় ধর্ম্মক্ষেত্র ইহজগতে আর দ্বিতীয় নাই; সেই বিন্দুমাত্র পাপে রাজা বিপশ্চিতের কি ভোগ হইয়াছিল?—একবার মাত্র নরক দর্শন।

রাজা বিপশ্চিতের সংসার লীলা সম্বরণের পর যমালয়ে একটিবার নরক দর্শন হইয়াছিল। ক্ষুদ্র পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইলে যমদূতেরা তাঁহাকে বলিল, আর আপনাকে এখানে রাখিতে আমাদের অধিকার নাই, আপনি স্বচ্ছন্দে স্বর্গধামে গমন করুন। রাজা স্বর্গগমনে উদ্যত হইলে নরকের পাপীরা উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, "মহারাজ! মহারাজ! দয়া করিয়া আর খানিকক্ষণ এইখানে থাকুন; এত যন্ত্রণার মধ্যেও আপনার তুল্য পুণ্যাত্মা দর্শনে আমরা অননুভূত সুখানুভব করিতেছি।"

পুরাণ শাস্ত্রে নরকের যেরূপ বর্ণনা আছে, পাপীগণের নরক ভোগের যে প্রকার ভীষণ চিত্র পরিলক্ষিত হয়, মুদিত নেত্রে তাহা স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প হইয়া থাকে। জ্বলন্ত অনলে উত্তপ্ত তৈল কটাহে পাপী নিক্ষেপ, জ্বলন্ত লৌহ নারী মূর্ত্তিতে ব্যভিচারী পাপীর গাঢ় আলিঙ্গন, কৃমি কুণ্ডে নারকী পাপীর মস্তকে লৌহ মুষলাঘাত, বিষ্ঠাকুণ্ডে পাপী লোকের অবগাহন, ইত্যাকার ভীষণ ভীষণ নরকদণ্ড সর্ব্বজনের ভয়প্রদ। নরকবাসী কোটি কোটি পাপীর ঐ প্রকার নিদারুণ নরক যন্ত্রণা, নিদারুণ বিকট চীৎকার!

নরকবাসী পাপীগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া রাজা বিপশ্চিৎ স্থির

পরিত্রাণ এবং বিপন্নের সহায়তা. এই তিনটি কার্য্য সংসারের পরমধর্ম্ম। ইহারা মহাবিপন্ন, আমি এখানে থাকিলে ইহারা সুখী হইবে, কেন আমি তবে এই সকল বিপন্নের সুখের আশা হরণ করিব?—মনে মনে এইরূপ তর্ক করিয়া, যমদূতগণকে রাজা বলিলেন, আমি স্বর্গে যাইব না। নরকেই থাকিব। আমি নরকে থাকিলে এত লোক যদি সুখে থাকে, তাহা অপেক্ষা সৌভাগ্য কি? নরকেই আমি থাকিব, কোটি কোটি লোককে যন্ত্রণানল হইতে রক্ষা করাতে যে সুখ, স্বর্গে কেন, তাদৃশ পবিত্র সুখ ব্রহ্মলোকেও নাই। অতএব আমি স্বর্গে যাইব না, ইহাদিগকে নিরাশ করিয়া স্বর্গে আমি সুখ পাইব না, ইহাদের উপকারের জন্য নরকেই আমি থাকিব।

রাজা বিপশ্চিতের এই সংকল্পের কথা ধর্ম্মরাজের শ্রবণগোচর হইল। দেবরাজ ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া ধর্ম্মরাজ স্বয়ং রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন; বিনীতভাবে রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! স্বর্গে চলুন; দেবরাজ পুরন্দর স্বয়ং আপনার জন্য পুষ্পকরথ আনয়ন করিয়াছেন, আপনি অখণ্ড পুণ্যাত্মা, সেই বিমানে আরোহণ করিয়া আপনি স্বর্গে গমন করুন। চরমে পুণ্যাত্মার বাসস্থান স্বর্গ।

রাজা কহিলেন, কোটি কোটি প্রাণী এখানে দুঃসহ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, ইহারা বলিতেছে, আমি এখানে থাকিলে ইহাদের কষ্ট লাঘব হইবে; অতএব আমি নরকেই থাকিব; ইহাপেক্ষা স্বর্গে আমার কি সুখ?

ইন্দ্র বলিলেন, মহারাজ! সংসারে সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। ইহারা পাপী, পাপকর্ম্ম ফলে ইহারা নরকবাসী হইয়া অহরহ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; পাপক্ষয় না হইলে ইহাদের পরিত্রাণ নাই। আপনি পুণ্যাত্মা, আপনি স্বর্গে চলুন।

রাজা বিপশ্চিৎ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, দেবরাজ! ধর্ম্মরাজ! আপনারা বারম্বার বলিতেছেন, আমি পুণ্যাত্মা। সংসারে আমি এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে, আপনারা আমাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন? এত লোককে কাঁদাইয়া কদাচ আমি স্বর্গে যাইব না; ইহাদের সুখের জন্য নরকেই আমি বাস

আমার কিছুমাত্র পুণ্য ফল সঞ্চিত থাকে, এমন আপনারা জানেন, তাহা হইলে সদয় হইয়া এই নরকবাসী বিপন্নগণকে সেই পুণ্যফলের অংশ প্রদান করুন; ইহারা নরকমুক্ত হউক; ইহাদিগকে নিষ্পাপ করিয়া, ইহাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া, স্বর্গগমনে আমি প্রস্তুত হইব, নতুবা নহে।

ইন্দ্র, ধর্ম্ম, উভয়েই একবাক্যে কহিলেন, মহারাজ, নরকবাসী পাপীলোক পাপ নির্ম্মুক্ত হইল; আপনার পুণ্যবলে ইঁহারাও স্বর্গবাসী হইবে।

রাজা সুখী হইলেন। অন্তরীক্ষ হইতে রাজার মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি হইল। অসংখ্য পাপীকে সঙ্গে লইয়া, গলদেশে দেবমাল্য ধারণ পূর্ব্বক স্বর্গীয় বিমানারোহণে, রাজা বিপশ্চিৎ পরমসুখে স্বর্গধামে গমন করিলেন।

আমাদের শ্লাঘা। নিঃস্বার্থ পরোপকারের কত মহিমা, ভারতে পুণ্যবান্ আর্য্য মহাপুরুষেরাই তাহা জানিতেন। এখনও প্রকৃত ধর্ম্মভাবের আদর যদি কিছু থাকে, এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতক্ষেত্রের আর্য্য সন্তানের হৃদয়ক্ষেত্রেই তাহা আছে; মর্ত্ত্য জগতের কুত্রাপি আর এপ্রকার পবিত্র ধর্ম্মভাব নাই।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

বসন্ত এবং প্লেগে গোবসন্ত বীজের টীকার উপকারিতা।

বাঙ্গালা টীকার প্রচলন কেন রহিত হইল?

মনুষ্য-জীবনে বসন্তরোগ প্রায় একাধিকবার হয় না। সত্য বটে, কোন কোন ব্যক্তি একাধিকবার বসন্তরোগাক্রান্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি বিরল; সহস্রের মধ্যে একজন। প্রকৃত বসন্তরোগ অতি ভীষণ। ইহার আক্রমণ অধিকাংশ স্থলেই মারাত্মক। এই সাংঘাতিক পীড়ার আক্রমণ নিবারণ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে আমাদের দেশে বাঙ্গালা টীকা প্রচলিত ছিল। মনুষ্য-দেহোৎপন্ন সুবসন্তবীজ দ্বারা যে টীকা দেওয়া হইত, তাহাই বাঙ্গালা টীকা; ইহার ইংরাজী নাম small pox inoculation. এই বাঙ্গালা টীকা বসন্তরোগের মারাত্মক আক্রমণ

বসন্তরোগ সংক্রামক,—ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। স্বাভাবিক বসন্ত রোগ এবং সুবসন্ত বীজের বাঙ্গালাটীকা-সমুদ্ভূত বসন্তরোগ,—উভয়ই এক। সুতরাং প্রকৃত বসন্তরোগ এবং বাঙ্গালা টীকা সমুৎপন্ন বসন্তরোগ উভয়ই সমান সংক্রামক। বাঙ্গালা টীকা দ্বারা যে বসন্ত রোগ হয়, তাহাতে সংক্রামকতা দোষ সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে। এই কারণে কোন গ্রামে যখন কোন এক ব্যক্তি বাঙ্গালা টীকা লইতেন, তখন তাঁহার সহিত সেই গ্রামস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই টীকা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেন। এই রূপ না করিলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির শরীর হইতে অপরাপর লোকের দেহে বসন্তরোগ সংক্রামিত হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা থাকিত। অনেক স্থলে এইরূপ দুর্ঘটনাও প্রায় ঘটিত। বসন্তরোগে যেরূপ কঠোর নিয়ম পালন এবং পবিত্রভাব ও শুদ্ধাচার অবলম্বন আবশ্যক, বাঙ্গালাটীকা গ্রহণ কালেও তদ্রূপ কঠোর নিয়মাদি পালন প্রয়োজনীয়। প্রকৃত বসন্তরোগের ন্যায় বাঙ্গালা টীকায় সমুৎপন্ন বসন্তরোগও শারীরিক অবস্থা ভেদে কখনও সুবসন্ত কখনও কুবসন্তে পরিণত হয়। এই প্রকার নানাবিধ বাধা বিঘ্ন, বিপৎসমাকুল বলিয়া বাঙ্গালাটীকার প্রচলন অধুনা রাজকীয় দণ্ডবিধি অনুসারে রহিত হইয়া গিয়াছে।

গো-বসন্ত বীজের টীকার প্রচলন এবং তাহার উপকারিতা।

গো জাতির এক প্রকার বসন্ত হয়। এই বসন্ত বীজ কোন মনুষ্য-শরীরে প্রবেশ করিলে তাহার প্রায় বসন্ত হয় না। কখনও কখনও বসন্ত হয় বটে, কিন্তু তাহা সুবসন্ত। তাহাতে জীবন নষ্ট হয় না। মহাত্মা স্যার উইলিয়াম জেনার এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া বসন্তরোগে গোবীজের উপকারিতার কথা প্রকাশিত করেন। সেই সময় হইতে গোবসন্তের বীজ দ্বারা মনুষ্য শরীরে টীকা দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ইহাই আমাদের দেশে প্রচলিত আধুনিক ইংরাজী টীকা অথবা Vaccination (ভ্যাক্‌সিনেসন্)। এই গো বীজ এক মনুষ্য শরীর হইতে অন্য মনুষ্য শরীরে কিম্বা গো শরীরেও বপন করা যায়। ইংরাজী টীকাও

ইংরাজী টীকা বা ভ্যাক্‌সিনেসন্ হইবার পরও কোন কোন লোক বসন্তরোগাক্রান্ত হন,—এই কারণে অনেকে বিবেচনা করেন যে ভ্যাক্‌সিনেসন্ দ্বারা বসন্তরোগের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না; এই প্রকার ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক তাহা বলাই বাহুল্য। প্রকৃত বসন্ত রোগ হইবার পর বা ইংরাজী টীকা লইবার পরও সহস্রের মধ্যে দুই এক জন ব্যক্তিকে পুনরায় বসন্তরোগাক্রান্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ লোকই যখন ভ্যাকসিনেসন্ দ্বারা বসন্তরোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতেছেন, তখন ইংরাজী টীকা অর্থাৎ ভ্যাকসিনেসন্ যে বসন্তরোগের আক্রমণ নিবারণক্ষম, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অধিকাংশ স্থলে যাহা সত্য ও প্রমাণীকৃত, তাহাই গ্রাহ্য; দুই এক স্থলে যাহা সত্য, তাহা কখনই গ্রহণীয় নহে।

যাঁহাদের ভ্যাক্‌সিনেসন্ হয় নাই, তাঁহারা প্রায়ই কুবসন্তে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভ্যাক্‌সিনেসন্ হইলে প্রায় বসন্ত হয় না; যদি হয়, তাহা সুবসন্ত হইয়া থাকে। এবং তদ্দ্বারা জীবন নষ্ট হয় না। ইংরাজী টীকা গ্রহণ করিলে বাঙ্গালা টীকা গ্রহণকালীন কঠোর নিয়মাদি পালনের প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালা টীকার ন্যায় ইংরাজী টীকা সংক্রামক নহে। ভ্যাকসিনেসনে ভয়ের কোন কারণ নাই। সকল ব্যক্তিই নির্ভয়ে গোবীজের টীকা লইতে পারেন; ইহাতে আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই। কোন ব্যক্তির শরীরে গোবসন্তের বীজ প্রবিষ্ট হইবার পর অর্থাৎ ভ্যাক্‌সিনেসন্ হইলে যদি টীকা না উঠে, তাহা হইলে সেই বৎসর বসন্তরোগের বীজ তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া কোন প্রকার ক্ষতি করিতে পারিবে না বুঝিতে হইবে। সুতরাং স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভ্যাক্‌সিনেসনে কোন বিপদ কিম্বা ভয় তাই, পক্ষান্তরে যথেষ্ট সুবিধা আছে।

জীবনে একবার টীকা লইয়া নিশ্চিন্ত থাকা নিতান্ত ভ্রম। শারীরিক পরিবর্ত্তনের সহিত গোবীজের টীকার বসন্তরোগাক্রমণ নিবারণ করিবার শক্তিও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মধ্যে মধ্যে নূতন টীকা লওয়া উচিত। কলিকাতা ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে বহু বসন্ত রোগী চিকিৎসার্থ নীত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যাহাদিগের কোন প্রকার টীকার দাগ নাই, তাহাদিগের ভিতরই মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। যাহাদের শরীরে কোন প্রকার টীকার দাগ কিম্বা বসন্তের দাগ উত্তমরূপ চিহ্নিত দেখা যায়,

তাহাদের বসন্ত সুবসন্ত এবং তাহা কখনও মৃত্যুর কারণ হয় না। যে কোন ব্যক্তি উক্ত হাঁসপাতালে আসিয়া অনুসন্ধান লইতে পারেন। বাল্যকালে টীকা হইলেও যৌবনে পুনরায় টীকা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এক-বার টীকা লইয়াছি; আবার কেন টীকা লইব—এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া অনেক মনুষ্য বসন্তরোগাক্রান্ত হইয়া অসময়ে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ন্যূনকল্পে প্রতি পাঁচ বৎসর ব্যবধানে একবার টীকা লওয়া উচিত। প্রতিবৎসর টীকা লইলে সমস্ত ভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

অনেক স্থলে এরূপ দৃষ্ট হয় যে, একই বীজে একজনের টীকা সম্পূর্ণ উঠিল, অন্য এক ব্যক্তির কিছুই উঠিল না। যে ব্যক্তির টীকা উঠিল না, তাহার সে বৎসর বসন্তরোগাক্রান্ত হইবার আদৌ সম্ভাবনা নাই বুঝিতে হইবে। বসন্তরোগের প্রবল প্রাদুর্ভাবের সময় সকল ব্যক্তিরই টীকা লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাঁহাদের সেই বৎসর বসন্তরোগা-ক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা তাঁহারা এই প্রক্রিয়া দ্বারা অবগত হইতে পারিবেন।

গোবীজ দ্বারা প্লেগাক্রমণ নিবারণ।

গোবসন্তবীজের টীকা অন্ততঃ এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্লেগরোগের আক্রমণ নিবারণ করিতে সমর্থ—ইহাই আমার ধারণা। কলিকাতায় যে বৎসর প্লেগ এপিডেমিক হয়, সে বৎসর যাঁহারা গোবসন্ত বীজের টীকা লইয়া ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্লেগ হয় নাই; এ বিষয়ে আমি বিশেষ অনুসন্ধানের পর এ ধারণায় উপনীত হইয়াছি। চিকিৎসক মহোদয়গণ এই বিষয় অনুসন্ধান করিয়া আমার ধারণার সত্যাসত্যতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিলে জনসাধারণ বিশেষ উপকৃত হইবেন।

যে বৎসর কোন সংক্রামক রোগের বীজাণু কোন শরীরে প্রবেশ করে, সে বৎসর সেই শরীরে অন্য কোন সংক্রামক রোগের বীজাণু প্রায় প্রবেশাধিকার লাভ করে না, ইহাই শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের অভি-মত। এক প্রকার রোগের বীজাণু অন্য প্রকার রোগের বীজাণুর সহিত এক শরীরে একই সময়ে প্রায় পরিদৃষ্ট হয় না। যে জীবাণু দ্বারা রক্ত মাংস প্রভৃতি পচিয়া যায়, তাহা দ্বারাই যক্ষ্মা ও ক্যান্সার রোগের উপ-কার হয়। ইহাদের ইংরাজী নাম Germs of Pucri feiation.

প্লেগের টীকা লইলে যেমন অন্ততঃ তিন মাস কাল প্লেগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না, প্লেগের সময় গো বসন্তবীজের টীকা লইলেও তদ্রূপ প্লেগ হইবার সম্ভাবনা দূর হয়।

আমরা প্রতি বৎসর গোবীজের টীকা লইয়া থাকি; ইহাতে আমাদের কোন প্রকার কার্য্যের ক্ষতি বা শারীরিক অনিষ্ট হয় না এবং আমাদের মনেও দৃঢ় বিশ্বাস সর্ব্বদা বদ্ধমূল থাকে যে, আমাদের বসন্ত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমার কোনও রোগীর, গোবীজের টীকা লইবার পর প্লেগ হয় নাই। যদি কোন ব্যক্তি গোবসন্তবীজের টীকা উত্তমরূপে উঠিবার পর এক বৎসর মধ্যে কাহাকেও প্লেগাক্রান্ত হইতে দেখিয়া থাকেন, তবে সে বিষয় আমায় সবিশেষ অবগত করিলে আমি অতীব উপকৃত হইব।

শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম, ডি।

কিম্ভূত-কিমাকার।

(জন্মভূমির ৫৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতের পর।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সদর রাস্তার চৌমাথা।

(রামচরণ ও হারাধনের প্রবেশ।)

রাম। কিহে, এত ব্যস্তত্রস্ত হয়ে কোথা ছুটেছ?

[হারাধনের হস্তধারণ।

হারা। না ভাই, এখন আমার কথা কবার সময় নাই। আমায় একবার উকিলের বাড়ী যেতে হবে, সে আবার দশটার মধ্যে বেরিয়ে যাবে।

রাম। তোমার আবার কিসের মোকদ্দমা হে?

হারা। পরে বল্‌ব, এখন ছেড়ে দাও, আমি যাই।

রাম। (ঘড়ি দেখিয়া) এই ত সবে আট্টা, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

হারা। তোমার ভাই ঘড়ি নয়, ওটা কচ্ছপ। বাঙ্গালীর ঘড়ি, দেখ্বার জন্য—দেখ্বার জন্য নয়। তোমাদের টাকা যেমন কচ্ছবদ্ধ থাকে, ওটাও সেইরূপ কচ্ছগত হওয়া উচিত।

রাম। আচ্ছা ভাই, আমরা বাঙ্গালী—তুমি সাহেব। এখন মোকদ্দমাটা কিসের বল?

হারা। কতকগুলা ছোটলোকের মেয়ে আমার পরিবারকে গালি দিয়েছে।

রাম। তাই মানহানির নালিস্ কর্তে যাচ্ছ নাকি?

হারা। ক'র্ব না?

রাম। ছি, ছি, ও কাজ ক'র না, কিল খেয়ে কিল চুরিই ভাল।

হারা। বাঙ্গালীর রক্ত এতই ঠাণ্ডা বটে!

রাম। ভাই, সাহেবের পোষাক পর্লেই কি সাহেব হওয়া যায়? ও পোড়াকাঠের রং টুকু ঢাক্বে কিসে?

হারা। তার বেশ উপায় আছে, দুচারবার বিলাত যাত্রা ক'র্লেই খাদ কেটে যাবে।

রাম। সহজে ত নয়, বিলাতে ব'সে চারি পুরুষে কুরুচ্ খেলে যদি কিছু হয়; তোমার কন্যা যদি গোরা ভজে, পুত্র গোরা মিসে মজে, নাতির পুতি হ'লে যদি রঙে মিস্ খায়।

হারা। তাও কি ভাল নয়? আমাদের পুত্র না হয় পৌত্র, পৌত্র না হয় প্রপৌত্রও ত জেন্টুইন্ জন্বুল্ হ'তে পার্বে, এটা কি স্পর্দ্ধার কথা নয়?

রাম। ওহে সাহেব, তোমাদের সে সকল পৌত্র প্রপৌত্রের সহিত ভারতের আর কি সম্বন্ধ থাক্বে? তারা কি ভারতের পানে চেয়ে দেখ্বে? তারা কি কামদেব পণ্ডিতের সন্তান, রামেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান ব'লে আপনাদের পরিচয় দিবে? না কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ প্রভৃতি গোত্রের সহিত সম্পর্ক রাখ্বে? তারা সব হয়ে যাবে Mr. এখন বাড়ী ফিরে যাও, যা বল্লেম, বেশ ক'রে বুঝে দেখগে যাও।

[প্রস্থান।

হারা। Chained dog! দেশাচারের দাস! আমায় আবার উপদেশ দিতে চায়! এই সঙ্কীর্ণচেতা Conservativeগুলা শিকল-বাঁধা কুকুরের গতি,

য়া কিছু অপরিচিত, যা কিছু নূতন দেখ্‌বে, অমনি ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠ্‌বে! অ্যাঁ! ও আবার কারা? আঃ! আবার সেই কদাকারা মাগীরা জ্বালাতন কর্‌তে আস্‌ছে।

হাড়িনীগণের প্রবেশ, নৃত্য ও গীত।

মানের কান্না কেঁদ না আর, মান থাকে কি মান করিলে?
অভিমানে অপমান, মান অপমান সহিলে।
এখনো গো মান আছে,
যার হাঁড়ি তার কাছে,
হাঁড়ি ভেঙ্গে ছড়িয়ে যাবে, মানহানির নালিশ যুড়িলে।

হারা। Infernal Bitch! (প্রহারোদ্যত।)

১ম হাঁড়িনী। কি সাহেব, মার্‌বে নাকি?

২য় হাঁড়িনী। বল দেখি চাঁদবদন, কালা গোরা হ'লে কি কারণ?

৩য় হাঁড়িনী। কালাচাঁদ মার্‌বে নাকি? ও গোরাচাঁদ মার্‌বে নাকি?

সকলে। মার্‌ব দেখি, মার দেখি!

[হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ও হারাধনের পশ্চাদ্ধাবন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ময়রাবিবিদের BOUDOIR.

ঈশাবালা কলে সেলাই করিতেছে ও ঝালাফালা পশম বুনিতেছে।

Mr. M. M. মাসচটক এলেম্‌ বাগীশের প্রবেশ।

মাসচটক। Good Morning Mrs ভাবন বিশ!

ঝালা। Good Morning sir, আমরা এইমাত্র আপনার কথাই কহিতেছিলাম।

মাস। কেবল তুমি আর Mrs ভাবনবিশ? না আরও কেহ?

ঝালা। আপনার সেই আরও কেহ না হ'লে, প্রাতে উঠেই আপনার মুখ আর কে পাড়িবে?

মাস। Oh yes yes! I am very glad to hear it. (ঈশাবালার নিকটে গিয়া) Good Morning sweet Isabel! (একখানি chair টানিয়া লইয়া ঈশাবালার পার্শ্বে উপবেশন।)

(ঝালাফালা কর্ত্তৃক ঘণ্টা নিনাদন ও ভজহরি খানসামার প্রবেশ।)

ভজা। ঘণ্টায় ঘা দিলে কেনে?

মাস। এখনকার কালে এ প্রকার অসভ্য চাকর আর চলে না।

ঈশা। But he is very honest.

মাস। Excuse me sweet Isabel, honesty is another word for stupidity.

ভজা। মশাই, আমায় ষ্টুপিট্ ব'লে গালি দিলে কেনে?

ঝালা। যা, যা, তুই এখন চা আন্‌গে যা।

এলেম্ বাগীশের গীত।

চীন হ'তে এলি চা
চীনে পুনঃ চলে যা
পথ চিনে যাবে ফিরে ফিরিসুনির্ক আর।
ভারতে মহিমা তোর হবে না বিস্তার।
মুটে মজুর ভজে তোরে,
বামুনেরা ঘৃণা করে,
বামুনের মুখে আগুণ জ্বল্‌বে না কি আর?
চীনের চীনী চুনে নিল,
ছানা ক্ষীরে মিসাইল,
চিনিলনা তোরে তারা এ কি অবিচার।
বামুনগুলা না মরিলে,
টিকি ফোঁটা না ঘুচিলে,
বৈজ্ঞানিক আহারের হবে না প্রসার।

ঝালা। Excellent!

ঝালা। But unfortunately play on words is now a days looked upon as puerile witticism.

(চা লইয়া ভজহরির প্রবেশ।)

ঝালা। (পরীক্ষা করিয়া) আরে, আজ একি রকম চা করেছিস্? না হয়েছে মিষ্টি, না হয়েছে রং—কিছু হয় নাই।

ভজা। ব'লে ফ্যালালে কিছুই হয় নে। আরে কিছু হবে কেমন ক'রে, একসের জলে এক কাঁচ্চা দুধ, আর আধ পয়সার বাতাসায় কত রং, কত মিষ্টি হবে?

ঝালা। হাঃ হাঃ! ও কে Stupid বলে কে?

ভজা। সাহেব বাবু, ষ্টুপিট বলা তোমাদেরই সাজে।

ঝালা। যা, যা, তুই এখন যা।

ভজা। যাচ্ছি ঠাকরণ, যাব না ত কি!

[প্রস্থান।

(সকলের চা পানান্তর)

ঝালা। এলেম্‌বাগীশ মহাশয়, আমাদের ঈশাবালা গান শুন্‌তে বড় ভালবাসে।

মাস। আমি যাহা ভালবাসি, ঈশাবালা তাহাই ভালবাসে, হাঃ হাঃ, ভালবাসার লক্ষণই এই। এখন একটা গান কর্‌তে হবে? তবে শুন—

গীত।

ঈশাবেল মতিয়াবেল প্রেয়সী আমার,
হেন রূপরাশি বল আছে আর কার?
রূপ-জ্যোতি রবি ভাতি,
অথবা চর্ব্বির বাতি,
স্বাতীনক্ষত্রের নীরে জনম উহার,
কজ্জাসম ঝিনুকখানি জননী যাহার।

ঝালা। মাসচটক মহাশয়, এ গীতটি কি আপনার রচিত?

মাস। কেন বল দেখি, গানটী কি ভাল হয় নাই?

না গেলে খুঁজিয়া পাওয়া ভার। আচ্ছা এলেম্‌বাগীশ মহাশয়, "কজ্জাসম ঝিনুকখানি" জননী কাহার?

মাস। স্বাতীনক্ষত্রের নীরে জনম যাহার—অর্থাৎ মুক্তার, মুক্তা এখানে ঈশাবেল—বিমল মতি বা মতিয়াবেল। আমার প্রত্যেক গানে গূঢ় মানে থাকে, আর উপমার উপমা Double উপমা থাকে।

ঝালা। সুন্দর! অতি সুন্দর উপমা, কজ্জাসম ঝিনুকখানি মুক্তারূপা ঈশাবালার জননী। অতি সুন্দর, বড়ই সুন্দর—বড়ই রুচিকর।

মাস। My dear Mrs হাবনবিশ, তোমার ভাবানুভাবকতার বড়ই অভাব। প্রাচীন কবি ভবভূতি কি বলিয়াছেন জান? তিনি বলিয়া গিয়াছেন——

নির্ভয়ে লিখিব কাব্য আপন ইচ্ছায়,
কাব্য ও কামিনী কভু নিন্দা না এড়ায়।

(সদারঙ্গের প্রবেশ।)

ঝালা। একি! পাগ্‌লা এখানে কেন?

সদারঙ্গের নৃত্য ও গীত।

টিয়া ডাকে টিয়া টিয়া, পাপিয়া পিয়া পিয়া,
চড়িক্ ডাকে চিড়িক চিড়িক, সালিক কিঁয়া কিঁয়া।
পাপিয়া পিয়া পিয়া॥
কি ভাবে কি গায় তারা,
শ্রোতা সবে দিশেহারা।
পাখী-কবি গান করে ভাবেতে মাতিয়া,
পাপিয়া পিয়া পিয়া॥

(গীতান্তে)

সদা। বাবা, তুমিও কি বাঙ্গালার একটী কবিকপোত? তাই এত নির্ভীক? আজকালকার বাঙ্গালায় কবি এক একজন এক একটী কবিতার নায়াগারা, অনবরত কবিতা উদ্গার ক'রে সাহিত্য ক্ষেত্রটা হাজিয়ে দিলে। তারপর আবার গুপ্তকবির লুপ্তকাব্যের উদ্ধার—লোকে আইবড় মেয়ে লয়েই ব্যতিব্যস্ত—আবার বিধবার বিয়ে! বাবা, কবিতা কি তাই

গীত।

হৃদয় মথিত হলে যে সুধা উপজে,
তাহাই কবিতা তাহে প্রাণমন মজে।
কবিতা দুর্ল্লভনিধি,
জনমে কি নিরবধি,
নিরবধি জনমে কি গজমতি গজে ?

[গান করিতে করিতে প্রস্থান।

মাস। Come sweet Isabel, এখন আমরা পার্কে একটু বেড়াইয়া আসি চল। দ্বারদেশে আমার ব্রুহাম তোমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে।

ঈশা। না, এখন না।

মাস। No denial, no excuse my love,

ঝালা। You take undue liberty with my sister Mr মাসচটক !

মাস। Liberty, Equality andlove. আধুনিক সমাজের মূলমন্ত্র।

ঝালা। আপনার এ প্রকার আচরণ ভদ্রোচিত নয়।

ঈশা। উনি কি অন্যায় আচরণ করিয়াছেন ? দিদি, আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম, তুমি একজন Gentlemanএর্ অবমাননা করিলে ?

ঝালা। ভগিনি, তুমি এলেম্‌বাগীশের পক্ষপাতিনী হইয়া সাম্যবাদের অবমাননা করিলে,—

"When Adam delved and Eve span,
Who was then the gentleman ?"

ঈশা। Sister you are growing (intolerable) আর আমি এখানে থাকিব না।

[প্রস্থান।

মাস। "প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থাকিয়া আর ফল কি ? এখন আমি আসি, good bye.

[প্রস্থান।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

BENGAL LIBRARY
27 JUN 13
WRITERS BUILDINGS
73/H 563
Bs 525
28/11/07.

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক পত্র।)

অষ্টম বর্ষ। } ১৩০৭ সাল, চৈত্র। { ৯ম সংখ্যা।

ভক্তি।

ভক্তি মনুষ্যমণ্ডলীর একটী উৎকৃষ্ট বৃত্তি। এই বৃত্তি দ্বারা মনুষ্য অন্যান্য জীবগণ অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করে। আমরা সর্ব্বদা কহিয়া থাকি, প্রভু-ভক্তি, রাজ-ভক্তি, পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি গুরুভক্তি, ঈশ্বরে ভক্তি ইত্যাদি। কিন্তু ভক্তি এই শব্দের ভিতর কি যেন একটী ভাব নিহিত আছে। আমরা দেখিতে পাই যে, কর্ত্তব্যানুষ্ঠান ব্যতীত আরও যেন কিছু অনুষ্ঠান বাকী রহিয়াছে। যাহা দ্বারা ভক্তি এই ভাবটীকে সম্পূর্ণ করে, সেই ভাবটী কি, তাহা বিশদরূপে বুঝান বড় সহজ নয়। অথচ তাহা না থাকিলে ভক্তির আভ্যন্তরিক ভাবটী যেন অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। এখন দেখা যাউক, সেটি কি? মনে করুন, কেবলমাত্র কর্ত্তব্য পালন করিলে, কি তাহাকে কেহ ভক্তি বলিবেন? যদি পিতা-মাতাকে ভরণ পোষণ করা যায়, তাহা হইলে কি ভক্তি করা হইল? বা তাঁহারা যাহা করিতে বলেন, তাহা করিলেই কি ভক্তি করা হইল? আমার বোধ হয়, শুধু তাহা করিলে ভক্তি ভাবটী সম্পূর্ণ হইল না। প্রত্যহ পাঠাভ্যাস করিলেই কি শিক্ষককে ভক্তি করা হয়? রা— রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিলেই কি রাজভক্তি প্রদর্শন করা হইল? তবে কিসে ভক্তি করা হয়, অর্থাৎ এই বৃত্তির সম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়? যদি বল, নাম-সাধনই ভক্তির মূলমন্ত্র, তাহা হইলে দেখা যাউক, নাম সাধন কি, নাম সাধন কি শুধু পুনঃ পুনঃ নাম উচ্চারণ, না অপর

কিছু? তবে সাধন যাহাকে বলে, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে উচিত। নতুবা ভক্তি কাহাকে বলে, আমরা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। ভক্তির মূলমন্ত্র কি এবং কোথায়, ইহা বুঝাইবার পূর্ব্বে আমি একটী গল্প দ্বারা পাঠকদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইতে চেষ্টা করিয়া দেখি। তাহা দ্বারা কতদূর কৃতকার্য্য হইব, বলিতে পারি না। হয়তো আমার নিজের ভাবের ভ্রম থাকিতে পারে, আমি দেখিতে পাইতেছি না। সহৃদয় পাঠকগণ দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব। গল্পটী এই ;—

জনশ্রুতি আছে, মহারাজ নবদ্বীপাধিপতির দুই পুত্র ছিল—শিবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র। এই দুই জন সহোদর ভ্রাতা নহেন। ইহারা পরস্পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। রাজা সর্ব্বদা শিবচন্দ্রের সুখ্যাতি করিতেন। একদা শিবরাত্রিতে রাজা শম্ভূচন্দ্রের মাতার নিকট শিবচন্দ্র-সম্বন্ধে এরূপ সুখ্যাতি করিতেছিলেন। তাহা শুনিয়া রাণী দুঃখিত হইয়া মহারাজকে কহিলেন, "প্রভু! আমি আপনার মুখে সর্ব্বদা শিবের কথা শুনিতে পাই, কিন্তু শম্ভুর কথা কখন শুনি নাই, ইহার কারণ কি? শম্ভু কি আপনার অবাধ্য, না আপনার আজ্ঞাপালন করে না, বা কখন আপনাকে কোন প্রকারে অভক্তি বা অসম্মান করিয়াছে? এমন কখন ঘটে নাই, যাহাতে আপনি কোন কারণে তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তবে কি কারণে তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন? কি কারণেই ব আপনি পুনঃ পুনঃ শিবের সুখ্যাতি করেন, ইহা আমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না।" রাজা বলিলেন,—"আমি তোমাকে এখন দুজনের বিশেষত্ব দেখাইব।" এই বলিয়া মহারাজ দাসীকে আজ্ঞা করিলেন, শম্ভুচন্দ্রকে ডাকিয়া আন। দাসী, শম্ভুকে গিয়া কহিল, "মহারাজ আপনাকে ডাকিতেছেন।" শম্ভু কহিলেন, "দাসী! মহারাজকে গিয়া বল, আমি শীঘ্রই যাইতেছি। কহিও, আমি শিবপূজা করিয়া শিবের অর্ঘ্য সংস্থাপন করিতেছি, পূজা সাঙ্গ করিয়া অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিব।" দাসী প্রত্যাগত হইয়া রাজাকে ঐ সংবাদ দিল। রাজা তখন কোন কথা না বলিয়া দাসীকে শিবচন্দ্রকে ডাকিতে আজ্ঞা করিলেন। দাসী রাজাজ্ঞা লইয়া শিবচন্দ্র-সমক্ষে গিয়া সংবাদ করিল। শিবচন্দ্র তখন শিবপূজা শেষ করেন নাই; প্রায় শেষ হইয়াছে, কিছু বাকী ছিল। সংবাদ পাইবামাত্র পূজা ত্যাগ করিয়া দাসীর অনুসরণ করিলেন।

দাসী, শিবচন্দ্রের নিকট হইতে প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বেই শম্ভুচন্দ্র রাজ-সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক মহারাজকে অসময়ে আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার নিজের বিলম্বের কারণ জ্ঞাপন করিলেন। তিনি কহিলেন যে, শিবের অর্ঘ্য সম্পাদন করিয়াই মহারাজ-সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা কহিলেন, "বাপু! এত শীঘ্র আসিবার কারণ কিছুই নাই, পূজা সমাপন করিয়া আসিলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না। যাহা হউক, শম্ভুচন্দ্র! রজনী প্রায় নিঃশেষ, আর তুমি উপবাসী আছ, কিছু জল খাও।" শম্ভুচন্দ্র কহিলেন, "মহারাজ, আপনি যাহা অনুমতি করিবেন, অবশ্যই আমার তাহা পালন করা উচিত। তবে আমার ব্রত সম্পূর্ণ হয় নাই, পূজা প্রায় সাঙ্গ হইয়াছে। পূজা শেষ করিয়া ত্বরায় আসিয়া মহারাজের প্রসাদ গ্রহণ করিব। আর অল্পক্ষণের জন্য ব্রতভঙ্গের প্রয়োজন সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য।" রাজা কহিলেন, "আচ্ছা, পূজা সাঙ্গ করিয়া আসিও", এই বলিয়া শম্ভুচন্দ্রকে বিদায় দিলেন। সেই সময়েই শিবচন্দ্র, দাসী-সমভিব্যাহারে রাজসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক মহারাজের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া অসময়ে আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা কহিলেন, "শিব, তুমি যে দাসী সঙ্গে আসিলে? তুমি কি করিতেছিলে?" শিবচন্দ্র কহিলেন, "মহারাজ! আমি শিবপূজার দক্ষিণান্ত করিতেছিলাম, কিন্তু যখন আপনি ডাকিলেন, তখন আর তাহা শেষ না করিয়াই চলিয়া আসিলাম। কারণ আপনিই আমার সাক্ষাৎ শিব। যখন দেখিলাম, বিনা পূজায় শিব সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি, তখন আর পূজা সাঙ্গে ফল কি?" রাজা কহিলেন, "ভাল, সে কথা থাক। এখন রজনী প্রায় শেষ হইয়াছে, কিছু জল খাও।" শিবচন্দ্র কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রসাদ মস্তকে ধারণ করিয়া মুখে ফেলিয়া দিলেন। রাজা বলিলেন, "শিবব্রত সাঙ্গ না করিয়া জল খাইলে যে?" শিব উত্তর করিলেন, "মহারাজ! যদি ব্রত সাঙ্গ না হইতে ব্রতের ফল লাভ হয়, অর্থাৎ স্বয়ং শিব, সাক্ষাৎ হইয়া প্রসাদ দেন, তাহা হইলে আর ব্রত সাঙ্গ করিয়া ফল কি?" রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় দিয়া রাণীকে পরস্পরের পার্থক্য

এই গল্পে ভক্তির সম্পূর্ণতা স্পষ্ট দেখান হইল। ভক্তিভাব প্রকৃতরূপে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, নিষ্কাম আত্ম-ত্যাগই ইহার মূলমন্ত্র, ইহার ভক্তি। ইহা ব্যতীত কখনই ভক্তি সম্পূর্ণ হইতে পারে না, নিঃস্বার্থপর হইয়া কামনা বর্জ্জন পূর্ব্বক ঈশ্বরে আত্মবিসর্জ্জন করার নাম ভক্তি। যদি কিছু আমাদিগকে ঈশ্বর হইতে বিভেদ করে, তাহা আত্মজ্ঞান ও কামনা। এই দুইটী পরিত্যাগ করিতে পারিলে আর প্রভেদ থাকে না। আমার বোধ হয়, আত্মজ্ঞান-পরিত্যাগ করার নাম সাধনা—সাধনা অন্য কোন বস্তু নহে। তাই বলি, যদি ভক্তি কি, তাহা বুঝাইবার জন্য বল, নাম সাধনা, তাহা হইলে সাধন কি, অগ্রে বুঝাইতে হইবে, কারণ, সাধন কি, না জানিলে, ভক্তি কি প্রকারে বুঝিব?

শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত এম-বি।

গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(ছাইখেগো ক্রোরীয়ান্)

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

এতাদৃশ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির রাজত্ব-সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রধান পদপ্রাপ্তি-বিষয়ক অনেক কৌতুকাবহ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়—এতদ্দেশের দুর্ভাগ্য-বশতঃ তৎকালীন ঘটনার সবিশেষ বিবরণ কিছুই সংগৃহীত হইতেছে না। সে যাহা হউক, গোবিন্দের প্রতি পাতশার অভাবনীয় অনুরাগ দেখিয়া, দেওয়ানের কিঞ্চিৎ শঙ্কা হইয়াছিল—পাছে দেওয়ানীপদও, গোবিন্দকেই দেওয়া হয়। গোবিন্দের সহিত সম্রাটের সাক্ষাতে "তিন তাকিয়ে ইলাম" হইয়া গেলে, দেওয়ানের সে শঙ্কা অন্তর্হিত হইল। তৎকালে মুসলমান সম্রাটদিগের সভায়, সিংহাসনের সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বে কতকগুলি "তাকিয়া" থাকিত। ঐ সকল "তাকিয়া ইলামের" অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তিকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হইলে, সে তত্তৎ সুবার কোন প্রধান রাজকর্ম্ম পাইবার অধিকারী হইত। তদনুসারে গোবিন্দ—বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা এই তিন সুবার "ক্রোরীয়ান" অর্থাৎ রাজস্ব-সচিবের পদে অভিষিক্ত হইলেন। বাঙ্গালার নবাবের অধীন হইয়া তাঁহাকে কাজ করিতে হইত বটে, কিন্তু সে

অধীনতা নাম মাত্র। বাঙ্গালা বলিলে, তৎকালেও বঙ্গ বিহার উৎকল—এই তিন প্রদেশ বুঝাইত। গোবিন্দ একরূপ স্বাধীন ভাবেই বাঙ্গালার রাজস্ব নির্ণয় ও আদায় করিতেন।

গোবিন্দ, এইরূপে বঙ্গের প্রধান সচিবের পদপ্রাপ্ত হইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে বহুল অর্থসঞ্চয় করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি কিরূপ স্বাধীনভাবে রাজস্ব নির্ণয় করিতেন, নিম্নলিখিত কয় পঙ্‌ক্তির আভাসেই তাহা প্রতীত হইবে।

প্রবাদ আছে, গোবিন্দ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাঁহার অধীন রাজগণের প্রদেশ সমূহ হইতে একটী দ্রুতগামী অশ্ব ছুটাইয়া দিয়াছিলেন। "অশ্ব ছুটাইয়া দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, "যে যে প্রদেশ দিয়া এই অশ্ব যাইবে, এবং অশ্ব যেখানে গিয়া স্থির হইবে, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার নিজ অধিকারে থাকিবে। তিনি সেই সেই প্রদেশের রাজস্ব, দিল্লীর সম্রাটকে দিবেন। রাজগণ আমাকে রাজস্ব দিবেন।" তিনি গাড়ি টাকাদ্বারা পূর্ণ করিয়া লইয়া সেই দ্রুতগামী অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ টাকার "হরির লুট" দিতে দিতে বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। টাকা "হরির লুট" দিবার অর্থ—তত্তৎ প্রদেশের মূল্যস্বরূপ উহা প্রদত্ত হইল। অথবা দরিদ্রদিগকে অর্থ দান করা হইল, ইহাই অনুমিত হয়। বিনা রক্তপাতে রাজা কোন প্রদেশ জয় করিতে সমর্থ হন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সামান্য দ্রুতগামী অশ্বরূপ অস্ত্রদ্বারা তাহা অক্লেশেই বিনা রক্তপাতেই অধিকার করিয়া লইলেন। তাহাতে অধীন রাজগণ, ভীত হইয়া এই সকল অমানুষিক কার্য্যের কোন প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে সাহসী হইলেন না! গোবিন্দের যে প্রভূত ক্ষমতা ছিল, ইহাই তাহার প্রভূত পরিচয়। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পিতৃ মাতৃ চরণে বিপুল বিত্ত দিয়া প্রণাম করিলেন। পরে যে মেছুনী, যে বাজরায় (মৎস্য-বিক্রয় পাত্র) করিয়া তাঁহার বাটীতে মাছ বিক্রয় করিতে আসিয়া তাঁহাকে গালি দিয়া গিয়াছিল, সেই মেছুনীকে তাহার ডালা সহ লোক দ্বারা ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মৎস্যজীবিনী ডালা সঙ্গে লইয়া গোবিন্দের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মৎস্য-জীবিনীকে দেখিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচনে

লীলার মহিমা মাদৃশ মানবে কি বর্ণন করিবে? আমি যখন বাটী ত্যাগ করিয়া যাই, তখন আমার বয়স মোটে আট বৎসর। এই আট বৎসর বয়সের মধ্যে এই মৎস্য-জীবিনী কিংবা অন্য কোনও মৎস্য-জীবিনী "মৎস্য লইবে" বলিয়া কখনও আমার বাটী আসিয়া উপস্থিত হয় নাই; এবং আমিও সেই আট বৎসর বয়সের মধ্যে কোন দিনই মৎস্যাস্বাদন করি নাই। আমার সেই আট বৎসর বয়সের সময় যদি এই মৎস্য-বিক্রয়িণী, আমার বাটীতে মীন বিক্রয় করিতে না আসিত; এবং মীন বিক্রয় করিতে আসিয়া আমাকে যদি গালি না দিত, তবে কি আমি এতাদৃশ অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইতাম? আমি কখনই এতাদৃশ অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইতাম না। এই মেছুনী আমার বাটীতে মাছ বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল বলিয়াই আমি এতাদৃশ অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইয়াছি। অন্তর্যামী ভগবান্, আমার উন্নতিপথাবিষ্কারের জন্যই এই মৎস্য-জীবিনীকে আমার সৌভাগ্য লক্ষ্মীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই মেছুনীই আমার সৌভাগ্য-লক্ষ্মী। এই বলিয়া মেছুনীর ডালা, টাকায় পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন।

বাস্তবপক্ষে অধিকাংশ দরিদ্র সন্তানের উন্নতি, সুশিক্ষা, আত্মাবলম্বন ও ধর্ম্ম শিক্ষার পথ নীচ কুলোদ্ভব জঘন্য বৃত্তিধারী লোকের তীব্র-মিষ্ট, কটু সম্ভাষণ দ্বারা প্রথমে পরিষ্কৃত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া সংসারে প্রবেশ করে, ইহা অনন্তবিদের অনন্তরূপী ভগবানের অনন্ত কার্য্যসূত্রের অনন্ত লীলা। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর অদৃষ্টেও, তাহাই ঘটিয়াছিল। গোবিন্দকে যদি মেছুনী গালি না দিত, তবে তাহাকে কখনই সেই আট বৎসর বয়সের সময় অর্থোপার্জ্জন মানসে বাটী হইতে বহির্গত হইতে হইত না। মৎস্য-জীবিনী গালাগালি দিয়াছিল এবং সেই গালাগালি গোবিন্দের হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক তীক্ষ্ণ শলাকার ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন।

মুসলমান অধিকারের পূর্ব্ব হইতেই, বঙ্গদেশ দ্বাদশটি ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত ছিল। জনরব আছে, সম্রাট জহাঙ্গীরের সময়ে যশোহর-রাজ প্রতাপাদিত্য ঐ বারটি রাজ্য স্থাপন করেন। একথা সত্য বোধ হয় না। অথবা সত্য হইলেও, ঐ রাজ্যগুলি তিনি অধিককাল আত্ম-বশে

মৃত্যুর পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত পূর্ব্বস্থলীতে ঐ বার জন রাজার বারটি বাসা-বাটী ছিল। ঐ বাসাবাটী সকল "বার ভূম" বলিয়া খ্যাত ছিল। রাজস্ব-সম্বন্ধী কার্য্যাদি করিবার জন্য বঙ্গরাজগণের কর্ম্মচারীরা, উপরি-উক্ত বাসাবাটী সকলে অবস্থান করিতেন। কখন কখন প্রয়োজন মতে গোবিন্দের সহিত বা পরবর্ত্তী তৎপদাভিষিক্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বয়ং রাজারাও তথায় আসিতেন। গোবিন্দ, পূর্ব্বস্থলীর বাটীর তিন দিকে গড় কাটা হইয়াছিল। অপর দিকে গঙ্গা স্বয়ং, গড়ের কার্য্য করিতেছিলেন। বাসবাটী ব্যতীত গঙ্গাতীরে অট্টালিকাময় ঠাকুরবাটীও ছিল। তথায় একশত আটটি শিবমন্দির ছিল। তদ্ব্যতীত রাধাকান্ত, রাধাবল্লভ, কৃষ্ণদেব এবং মদনগোপাল এই চারিটী দেববিগ্রহ তথায় ছিলেন। গোবিন্দ পশ্চিম হইতে আগমনকালে তৎকালীন জয়পুরপতির নিকট প্রথম বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। দেবালয়ের সহিত সংযুক্ত স্বতন্ত্র অতিথিশালা ছিল। গোবিন্দ, ঐ সকল দেবসেবা এবং অতিথিসেবা, মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন। জনশ্রুতি আছে, তিনি অত্যন্ত বদান্য ছিলেন। উক্ত রাধাকান্ত—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায়ের বাটীতে, রাধা-বল্লভ শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার রায়ের বাটীতে, কৃষ্ণদেব শ্রীযুক্ত বীরভদ্র ভট্টাচার্য্যের বাটীতে (পূর্ব্বস্থলীতে), অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। মদন-গোপাল বিগ্রহ সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় না। বর্গীর হাঙ্গামার সময় উক্ত মদনগোপাল বিগ্রহ বর্গীরা ভাগীরথীর জলে নিক্ষেপ করিয়া ছিল। কিন্তু হায়! আজ বলিতে কষ্ট হয়—গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী যে দেবসেবা অতি সমারোহে সম্পন্ন করিতেন; অহো কি বিড়ম্বনা, কালের কুটিল গতিতে সেই দেব-বিগ্রহ, আজকালকার ঊনবিংশ শতাব্দীর সুশিক্ষিত সুসভ্য আত্মাভিমানী নব্য যুবক বাবুদের হস্তে পড়িয়া উপযুক্ত দেবসেবার অভাবে দেববিগ্রহ, নিগ্রহ প্রাপ্ত হইতেছেন, কিন্তু ন্যায়ের অনুরোধে বলিতে হইবে, উক্ত ব্যক্তি সকল চাকরি উপলক্ষে বৎসরের বার মাস প্রবাসে (বিদেশে) বাস করিয়া থাকেন। তত্তাবধানের উপযুক্ত লোকাভাবে দেববিগ্রহ এরূপ নিগ্রহ প্রাপ্ত হইতেছেন।

বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তিনটী শ্রেণী আছে। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র এবং বৈদিক। এই শ্রেণীত্রয়ের মধ্যে জাতিগত বিভিন্নতা কিছুই

মনে করেন। সেটি, কেবল তাঁহাদের মনের ভ্রান্তিমাত্র। কার্য্যে কাহারও অধিক প্রাধান্যের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং সকলেই সমান, এইরূপ অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এই তিন শ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের ব্রাহ্মণ্যদেব যে, এক—ইহা বোধ হয়, সকলেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু প্রকাশ্যরূপে এই শ্রেণীত্রয়ের মধ্যে আহার ব্যবহার বা বিবাহাদি সম্বন্ধ হইতে পারে না। অথচ কেহ কাহার অন্নগ্রহণ করিলে, তাহাকে স্বশ্রেণী হইতে পতিত হইতে হয় না; এবং ঐ শ্রেণী সকলের মধ্যে গুরু শিষ্য সম্বন্ধও প্রচলিত আছে। যাহাহউক, এক জাতির মধ্যে এইরূপ অমূলক ভিন্নতা থাকায় অনেক অনিষ্ট হইতেছে। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি সম্বন্ধ প্রচলিত হইলে ব্রাহ্মণ জাতির অনেক মঙ্গল হইতে পারে। এই তিন শ্রেণী একত্র হইলে কিরূপ মঙ্গল হইতে পারে এবং পৃথক্ থাকায় কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে; তাঁহার সূক্ষ্ম বিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। যাহাহউক, এই তিন শ্রেণীকে একত্র করিবার জন্য গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে তিনশ্রেণীতে "কে আমাকে সমাজচ্যুত করে?" এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পত্নীরই সন্তান হইয়াছিল। কিন্তু বৈদিক পত্নীর গর্ভজাত সন্ততিগণ ব্যতীত, আর কেহই জীবিত ছিল না। তাঁহার অপর সন্তানেরা জীবিত থাকিলে এবং পর বংশীয়েরা এই নূতন প্রণালী প্রচলিত করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া আসিলে কোন ফল হইত না, একথা বলা যায় না। ফলতঃ, গোবিন্দের এই চেষ্টা, ফলবতী হয় নাই। তিনি মৃত্যুকালে দুই পুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠের নাম রূপরাম, কনিষ্ঠের নাম রাম রায়। বোধ হয়, কর্ম্মসূত্রে, রাজসংসার হইতে তিনি "রায়" উপাধি পাইয়াছিলেন। এইজন্য তাহার পরবংশীয়েরা "রায়" উপাধিতেই খ্যাত হন। কিংবদন্তী আছে, একদা আহ্নিক করিতে করিতে হঠাৎ গোবিন্দের মৃত্যু হয়। তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট, তাহার ছিন্নমস্তক গৃহতলে লুণ্ঠিত হইতেছে, তৎকালীন পরিজনেরা, তাঁহার এইরূপ পরিণাম দেখিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার এইরূপ মৃত্যুতে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন, গোবিন্দ ছিন্নমস্তার মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন; এইজন্য তাঁহার ঐ রূপে মৃত্যু হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

মৃত্যু।

কোথা যাও দ্রুতপদে পথিক প্রবিণ!
ছিন্নকন্থা জঠরজ্বালায় তনুক্ষীণ॥
বুঝি অর্থ অন্বেষণে, চলিয়াছ ক্ষুণ্ণমনে,
যাও,—যাও,— সম্মুখেতে গভীর গহন।
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ॥

কুবেরের প্রতিনিধি কে তুমি রাজন্!
আসমুদ্র ক্ষিতিতল করিছ শাসন?
ধন-বল, জন-বল, মরকত হর্ম্ম্যস্থল—
পেয়ে সুখে আছ বুঝি? করহ স্মরণ—
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ॥

হুঙ্কারি চলিছ রণে কেও বীরবর!
পদভরে ধরাতল কাঁপে থর থর॥
ভীম অসি প্রহরণে, বধিছ অরাতিগণে,
দিগ্‌বিজয়ী বলি তোমা বাখানে ভুবন।
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ॥

নবজাত শিশু তুমি প্রভাতের তারা।
অনন্ত সুখের উৎস—মুখে হাসিভরা।
নাহি কপটতা ভান্, পুণ্যালোকে জ্যোতিষ্মান্
নিভিবে আঁধারে ওই সুবর্ণ বরণ।
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ॥

কত আশা যুবা তুমি সম্মুখে তোমার।
বহুশ্রমে বিদ্যালাভে ফুল্ল পরিবার॥
কত অর্থ, কত মান, লভিতে তোমার প্রাণ,
ঊধাও উতালা; ভ্রমে করি কি স্মরণ।
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ॥

রূপ গৌরবিনী তুমি,—সুকোমল-কায়া

ভাল বিশ্ব অলকায়, চন্দ্রিমা স্তিমিত প্রায়,
ভ্রূভঙ্গে বিলোল তব আব্রহ্ম ভুবন।
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ॥
স্থিরবুদ্ধি বৈজ্ঞানিক তুমি অভিমানী।
পঞ্চভূত-ক্রীড়নক—হেন অনুমানি॥
বহ্নি বায়ু ব্যোম-তলে, সসাগরা ভূমণ্ডলে,
প্রকৃতি নিয়ম লঙ্ঘি গড়িছ নূতন।
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ॥
মহামেধা দার্শনিক তর্কে চূড়ামণি।
বাগ্মীতায় প্রতিভায় স্তম্ভিতা ধরণী॥
প্রখর গভীর দৃষ্টি, তন্ন তন্ন করি সৃষ্টি,
উদ্ভাবিলে কত তত্ত্ব জগদান্দোলন।
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ॥
প্রেমিক সুকবি কেহে উধাও পরাণ।
প্রকৃতির উরে বসি তুলিছ সুতান॥
সুরসিক নবরসে, প্রকৃতির ভাবাবেশে,
নানা রঙ্গে ভঙ্গে কর বিশ্ব বিপ্লাবন।
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ॥
হে কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, স্থাবর, জঙ্গম,
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, কোথায় গমন?
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, করিতেছ কি চিন্তন?
নেহার কালের আস্যে বিকট ব্যাদন।
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ॥
কে অই বসিয়া শুভ্র হিমাচল শিরে
জন্ম মৃত্যু হীন আমি কহে দম্ভভরে
এ কি শুনি তব ঠাঁই
জন্ম নাই মৃত্যু নাই,
তুমি নাকি বিশ্বব্যাপী জন্ম-মৃত্যু-হীন।
সে তত্ত্বে আমায় প্রভো! করহে বিলীন॥

তোতা-পাখী।

প্রথম উল্লাস।

প্রথম দর্শন।

লক্ষ্মণাবতী নগরীর একটি সদর রাস্তার পূর্ব্বধারে সারি সারি খান-কতক বাড়ী। রাস্তার পশ্চিম ধারে হরেক রকম জিনিষের দোকান। ছোট একখানি দোকানে একজন হিন্দুস্থানী কামিনী পায়ের উপর পা রাখিয়া বসিয়া পানের খিলি বিক্রয় করিতেছে। কামিনীর বয়স অল্প, ফিট গৌর বর্ণ, নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ কেশ পাশ; ললাটের দুই পাশ দিয়া ঝুলিয়া সেই কেশরাশি কর্ণমূল ঢাকিয়া উরুদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত হইতেছে, অঙ্গে কতকগুলি অলঙ্কারও আছে, সুন্দরী সুন্দর সুন্দর মসলাদার পান খাইয়া সুন্দর ঠোঁট দুখানি লাল করিয়াছে, দোকানে খরিদ্দার নাই, পানওয়ালি এক একবার বড় বড় চক্ষু দুটি ঘুরাইয়া রাস্তার এধার ওধার চাহিয়া দেখিতেছে। শোভা বড় মন্দ নয়।

মাঘ মাস; নবীন বসন্তের সমাগম; পাঁচ দিন পূর্ব্বে বসন্ত পঞ্চমীর উৎসব হইয়া গিয়াছে, বসন্ত বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া দুটি পাঁচটি হাস্য-মুখী কামিনী রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে। খিলিওয়ালি পথপানে চাহিয়া আছে। সময় অপরাহ্ণ। দোকানে খরিদ্দার নাই। প্রায় দশমিনিট পরে একটি যুবাপুরুষ আসিয়া সেই দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দিব্য সুপুরুষ; বয়স অনুমান বিংশতি কি এক বিংশতি বর্ষ, অধরে ভ্রমর বর্ণ নবীন গোঁপ, চক্ষের পাতা বেশ বড় বড়, ভ্রূযুগল সুন্দর ধনুকাকারে বক্র, কপালখানি ছোট, সুকুঞ্চিত বাবরিচুল, হিন্দুস্থানী পোষাক পরা, মস্তকে হিন্দুস্থানী তাজ বামদিকে ঈষৎ বক্র, হস্তে এক গাছী যষ্টি, পদযুগে জরির লপেটা।

নবীন খরিদ্দারকে দেখিয়া, সুন্দর মুখে ফিক্ করিয়া হাসিয়া, মিহি আওয়াজে খিলিওয়ালি বলিল, "ছাঁচি খিলি বাবু সাব! গোলাপী খিলি বাবু সাব!" অভ্যর্থনা মন্দ হইল না; বাবু সাহেব অবাক্ হইয়া পান-

গাঢ়তর সন্মিলন হইয়াছিল, অভ্যর্থনাকারিণীর অভ্যর্থনা বাক্য তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল কি না; আমরা সে কথা বলিতে পারিব না; কেবল এই টুকু বলিতে পারিব, খিলিওয়ালির সহিত তিনি মুখামুখী করিয়া দাঁড়ান নাই, একটু পাশ কাটাইয়া নির্ব্বাক অভিনয় করিতে ছিলেন; অন্যমনস্কভাবে পানের খিলির আসনের উপর তিনি একটি চুয়ানী ছুড়িয়া ফিলিয়া দিলেন, আবার একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া, সুন্দরী দোকানী দুটি গোলাপী দোনা বাবু সাহেবের হস্তে প্রদান করিল, দক্ষিণ হস্তে ষষ্টি, সুতরাং বাবু সাহেব বাম হস্তে তাহা গ্রহণ করিলেন; চক্ষু রহিল পানওয়ালির দিকে।

ওদিকে আর একপ্রকার চমৎকার রঙ্গ! খিলির দোকানের ঠিক রুজু রুজু সন্মুখের বাড়ীখানির দোতালার জানালার খড়খড়ি বন্ধ; এক-ধারের একটি পাখি খোলা; সেই রন্ধ্রপথে দুটি সমুজ্জল কৃষ্ণ নয়ন কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্নভাবে শোভা পাইতেছিল; যুবা অথবা দোকানীর নেত্র-ফলকে সে শোভা প্রতিবিম্বিত হয় নাই। সে দুটি কৃষ্ণ নয়ন কাহার, তাহাও আমরা জানি না। পানের দোনার আদান প্রদানের ৫ মিনিট পরে সেই দুই নয়নের অধিকারী অথবা অধিকারিণী কাহাকে যেন নিকটে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন, "তুই একবার নীচে যা, ঐ দেখ্, ঐ যে মানুষটি পানের দোনা হাতে কোরে দাঁড়িয়ে আছে, ঐ মানুষটি কোনদিকে যায়, কোথায় যায়, দেখে আয়। ঠাই ঠিকানা জেনে আসিস, মনে মনে জেনে আসিস, কেহ যেন কিছু জান্তে না পারে। যা,—শীঘ্র যা!" যাহার প্রতি এই আজ্ঞা হইল, সে একজন সেই বাড়ীর কিঙ্করী। আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রেই কিঙ্করী শীঘ্র শীঘ্র নিচে নামিয়া আসিল।

দ্বিতীয় উল্লাস।

পাখি পিঞ্জরে। খড়খড়ির পাখির ভিতর দিয়া যে দুটি কৃষ্ণ নয়ন এতক্ষণ রাস্তা পানে চাহিয়াছিল, সে নয়ন কাহার, পুরুষের কি রমণীর, এতক্ষণ তাহা আমরা জানিতাম না, এখন জানা গেল, একটি পরদা-নসীন কামিনীর,—পরম সুন্দরী মানবতী যুবতী কামিনীর। এখন আর তাঁহাকে ইতর সমক্ষে প্রকাশিত করা উচিত হয় না। তাঁহার কিঙ্করী

ফিরিয়া আসিল। লজ্জা রঞ্জিত আরক্ত বদনে—লজ্জা রঞ্জিত অথচ আগ্রহ-পূর্ণ প্রফুল্ল বদনে কিঙ্করীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে মোহিনী! কি সংবাদ!"

প্রকাশ পাইল, সেই কামিনীর কিঙ্করির নাম মোহিনী। নির্জ্জন গৃহে কথোপকথন, কিছু আর গোপন রাখিবার প্রয়োজন ছিল না, পন্থা পরিস্কার! মোহিনী উত্তর করিল, "খিলিওয়ালির দিকে চাহিতে চাহিতে লোকটি সরাসর দক্ষিণদিকে চলিল, তফাতে তফাতে আমিও সঙ্গ লইলাম। বেশী দূর নয়,—আন্দাজ একশত গজ তফাতে ছোট একখানা একতলা বাড়ী, লোকটী সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। সেই বাড়ীর দুই ধারে আরও পাঁচ সাত খানা একতলা বাড়ী আছে, পাছে ভুল হয়, সেইজন্য বাড়ীখানার বাহিরের কপাটের গায়ে আমি একটা চিহ্ন রাখিয়া আসিয়াছি।"

"বেশ করিয়াছিস।"—আহ্লাদে করতালি দিয়া কামিনী বলিলেন, "বেশ করিয়াছিস। সন্ধ্যার সময় আবার তোরে সেই বাড়ীতে আর একবার যাইতে হইবে।"

এইখানে কামিনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া না রাখিলে আখ্যায়িকার রসভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। অতএব পাঠক মহাশয় জানিয়া রাখুন, যে বাড়ীতে কামিনী, সেই বাড়ীতে একজন নবাব থাকেন, কামিনীটি সেই নবাবের বেগম। "সন্ধ্যার সময় আবার তোরে সেই বাড়ীতে আর একবার যাইতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে মোহিনী বলিল, "কি নিমিত্ত"—বেগম সাহেব বলিলেন, "সেই লোকটিকে এখানে আনিবার নিমিত্ত।"

আরও অধিক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কম্পিতস্বরে মোহিনী কহিল, "বল কি তুমি! এ পরিহাসের অর্থ কি, কোথাকার লোক, কি বৃত্তান্ত, কিছুই জানা নাই, নবাবের অন্দরমহলে তাহাকে আনিতে হইবে, এটা তোমার কি রকম পরিহাস!

বেগম। পরিহাস নয়, সত্য সত্যই তাহাকে আনিতে হইবে। তাহাকে লইয়া আমি একটা নূতন রকমের খেলা করিব। আনিতেই হইবে।

মোহিনী। আমি পারিব না।

বেগম। পারিতেই হইবে, না পারিলে আমি তোর উপর রাগ করিব।

এত ভালবাসি তোরে, এত বিশ্বাস করি তোরে, এ কাজটা যদি তুই না পারিস, সব ভালবাসা ফুরাইবে, সব বিশ্বাস ফুরাইবে।

মোহিনী। ফুরায় ফুরাবে, আমি পারিব না। সাত বৎসর নবাব সাহেবের নিমক খাচ্ছি, আমি নিমখহারাম হব না।

বেগম। তা কেন হবি! আমার হুকুমে কাজ করা নিমখ্‌হারামি নয়। সন্ধ্যার সময় তোরে সেই একতালা বাড়ীতে যাইতেই হইবে,—লোকটিকে এখানে আনিতেই হইবে।

মোহিনী। আমার কর্ম্ম নয়। তুমি বরং আর কাহাকেও ঐ দুরন্ত কাজটার ভার দিও, না হয় আমারে বরং চাকরীতে জবাব দিও, ও কাজ আমি কখনই পারিব না। বাপ্‌রে! সর্ব্বনেশে কাজ!

বেগম। ফিকির আছে। কেহ কিছু জানিবে না। কিসের ভয়! নবাব সাহেব বাড়িতে নাই, তিনি এখন দিল্লীতে। সংবাদ এসেছে, আরও একমাস সেখানে থাকিবেন। কিসের ভয়। নবাব এখানে থাকিলেও ভয় করিতে হইত না। ফিকিরের কাছে কোন প্রকার ভয় দাঁড়াতেই পারে না।

মোহিনী। বল দিখি, তোমার ফিকিরখানা কি রকম!

বেগম সাহেব এখানে ফিকিরখানা ব্যাখ্যা করিতে বসিলেন। মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "শোন তবে,—শোন্ আমার ফিকির। তুই যাবি,—গেলেই তাঁর দেখা পাবি। কেন জানিষ! হিন্দুস্থানীর পোষাক পরা বটে, লোকটি কিন্তু বাঙ্গালী। চেহারা দেখেই আমি চিনেছি। বিদেশী মানুষ, নূতন এসেছে, নূতন লোকে সহরে সন্ধ্যাকালে প্রায়ই বাহির হয় না, গেলেই দেখা পাবি। নূতন এসেছে, এটা আমি কিরূপে জানি, শোন্ বলি। এটা হইতেছে সদর রাস্তা, সহরের সকলকেই এ রাস্তায় যাওয়া আসা করিতে হয়, একদিনও আমি,—একবারও আমি ঐ লোকটিকে আমি এ পথে দেখি নাই।

হাসিয়া মোহিনী বলিল, "এই তোমার ফিকির! ও দশা! ওখন ফিকির আমারে ভুলাতে পারে না। নূতন এসেছে, নূতন মানুষ, ঘরেই থাকে, গেলেই দেখা হবে, এ রকম ফিকির খাটান আমার কর্ম্ম নয়।"

চঞ্চলা হইয়া বেগম সাহেব কহিলেন, "ঐ ত তোর রোগ! সকল

হয়ে গেল! শোন্ আগে, তারপর কথা কবি।- ফিকিরটা এই যে, তুই যাবি, দেখা পাবি হাসবি না, বলবি, বাবু সাব তোতা-পাখী কিনবে! খোষ পাহাড়ের তোঁতা, সব রকম কথা জানে, সব রকম কথা কয়, বুদ্ধি পর্য্যন্ত দেয়, ভারি সস্তা। একটিবার চক্ষে দেখলেই সব গুণ জান্তে পারবে, চেহারাও খুব ভাল! হাতে হাতে আনা যায় না, যেখানে আছে, সেইখানে গিয়ে দেখে শুনে পছন্দ করা চাই!—এই সকল কথা বলিলেই রাজি হবে। লোকটি সৌখীন, ব্যবহারেই পরিচয় পেয়েছি, চোয়ানী দিয়ে দুই দোনা পান কিনেচে। নিশ্চয় রাজি হবে। রাজি হলেই ওমনি তখনি সঙ্গে করে আন্‌বি।"

মুখ ভারী করিয়া মোহিনী বলিল, "সব কথাই বুঝিলাম! তোতা পাখির ফিকির! সেলাম বহুৎ বহুৎ। তোতা পাখির ফিকির চালাইতে কিন্তু মোহিনীর সাধ্য নাই, মোহিনীর অত বড় বুকের পাটা নয়। তোতাই বল, ময়নাই বল, কিংবা হাতিই বল, আনাটা চাই! লোকটিকে তোমার একান্তই দরকার। মোহিনীর কপাল দোষ, সে রকম ময়না-গিরি মোহিনী শিখিতে পারে নাই!"

মৃদু হাসিয়া বেগম সাহেব বলিলেন, "কিছুই অসাধ্য হবে না। দোহারা ফিকির। এক ফিকির তোতা পাখি, আর ফিকির বড় মজার। এক-জন অচেনা পুরুষ মানুষকে নবাবের অন্তঃপুরে নিয়ে আয়, এমন মন্ত্রণা আমার নহে। একপ্রস্ত বাইজীর পোষাক,—পেসয়াজ, ওড়না, টুপী, রুমাল, এই সব সজ্জা সঙ্গে নিয়ে যাবি, বলবি পুরুষ মানুষ দেখিলে সেই তোতা পাখিটির বড় রাগ হয়, একটিও কথা কয় না, তুমি মেয়ে-মানুষ সাজ, নির্ব্বিঘ্নে সওদা হয়ে যাবে। এ কথা শুনিলে সৌখীন পুরুষ অবশ্যই বাইজী সেজে তোতা কিনিতে আসিতে রাজি হবে, কোন আপত্তি করিবে না। তুই তারে স্বহস্তে বাইজী সাজাবি, মুখে গোঁপের রেখা আছে, সেই মুখে একখানা লাল রুমালের ঘোমটা টাকা দিয়ে, পাল্কিতে তুলে দিবি, পাল্কির দরজায় চাবি বন্ধ থাকিবে, আর একখানা পাল্কিতে তুই নিজে উঠিয়া বসিবি, সরাসর খিড়কী দরজা দিয়ে পাল্কি শুদ্ধ বাড়ীর ভিতর নিয়ে আসবি। কেমন, এ ফিকিরে আর তোর কোন ওজর আছে। এ ফিকিরে তোর প্রাণে আর কি কোন ভয়

হো হো করিয়া হাসিয়া মোহিনী তখন বলিল, "ফিকির বটে! ফিকির বটে! বহুৎ আচ্ছা ফিকির! লোকটিকে তবে একান্তই তুমি চাও! আচ্ছা, আর এখন আমি গররাজি নই, মনিবের হুকুম এই ফিকিরে তামিল করিব। কিন্তু সে লোক যদি রাজি হয়, তবে।"

যুক্তি স্থির হইল, ফিকির স্থির হইল, মোহিনী রাজি হইল, সজ্জা গুছাইতে, সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে বেলাটুকু কাটিয়া গেল, সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন, সন্ধ্যা হইল। মোহিনী তখন বাইজী সজ্জার একটি পুটুলি কক্ষে লইয়া দূতীগিরি করিতে যাত্রা করিল।

বেগমের কথাই ঠিক। মোহিনী উপস্থিত হইবামাত্র বাবু সাহেবকে দেখিতে পাইল, কথাবার্ত্তা ঠিক হইল, যে রকমে সাজাইতে হয়, কক্ষস্থিত পোষাকে মোহিনী সেই রকমে বাবু সাহেবকে বিবি সাহেব সাজাইল, মোহিনীর সঙ্গে পাল্কি চড়িয়া রাত্রি চারিদণ্ডের সময় নূতন বিবি সাহেব তোতা পাখি কিনিতে শুভ যাত্রা করিলেন। অত্যল্প সময়েই দুইখানি বদ্ধ শিবিকা নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বাঙ্গালী বাবু সাহেব, ওরফে বিবি সাহেব সেই রাত্রে নবাবের বেগম সাহেবের বিলাসগৃহে পরম যত্নে আশ্রয় পাইলেন। সে আশ্রয় ছাড়িয়া আর বাহির হইতে পারিলেন না। পাখি কিনিতে আসিয়া নিজেই পাখি হইলেন। হাস্য করিয়া মোহিনী বলিল, "পাখি পিঞ্জরে।"

তৃতীয় উল্লাস।

জোড়া পাখি উড়িল। পাল্কি হইতে বাহির হইয়া বাইজীবেশধারী বাবু সাহেব যখন বেগমের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, বেগমের রূপ দেখিয়া তখন তাঁহার চক্ষু স্থির হইল। বেগমটি নবাব সাহেবের দ্বিতীয় পক্ষের বেগম, বয়সে সপ্তদশী, রূপ অতি চমৎকার, উপন্যাস পুস্তকে পরিরাজ্যের পরীগুলির রূপের যেরূপ বর্ণনা পাঠ করা যায়, এই বেগমটির রূপও যেন সেই প্রকার; ঠিক যেন সাক্ষাৎ পরিজাদী। বাইজীরূপী বাবু সাহেব সেই অপরূপ রূপ দেখিলেন। মুখে আর বাক্য সরে না, সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত, নেত্রপুট পলকশূন্য। অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া পরিশেষে

মধুর অধরে মধুরহাস্য আনয়ন করিয়া রূপবতী বেগম সাহেব আপন বক্ষে হস্তার্পণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ প্রতিধ্বনিত করিলেন, "হাঁ, তোতা পাখি! দেখ বাইজী! দেখ দেখ, এইটি তোমার তোতা পাখি!"

বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্য। বাইজী বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়াই রসিকা বেগম সানুরাগে বাইজীর করধারণ পূর্ব্বক মখমল পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন; আপনিও সহাস্যবদনে পার্শ্বে বসিলেন; সহাস্যবদনেই নৃত্যভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "আমাদের এই বাইজী অপেক্ষা বাইজীর গোঁপ জোড়াটি বেশী সুন্দর! বাইজীর মুখে গোঁপ! এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য কেহ কখন দেখে নাই! আমি দেখিলাম! বাহবা বাহবা! আমি তবে পরম ভাগ্যবতী!"

বাইজী আর বেশীক্ষণ রহিলেন না, নবীন বসনভূষণে নবীন বাবুজী হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন, কথাচ্ছলে নানাপ্রকার রঙ্গালাপ হইল। বেগম সাহেবের অনুমানটী সত্য। বাবু সাহেবটি সত্য সত্যই বঙ্গবাসী,—জাতি ব্রাহ্মণ, নাম রাধিকাপ্রসাদ রায়। প্রথম রজনীতেই ব্রাহ্মণের যজ্ঞ-কার্য্য সমাপ্ত হইল। আড়ম্বর অধিক হইল না। আদর করিয়া বেগম সাহেব বলিলেন, "লজ্জা স্ত্রীজাতির ভূষণ, সেই লজ্জাকে দূরে রাখিয়া আমি নিজমুখে কবুল দিলাম, দূর হইতে পানের দোকানে তোমার রূপ দেখিয়া সত্য আমি বিমোহিত হইয়াছি, তুমি যদি আমারে ভালবাসিতে পার, এই রাত্রেই নবীমস্কদের উপাসক হও; সাদরে আমি তোমারে এই নবযৌবন দান করিব। রাধিকাপ্রসাদ কথার প্রসঙ্গে অবগত হইলেন, এ বেগম সাহেবটি নবাবের বিবাহিত নহে, এটি একটি রক্ষিতা।

রাধিকাপ্রসাদ আপন কর্ণকে সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, আপনি তখন জাগ্রত কি নিদ্রিত, কথাগুলি স্বপ্ন কি সত্য, তাহা বুঝিয়া লইতে সন্দেহ উপস্থিত হইল। বেগম যখন দ্বিতীয়বার বলিলেন, মুসলমান হও, আমি তোমারে নবযৌবন দান করিব, রাধিকার হৃদয়ে তখন আর প্রেমানন্দ ধরিল না; বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্র হৃদয়খানি যেন মহাসমুদ্র বোধ হইল, সেই মহাসমুদ্রে মুহুর্মুহু প্রেমতরঙ্গ বহিল। সেই রজনীতেই রাধিকাপ্রসাদ যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়া কল্মা পড়িলেন, সুস্বাদু রামপক্ষী ভক্ষণ করিলেন। নামটিও বদল করিয়া আবদুল আলি নাম লইলেন, আমরা আর এখন কি বলিয়া অভিনন্দন করি,—পাঠক মহাশয়গণের সহিত আনন্দে

শুভ সম্মিলন। প্রায় একমাসকাল পরমসুখে রাধিকাপ্রসাদের ওরফে আবদুল আলি মোল্লার নবাব নিকেতনে বাস। ভরসা ছিল, নবাব তখন দেশভ্রমণে গিয়াছেন। ক্রমে তাঁহার স্বগৃহে প্রত্যাগমনের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। বেগম সাহেব আর রাধিকাপ্রসাদকে নিজ নিকেতনে লুকাইয়া রাখিতে সাহস করিলেন না। প্রায় একমাস একসঙ্গে অবস্থিতি, তথাপি কেবল এক মোহিনী ভিন্ন নিকেতনের কেহই জানিত না যে, সুন্দরী বাইজীটি পুরুষ মানুষ। রাধিকাপ্রসাদ প্রতিদিন সূর্য্যের উদয় অস্তকাল ঘোমটা দিয়া বাইজী সাজিয়া থাকিতেন, অধিক রাত্রে নিজমূর্ত্তি ধরিতেন। দিন-মানে বাইজী, নিশামানে বাবুজী, অথবা মোল্লাজী। এতদিন এই ভাব, কিন্তু আর সে ভাব চলিল না। কথাটা কেবল উপন্যাসের অঙ্গ নয়, আমাদের দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে একালে আজকাল আর্য্যসমাজ মুধ্যে দিয়া রাত্রে অনেকগুলি লোকের দুই প্রকার মূর্ত্তি নয়নগোচর হইতেছে। হায় হায়! এরূপ লুকাচুরি আর কতদিন এই আর্য্যসমাজকে অনুৎসন্ন রাখিবে, একমাত্র ভগবানই তাহা জানেন।

হাঁ, বেগমসাহেব আর রাধিকাপ্রসাদকে লইয়া লুকাচুরি দেখিবার সুবিধা পাইলেন না। এক রাত্রে তিনি রাধিকাকে বলিলেন, "ভাই আব-দুল্লা! আমার ঘরে তুমি তোতা পাখি কিনিতে আসিয়াছিলে, কিনিতে হয় নাই, বিনামূল্যে এই তোতা-পাখী তোমার হইয়াছে;—এ তোতাকে আর তুমি পিঞ্জরে বদ্ধ রাখিও না। পাখীর সঙ্গে তুমিও পাখী হইয়া পিঞ্জরে আছ, আর না; খোলা বাতাসে উড়াইয়া লইয়া চল।"

পরামর্শ স্থির। দুটি পাখি উড়িয়া যাইবে। সঙ্গে থাকিবে মোহিনী; এই শুভ সম্মিলনের জোড়া হইতেছে মোহিনী, অতএব মোহিনী সঙ্গে না থাকিলে চলিবে না। ঘটকালি করিয়া মোহিনী একটী পুরস্কার পাইয়া-ছিল, সাতখান মূল্যবান পাথর বসান স্বর্ণাঙ্গুরীয়। এখনকার পুরস্কার একসঙ্গে পলায়ন। পঞ্জিকার আশ্রয় লইতে হইল না, একদিন গভীর নিশাকালে তিনজনে গোপনে গৃহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন, বাটী হইতে বাহির হইয়া করতালি দিয়া নাচিয়া মোহিনী বলিল, ঠিক ঠিক ঠিক! জোড়া পাখি উড়িল!

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কবিকেশরী।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের এক পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শান্তিনিকেতন আশ্রমে এই পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন সংস্কার মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল।

এই উৎসবোপলক্ষে কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথ পঞ্জাবের আর্য্য সমাজকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ৺দয়ানন্দ সরস্বতী এই সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। আর্য্য সমাজের সহিত আদি ব্রাহ্ম সমাজের মতের কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও উভয় সমাজের উদ্দেশ্য একই। জড়ের অতীত, মূর্ত্তিহীন, ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার জন্য উভয় সমাজ দৃঢ়ব্রত। দেশের কুসংস্কার দূর করা এবং সুবিচারে ধর্ম্ম পালন করা উভয় সমাজের লক্ষ্য। আর্য্য-সমাজের ও আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপ্রণালী বহুদিন হইতে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন হইয়া চলিয়া আসিতেছে। আর্য্য সমাজের কয়েক জন তীক্ষ্ণবুদ্ধি সভ্যকে মহর্ষিদেবের নিকট ব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদক বহু শাস্ত্রালোচনা করিতে দেখিয়া গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ তাহাদিগের সাধুবাদ করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে পুত্রের উপনয়ন সংস্কার উপলক্ষে তিনি আর্য্য সমাজকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া উপস্থিত সভ্যদিগের যথোপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

আর্য্যসমাজের সম্প্রদায়ভুক্ত বৈদিক শাস্ত্রবিচারনিপুণ পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণগণ এই উপলক্ষে মহর্ষিদেবের সংস্কৃত অপৌত্তলিক ক্রিয়াপদ্ধতিরও যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। উভয় সমাজের বিধি ব্যবস্থা লইয়া অনেক আলোচনার পর কয়েকটী বিষয়ের মীমাংসা হইয়াছিল। আজি যে আর্য্য-সমাজ ও আদি ব্রাহ্ম-সমাজ একযোগে অপৌত্তলিক সনাতন ব্রহ্মোপাসনার পুনঃ প্রতিষ্ঠার্থ কার্য্য করা মনঃস্থ করিয়াছেন, শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন উৎসবে তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। যদি কালে কখন এই দুই সমাজের সংযোগ হয়, তবে শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন এবং কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথের হাতের গড়া সুকবি ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাণ্ডিত্য চিরদিন স্মরণ করাইয়া দিবে।

কবিকেশরী এইরূপে পুত্র রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন সংস্কার কার্য্য-সম্পাদন

করিয়া বোলপুরে শান্তিনিকেতন আশ্রমে নির্জ্জন প্রকৃতির নীরব সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করতঃ আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

বোলপুরের যে প্রান্তরে শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত, তাহা কঙ্করময় স্থান—কতকটা পাহাড় সদৃশ। শান্তিনিকেতন হইতে চারিদিকের ভূমি ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে। আবার কতক দূরের ভূমি উচ্চীকৃত এবং পুনশ্চ অবনত হইয়া সেই স্থান বৃহৎ ভৌমিক তরঙ্গবৎ দৃশ্যমান হয়। সেই কঙ্করময় প্রান্তরের মধ্যস্থলে শান্তিনিকেতনের সুদৃশ্য ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত। কঠিন ভূমি বলিয়া তথায় শীত গ্রীষ্মের পূর্ণ অধিকার। শীতকালে যেমনই কম্পনকারী শীত, গ্রীষ্মকালে আবার তেমনই প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। শীতকালে শীতের কন্‌কনানিতে গাত্রাচ্ছাদক শীতবস্ত্র হইতে হস্ত বহিষ্কৃত করা দুরূহ ব্যাপার। কলসীতে বা অন্য পাত্রে জল তুলিয়া রাখিলে প্রাতঃকালে তাহা বরফ তুল্য শীতল হইয়া থাকে—শরীরের যেখানে লাগে, ক্ষণকালের জন্য সে স্থান অসাড় হইয়া যায়—এমনই শীত। গ্রীষ্মকালেও তেমনই প্রচণ্ড রৌদ্র। সূর্য্যদেব আকাশের এক চতুর্থাংশে না আসিতে আসিতে প্রান্তর ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়া উঠে। প্রাঙ্গণে পদক্ষেপ করিবার যো থাকে না। পাদুকাও ২।৫ মিনিট পরে গরম হইয়া যায়। প্রখর রৌদ্রোদ্ভাসিত প্রশস্ত প্রান্তর ধূ ধূ করিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে উত্তপ্ত বায়ুর ঝল্‌কা আসিয়া মুখে চোখে লাগিয়া যেন দগ্ধ করিয়া তোলে। বেলা নয় ঘটিকা হইতে না হইতে গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়; নতুবা সূর্য্যের উত্তাপে তিষ্ঠিবার যো থাকে না। শীত গ্রীষ্মের এমনই বিপর্য্যয়। কিন্তু কবিকেশরীর কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। এই উৎকট প্রাকৃতিক দৃশ্য হইতে রসগ্রহণ করা প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক ধর্ম্ম! রবীন্দ্র নাম এখানে সার্থক!

কেবল বোলপুরের প্রান্তরের কথা বলি কেন? কাব্যসুধাবাদী রবীন্দ্রনাথ নানা স্থানে ঐ প্রকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যেই অবস্থিতি করিতে ভালবাসেন। বঙ্গের সমতল বহু বিস্তৃত বন উপবনে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেব মস্তকোপরি আসিয়া স্বীয় প্রভাব দ্বারা যখন প্রাণিগণকে আকুলিত করেন,—যখন প্রখর রবিকিরণে উত্তপ্ত হইয়া আহার ত্যাগ করত পশুগণ বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া রোমন্থন

কাকলী দ্বারা মাধ্যন্দিন গ্রীষ্মাতিশয্যের দারুণ সন্তাপ প্রকাশ করে—বঙ্গের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ যখন দ্বিতলগৃহে দুগ্ধফেননিভ সজ্জিত সোফায় শয়ন করিয়া কেওড়া জলসিক্ত খস্‌খসিতে গৃহদ্বার আচ্ছন্ন করিয়া প্রলম্বিত টানা পাখা দ্বারা সমীরণ পরিচালিত করিয়া—নিদাঘতাপ কতক প্রশমিত করেন—তখন সর্ব্বসুখী রবীন্দ্রনাথ সুখশয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক ছায়াতপবিশিষ্ট সেই প্রান্তরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করতঃ তৃপ্তি লাভ করেন। আবার, নিদাঘ দিনান্তে দক্ষিণ পবন দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া খরস্রোতা পদ্মানদী যখন ভীষণ আকার ধারণ করে,—যখন পদ্মার সুতুঙ্গ তরঙ্গ রঙ্গ দেখিয়া সকলে সন্ত্রাসিত হয়—যখন কল্লোলিনী পদ্মা বৃহৎ বৃহৎ বাষ্পীয়পোত ও বৃহদাকার তরণী সকলকে গলাধঃকরণ করিবার আশয়ে বিকট মুখব্যাদান করে—যখন ছোট ছোট নৌকাস্থিত মাল্লাগণ পদ্মার ভীষণ ভঙ্গিমা দেখিয়া প্রাণ ভয়ে "দরিয়ার পাঁচপীর, আল্লা ও আকবর" স্মরণ পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে থাকে—তখন রবীন্দ্রনাথ ভাবি বিপদ সম্মুখে দেখিয়াও "বোট ছোড়" বলিয়া আপনার ফুলচাঁদ বোটে আরোহণ করেন। সেই সর্ব্বগ্রাসিনী খরস্রোতা পদ্মার বক্ষে উত্তাল তরঙ্গে বোট ভাসিয়া যাইতে থাকে। বোট-খানি তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে কখন দশহস্ত উর্দ্ধোত্থিত হয়, আবার কখন বিশ হস্ত নীচে পড়ে। এইরূপে কখন ডুবিয়া কখন উঠিয়া পদ্মার হিল্লোল সহ বোটখানি ভাসিয়া যায়। তখন রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে যে আনন্দ হিল্লোল উঠে, তাহার ভাব অপরে কি বুঝিবে? রবীন্দ্রনাথ সেই তরঙ্গায়িত পদ্মা-বক্ষে উচ্চাবচ গতিতে পরিচালিত বোটের ছাদে বসিয়া প্রকৃতির উৎকট দৃশ্যে এক অদ্ভুত সুখাস্বাদ করেন।

পদ্মার স্মরণে তাহার বর্ষাকালের পূর্ণ বলবিক্রমের কথা মনে পড়ে। তাহা হৃদয়কে কম্পিত না করিয়া ছাড়ে না। বর্ষাকালে পদ্মা স্ফীত হইয়া যখন দুই কুল প্লাবিত করে, তাহার স্রোতোবেগ যখন অষ্টগুণ বৃদ্ধি পাইয়া তীরগতিতে প্রবাহিত হয়, তখন কত গ্রাম, কত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নগর, কত বাজার, কত ঘরবাড়ী, কত বন জঙ্গল, কত গো মহিষ প্রভৃতি ইতর জন্তু পদ্মার নির্ম্মমবক্ষে ডুবিয়া ভাসিয়া দূর-দূরান্তরে চলিয়া যায়। কত রাজ্যপাট, কত বিষয় বৈভব মুখে করিয়া লইয়া পদ্মা কাহাকেও পথের কাঙ্গাল করে, আবার সেই সকল রাজ্য ও ধনসম্পত্তি পথের কাঙ্গালকে দিয়া হয় তো তাহাকে রাজেশ্বর করিয়া তুলে। বর্ষায় পদ্মার দিকে চাহিয়া

দেখিবে—কেবল শ্বেতাম্বুরাশি ধূ ধূ করিতেছে। তাহার কুল নাই, কিনারা নাই। পদ্মা বিপুল বক্ষ বিস্তার করিয়া গম্ভীররবে আপন মনে বহিয়া যায়। পদ্মা কাহার দশা কি করিল, তাহা ফিরিয়াও দেখে না। যে ব্যক্তি তাহার ভীষণবক্ষে আশ্রয় লইয়া নিতান্ত কর্ম্মের বশে কোন দূরতর স্থানে যাইতে থাকে, সেও সন্ত্রস্তচিত্তে কেবল লক্ষ্য স্থানের দিকে চাহিয়া থাকে। অপরদিকে চাহিবার তাহার অবকাশ থাকে না।

ঈদৃশক্ষেত্রে কবিকেশরী প্রকৃতির শোভা দেখিতে জানেন ও পারেন। তাঁহার কোন উদ্বেগ নাই; তিনি কবির ভোগ্য তত্ত্বরস গ্রহণে সম্যক্ উৎসুক থাকেন।

জ্যোস্নাবিধৌত রজনীতে পদ্মার সৌন্দর্য্য আর এক প্রকার। পদ্মার সকলই অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথ জ্যোৎস্নাময় রজনী দেখিলে পদ্মার এহেন বিচিত্রলীলা রঙ্গসময়েও ক্ষুদ্র ডিঙ্গিতে আরোহণ করিয়া উদ্বেগশূন্যহৃদয়ে চন্দ্রালোকবিভাসিত জলরাশির সহিত রজনীর মনোমুগ্ধকর ক্রীড়া সন্দর্শন করিয়া-ভাবসাগরে নিমগ্ন হন।

শীতকালে আর এক বৈচিত্র। শীতের প্রাদুর্ভাবে যখন সকলে হি হি করিতে থাকে, যখন শীতের কন্‌কনানিতে হস্তের অঙ্গুলীগুলিকে সোজা করা যায় না, বৃদ্ধগণ শীতে যখন কুব্জপ্রায় হইয়া যায়, অথবা প্রবহমান শীতবায়ু যখন তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ধরিয়া দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করে—ধনীযুবকগণ যখন নিত্য নূতন শীতাবরণ দ্বারা শরীর দিবার প্রশস্ত সময় পান, তখন কবি রবীন্দ্রনাথ দিবাবশানে এক অলষ্টার কোট মাত্র গাত্রে দিয়া, কটকী বা মোগলাই চটী পরিধান করিয়া ক্ষীণকায়া পোড়ই-নদী-সৈকতে ভ্রমণ করেন। বালকদিগের ন্যায় প্রকৃতি-নন্দনের শীতঘাত গ্রাহ্য হয় না। ঋতু-অনুযায়ী সকল সুখোপকরণ সম্পূর্ণ থাকিলেও তত্তাবৎ ত্যাগপূর্ব্বক শীতের কম্পনের মধ্যে বাতাসে সুখ অনুভব করা কেবল ঈদৃশ কবি হৃদয়েরই কার্য্য।

সৌন্দর্য্য রসমগ্ন এই কবির অর্দ্ধোক্তি স্মরণ করিয়াই বুঝি অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন—

সরল হৃদয় কবি
যেখানে মাধুরী ছবি

জ্যোস্নাতলে নদীকূলে
ঊষালোকে তরুমূলে
কত বকে ভুল।
প্রজাপতি মৃগ আঁখি
ফুলে অলি ডালে পাখী
গাছে গাছে ফুল।
দোলে লতা কাঁপে পাতা
চকাচকি ঠোঁটে গাঁথা
দেখিলে ব্যাকুল।
রমণি! তোমারে চেয়ে
ভেবোনা কি গেল পেয়ে
কি বকিল ভুল।
সরল হৃদয় কলি
যেখানে মাধুরী ছবি
সেখানে আকুল।

বোলপুরের বৈশাখী প্রচণ্ড রৌদ্রের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়া প্রসঙ্গাধীন অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে থাকিয়া নিশ্চিন্তমনে তথাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনকরতঃ পরমানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। এমন সময়ে তথায় সংবাদ পঁহুছিল, কলিকাতায় প্লেগ আসিয়াছে। কলিকাতায় প্লেগের শুভাগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কবিকেশরীর প্রেমার্দ্রচিত্ত বিচলিত হইয়া পড়িল।

প্লেগ রাক্ষসী ১৩০৩ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া বোম্বাই সহরকে ধ্বংস করিয়াছে। সহৃদয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট প্লেগদমন মানসে বিকট আইন প্রচার করিলে বোম্বাই সহরবাসীগণ আরও ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল,—কঠোর-রাজশাসনে কাহারো মানসম্ভ্রম ছিল না, পুরস্ত্রীদিগের লাঞ্ছনার সীমা পরিসীমা ছিল না। বোম্বাই সহরের অধিকাংশ ব্যক্তি সহরকে শ্মশান-ক্ষেত্রবৎ ভাবিয়া মান-ইজ্জতের ভয়ে দেশ-দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছিল। বোম্বাই সহরের সেই সকল কঠোর চিত্র বঙ্গদেশবাসীকে বড়ই সন্ত্রাসিত করিয়া রাখিয়াছিল। যখন প্লেগরাক্ষসী বোম্বাই সহরকে গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়াছে—তখন তাহার বঙ্গদেশে আসিতে কতক্ষণ? কলি-

কাতাবাসীগণ তজ্জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে বাস করিতেছিল। যূপকাষ্ঠ সন্নিহিত অজ ছিন্নমুণ্ডা অজকে দেখিয়া সভয়ে বাত্যান্দোলিত কদলীপত্র যেরূপ কম্পিত হইতে থাকে,—কলিকাতা সহরবাসীগণ বোম্বাই সহর-বাসীদিগের অভাবনীয় লাঞ্ছনা সন্দর্শন করিয়া তেমনি কম্পিত হইতেছিল। বৈশাখ মাসের প্রথমে যখন প্লেগের শুভাগমনবার্ত্তা সহরে প্রচারিত হইল, যখন 'করেন-টাইন ল' পাশ হইবার কথা সহরের চারিদিকে আন্দোচিত হইতে লাগিল, তখন যে যে দিকে পারিল, সে সেইদিকে দিগ্বিদিকশূন্য হইয়া পলায়ন করিল! সে লোক-পলায়ন-দৃশ্য আমার চিত্রপটে চিরাঙ্কিত হইয়া রহিয়া গিয়াছে, আজও স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এমন ভীষণ ব্যাপার, এমন অদ্ভুত দৃশ্য ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ কখন দেখে নাই। তখন কলিকাতা সহরের যে রাস্তার যে দিকে তাকাইয়া দেখি,—নর-নারীর স্রোত বর্ষার নদী স্রোতের ন্যায় অজস্রধারায় অপ্রতিহত বেগে চলিতেছে; ১৫ই, ১৬ই, ১৭ই বৈশাখ সহরে জনস্রোতের বিরাম ছিল না। সহরের গাড়ী পাল্কী ক্রমশঃ দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিল—অবশেষে তাহাও অপ্রাপ্য হইয়া উঠিল। ।৵০ আনা ॥০ আনা স্থলে ৬৲ ৮৲ টাকাতে আর ভাড়াটিয়া গাড়ী পাল্কী পাওয়া গেল না। যখন গাড়ী পাল্কী পাওয়া একেবারে দুর্লভ হইয়া পড়িল, তখন এই দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া কত ভদ্রপরিবারের অসূর্য্যম্পশ্যা রমণী কলিকাতা সহরের রাজপথে বহিষ্কৃত হইয়া পদব্রজে চলিয়া গিয়াছে—কে তাহার গণনা করিয়াছে! কত বালক, কত বালিকা কত যুবক, কত যুবতী, কত বৃদ্ধ, কত বর্ষীয়সী, কেহ কক্ষে, কেহ পৃষ্ঠে—অপোগণ্ড শিশুসন্তান লইয়া প্রাণভয়ে নক্ষত্রবেগে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছে। দৌড়িয়া যাইবার ব্যাপারই বা কি অদ্ভুত দৃশ্য!—দৌড়িয়া যাইতে যাইতে এক একবার পশ্চাদ্দিকে তাকায়—আরবার ঐ বুঝি আসিল, ঐ বুঝি টীকাদার আসিয়া ধরিল! ভাবিয়া কিয়ৎক্ষণ থমকিয়া দাঁড়ায়;—যখন দেখে, কেহ ধরিতে আসিতেছে না—তখন কতদূর অগ্রসর হয়। পঞ্চহস্ত পরিমাণ রাস্তা অগ্রসর হয় তো দশহস্ত রাস্তা পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া আইসে। এইরূপে নরনারীগণ অতিকষ্টে—অতি উদ্বেগে রাজপথ অতিক্রম করিয়া চলিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

বাঙ্গলা ভাষার লেখক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভূতপূর্ব্ব "আর্য্যদর্শন"-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ পাঁড়ে মহাশয়কে তাঁহার মানবতত্ত্বের অবশিষ্ট অংশ তাঁহার আর্য্যদর্শনে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। সে সময়ে নববাসের কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকায়, অবকাশ অভাবে, পাঁড়ে মহাশয় বেশী লিখিতে পারিতেন না। আর্য্যদর্শনের সহকারী-সম্পাদক পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের বিশেষ উত্তেজনায় একটু একটু করিয়া তিনি লিখিতেন মাত্র। পাঁড়ে মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত নরবাস অধিক দিন ছিল না। সরিকি গোলযোগের জন্য তাহা উঠাইয়া দিতে তিনি বাধ্য হন। তাহাতে তাঁহার প্রভূত অর্থ-ক্ষয় হয়। এই সময়ে মানবতত্ত্বের অবশিষ্ট অংশ হস্তে লিখিয়া পুস্তকাকারে তিনি প্রকাশ করিলেন ও কিছুদিন পরে একটী প্রেস করিলেন। এই সময়ে "বিজ্ঞানদর্পণ", "সহচরী" ও "জাহ্নবী" নামে তিনখানি কাগজের সম্পাদকতা—একা বীরেশ্বর বাবু করিতে লাগিলেন। মাসিক কাগজে যে বিশেষ আয় হয় না, তাহা অনেকেই জানেন; সুতরাং অতিকষ্টে দিবানিশি পরিশ্রম করিয়া, কয়েক বৎসরমাত্র, বীরেশ্বর বাবু এই তিনখানি কাগজ চালাইয়াছিলেন।

পরে ধর্ম্মবিজ্ঞান ও অদ্ভুত স্বপ্ন নামক দুইখানি পুস্তক বীরেশ্বর বাবু প্রণয়ন করেন। মানবতত্ত্ব ও ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থ মৌলিক উৎকৃষ্ট হইলেও এদেশের এখনও এমন অবস্থা হয় নাই যে, যাহাতে গ্রন্থকারের একটা নির্দ্দিষ্ট আয় হয়। যদিও বীরেশ্বর বাবু একবার এন্ট্রান্সের পরীক্ষক হইয়াছিলেন এবং অন্যান্য উপায়ে কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্ব দেনা চারি পাঁচগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় পৈতৃক দুই আনা অংশের প্রাপ্ত বিষয় রক্ষা করাও কঠিন হইয়া উঠিল। ৭।৮টী পুত্রের লালনপালন ও শিক্ষাদি ব্যয়নির্ব্বাহ করা,—কলিকাতার বাসাখরচ নির্ব্বাহ করা দুর্ঘট হইল দেখিয়া, বীরেশ্বর বাবু স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার প্রচলন চেষ্টা কখন করেন নাই। তিনি দেখিলেন,

স্কুলপাঠ্য প্রায় সমস্ত বাঙ্গলা পুস্তকই ইংরেজীর অনুবাদ; দেশীয় বিষয়ের শিক্ষার উপযোগী পুস্তক বাঙ্গালায় অতি অল্প। সেইজন্য তিনি আর্য্য-পাঠ, আর্য্যশিক্ষা, নীতিকথামালা প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, এবং ভালো বাঙ্গলা ব্যাকরণের অভাবে, জষ্টিস শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্ররোচনায়, তিনি একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে "পাঁড়ে ব্রাদার্স" নাম দিয়া পুত্রগণের জন্য একখানি দোকান করিয়া দিলেন। প্রথমে ঐ দোকানে পুস্তক বিক্রয় হইত, পরে তৎ-সঙ্গে দেশী বস্ত্র বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইল। এক্ষণে কেবলমাত্র বস্ত্রই এই দোকানে বিক্রয় হইয়া থাকে। দেশী বস্ত্র অধিকতর সস্তা করিবার জন্য এখন পর্য্যন্তও তিনি নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন। যাহাতে দেশের লোকে দেশী বস্ত্রের অনুরাগী হয়, তাহার চেষ্টা তিনি বিধিমতে করিয়া থাকেন। ধর্ম্মের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মাইবার জন্য বীরেশ্বর বাবু তদ্বিরচিত মানবতত্ত্ব, ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থে ধর্ম্মের অনেক গূঢ় কথা আলোচনা করিয়াছেন।

যখন মানবতত্ত্ব প্রচারিত হয়, তখন এ দেশ পাশ্চাত্যভাবে পূর্ণ ছিল; তাই সে সময়ের সমস্ত সংবাদপত্র ও সমস্ত বিজ্ঞব্যক্তি,—পাঁড়ে মহাশয়ের পুস্তকের তর্কযুক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। হিন্দু-ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও খৃষ্টীয়ধর্ম্মের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য, বীরেশ্বর বাবু সর্ব্বপ্রথম এই শ্রেণীর গ্রন্থ লিখিবার চেষ্টা করেন। হিন্দুধর্ম্ম যে নিকৃষ্ট নহে,—পরন্তু একমাত্র শ্রেষ্ঠ মানবীয় ধর্ম্ম, তাহা ইনিই প্রথম হইতেই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

লীলাবতী, বিজ্ঞানসার, উপক্রমণিকা, মানবতত্ত্ব, ধর্ম্মবিজ্ঞান, অদ্ভুত-স্বপ্ন বা স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব, ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত, আর্য্যচরিত, আর্য্যপাঠ, আর্য্যশিক্ষা, নীতিকথামালা, কবিতা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়-ভাগ, শিশুবিজ্ঞান, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, শিশুশিক্ষা, বাঙ্গালা শিক্ষা প্রথম-ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ বীরেশ্বর বাবু প্রণয়ন করিয়া-ছেন। এই সমস্ত পুস্তক অতি উৎকৃষ্ট ও নূতন প্রণালীতে লিখিত। এতদ্ভিন্ন বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, জ্ঞানাঙ্কুর প্রভৃতি অনেক পত্রেও বীরেশ্বর বাবু বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সাবিত্রী লাইব্রেরী প্রভৃতি নানা সভায় অনেক প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাও তিনি করিয়াছেন। স্বদেশের হিত-

সাধন ও গৌরববৃদ্ধি,—তৎসমস্তেরই উদ্দেশ্য। বীরেশ্বর বাবুর সমস্ত পুস্তক ও সাবিত্রী লাইব্রেরীতে পঠিত এবং সাবিত্রী নামক পুস্তকে প্রকাশিত "হিন্দুর অবনতি" শীর্ষক প্রবন্ধ এবং সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত "আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য" শীর্ষকপ্রবন্ধ সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

বীরেশ্বর বাবু একজন চিন্তাশীল পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার মৌলিক চিন্তা ও স্বাধীনভাব,—তাঁহার ধর্ম্মবিজ্ঞান ও মানব-তত্ত্বে বিশিষ্টরূপে প্রকটিত। এই গ্রন্থ দুইখানি সাহিত্যের গৌরব। তর্কতত্ত্বেও পাঁড়ে মহাশয় সুপণ্ডিত। তর্কে, সহজে কেহ তাঁহাকে হটাইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

ছায়াসতী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ইন্দ্রপ্রিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "হার কিকুইবে, অনেক ত আছে, আমি হার চাহিতেছি না, আমি মার পা দুখানি দেখিতে পাইলেই সুখী হই।" রমণীমোহন সাদরে ইন্দ্রপ্রিয়ার চিবুক ধারণ করিয়া বলিলেন, "সুখী হইবে তুমি, তায় চিন্তা নাই, আমার ইন্দুমুখি ইন্দ্রপ্রিয়া।" ইন্দ্রপ্রিয়া সলজ্জায় মুখ নম্র করিলেন। কুমার হাসিয়া বলিলেন, "এখনও আমাকে এত লজ্জা! আমি চাহিলেই প্রফুল্ল অরবিন্দ নত হইয়া পড়ে, আমার জীবন-কৌমুদি তুমি জান না যে, আমি তোমায় দেখিতে কত ভাল বাসি।" সন্ধ্যা হইয়াছে, ফরাশ কক্ষে প্রবেশ করিয়া ঝাড়ে দেয়াল-গিরিতে বাতি লাগাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। অতুল গৃহে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই নাও তোমার দোলরি।" কুমার মুক্তার কেশটী হস্তে লইয়া বলিলেন, "এখন তুমি বাহিরে যাও, আমি যাইতেছি।" অতুল ইন্দ্রপ্রিয়ার দিকে পাপ চক্ষে চাহিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কুমার মুক্তামালা লইয়া ইন্দ্রপ্রিয়ার কণ্ঠে

ইন্দ্রপ্রিয়া লজ্জিতভাবে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। রমণীমোহন অন্যমনস্কভাবে বাহিরে গমন করিলেন। ইন্দ্রপ্রিয়া সর্ব্বদা স্বামীর নিকট প্রার্থনা করেন, যে মাতার কাছে যাইবেন। রাজকুমারও অতুলকে কোন্নগরে যাইয়া মিলনের উপায় করিতে বলেন। কিন্তু কুটীল অতুলকর মনে মনে নানারূপ কু-মতলব আঁটিতেছে। ইন্দ্রপ্রিয়ার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ, সরলা বালিকা বাল্যসীমা অতিক্রম না করিতে করিতে প্রসূতি সীমায় পদার্পণ করিলেন, ইন্দ্রপ্রিয়া নয় মাস গর্ভবতী। রাজকুমার অতিশয় ভাবিত; কারণ তাঁহার পিতা অতিশয় রাগত হইয়াছেন। বলিয়াছেন, কি নিমিত্ত তুমি সর্ব্বদা অনুপস্থিত থাক? রাজকুমার ক্লিষ্ট অন্তরে খালধারের উদ্যানে উপবিষ্ট; অতুল কর নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল, "কুমার, ভয়ানক সময় উপস্থিত!" রাজকুমার সত্রাসে বলিলেন, "কি! কি! অতুল বলিল, অদ্য মহারাজের নিকট গিয়াছিলাম, তিনি মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমি সম্বন্ধ করিয়াছি, খিদিরপুরের রাজা বাহাদুরের কন্যার সহিত রমণী মোহনের বিবাহ দিব, সে মেয়ে বেশ সুন্দরী। পরিণয়ের দিন স্থির করিয়াছি, আগামী মাসের তৃতীয় দিবসে এবং প্রতি রাত্রে তাহাকে বাটীতে উপস্থিত থাকিতে হইবে, যদি সে এ বিবাহে অস্বীকার করে, তবে তাহাকে ত্যজ্য পুত্র করিলাম।" রাজকুমার সকাতরে বলিলেন, "অতুল, কি করে ভাই ইন্দ্রপ্রিয়াকে ছেড়ে থাকিব, সে বিবাহের কথা শুনিলে কি বলিবে, তাহাতে তাহার গর্ভাবস্থা, আমিত ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না, তুমি যদি মহারাজকে আমার এই অবস্থা জানাও।" অতুলের পাপি মনে ঘৃণিত অভিসন্ধি লুকাইত রহিয়াছে; কল্পিতভয়ে বলিল, "না ভাই, আমি তাহা পারিব না, তাহা হইলে মহারাজ আর আমাকে তাঁহার বাটীতে প্রবেশ করিতে দিবেন না, তোমারও তাহাতে নিস্তার নাই, আমার বোধ হইতেছে।" কুমার ভগ্নহৃদয়ে বলিলেন, "তবে ইন্দ্রপ্রিয়াকে কিরূপে এই নিষ্ঠুর নৈরাশ বাক্য জানাই, একেত তাহার সপত্নী হইবে, তার উপর আমি প্রতি বিভাবরী তাহার নিকট থাকিতে পারিব না, এক্ষণে উপায়।" অতুল মনে মনে হাসিয়া কৃত্রিম বিমর্ষভাবে বলিল, "তার আর উপায় কি হবে? তাঁহাকে প্রকাশ্যরূপে বল, মহারাজের এই হুকুম, তাহাতে

তুমি কিঁ করিবে। দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রপ্রিয়া যদি তোমার রক্ষিতা মহিলার ন্যায় থাকে, তাহা হইলেও তাহার সৌভাগ্য।" নির্ব্বোধ রাজকুমার ধূর্ত্তের প্রবঞ্চনা জালে জড়িত হইলেন, পাষণ্ড অতুল করের মতেই মত দিলেন। অতুল উৎসাহ যুক্তস্বরে বলিল, "আর ত দিন নাই, আজ হইল পোনেরই পৌষ, দোসরা মাঘে বিবাহ, অতএব এখনই ইন্দ্রপ্রিয়াকে বলিয়া রাখ; নচেৎ সেই সময়ে গোলমাল করা উচিৎ নয়।" নির্দ্দয় রাজকুমার পাপাত্মা বন্ধুর সঙ্গে একত্রিত ভাবে যেন গর্ভিণী হরিণীকে বধ করিতে বিষাক্ত বাণ হস্তে অগ্রসর হইয়া ইন্দ্রপ্রিয়ার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দুর্ভাগা অবলা গর্ভভারে পীড়িতা, নিশ্চেষ্ট ভাবে পর্য্যঙ্কে শায়িত আছেন। অভাগিনী জানেন না যে, নৈরাশ কাল সর্প ফণা বিস্তার পূর্ব্বক দংশন করিতে আসিতেছে; নিষ্ঠুরগণ কিরূপে এই সুন্দর লাবণ্যজনিত মোহের পুত্তলিকে দুর্ভাগ্য আতপ তাপে নিক্ষেপ করিবে, যে নির্ম্মল কমলানন দর্শন করিলে শত্রুর মনও আর্দ্র হয়, তোমরা আত্মীয় হইয়া কিরূপে দুর্ব্বাক্য শল্যে তাহাকে বিদ্ধ করিবে। ইন্দ্রপ্রিয়া স্বামীর সহিত অতুল করকে আগত দেখিয়া, সলাজে পর্য্যঙ্ক হইতে উঠিয়া ভূমিতলে কারপেটের উপর উপবিষ্টা হইলেন, বন্ধুদ্বয় কৌচে উপবিষ্ট হইলেন। কুমার ধীরে ধীরে বলিলেন, "ইন্দ্রপ্রিয়া! আমি তোমায় একথা জানাতে দুঃখিত হইতেছি, তথাপি না জানালেও নয়, আমার পিতা আগামী মাসের তৃতীয় দিবসে আমার বিবাহ দিবেন এবং তিনি নিজে যে বাটীতে থাকেন, সেই বাটীতে আমাকেও প্রতি রাত্রে উপস্থিত থাকিতে হইবে।" ইন্দ্রপ্রিয়ার সুমোহন বদন শবাকার ধারণ করিল, শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "সে কি নাথ! আবার বিবাহ কি? ভদ্রলোকে কি স্ত্রী সত্বে আবার বিবাহ করেন? শ্বশুর মহাশয়কে জানাও যে, তুমি যে লুকাইয়া বিবাহ করিয়াছ। তিনি আমার এই অবস্থা শুনিলেই দয়া করিবেন।" কুমার বলিলেন, "আমার এতদূর সাহস হয় না যে, তোমার কথা তাঁহাকে বলিব, আর আমি অন্য বিবাহ করিলেই বা তোমার কি ক্ষতি—তুমি যেরূপ সুখে আছ, সেইরূপই থাকিবে, তোমার সন্তানাদি হইলে তাহাদিগেরও সুখে রাখিবার উপায় করিয়া দিব।" ইন্দ্রপ্রিয়া ক্লেশ

সন্তান কি তোমার সন্তান নয়? এ কি ঘৃণিত কথা বলিতেছ।" নির্দ্দয় রাজকুমার বলিলেন, "আমার পিতা ব্রাহ্ম, আমিও ব্রাহ্ম, আমার কিরূপ দুই স্ত্রী সম্ভবে? এই কারণে তোমার সন্তানেরা প্রকাশ্যভাবে আমার সন্তান হইতে পারিবে না।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমনুজেন্দ্র দত্ত।

সুর।

অবশ হৃদয়ে করি ভর,
কে তুই—বহিয়া যাস করি তর্‌তর্?
আধ জাগা আঁখি দুটি,
তোর পায় পড়ে লুটি,
পরশিতে বর বপু—দিক ভোলে কর।

হায় হায়-বৃথা সে প্রয়াস!
তোর যে ছলনা দেখি নরে বার মাস।
অদেখা মোহিনী বেশে,
দাঁড়াস নিকটে এসে,
অমিয়া ঢালিস দিয়া মধুরিম হাস।

তবু ভুলে নাহি দিস ধরা,
তোর কাজ দেখি, শুধু নরে ক্ষীণকরা।
ধরায় কি জানে কেহ,
ল'য়ে অশরীরি দেহ,
খেলিতে এমন খেলা প্রাণ-মন-হরা!

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী (মুস্তোফী)

আরতি।

যতনে রেখেছি তুলি' প্রেমের অতসী
মাখাইয়া সযতনে অশ্রুর চন্দন
ভরিয়া হৃদয় থালা মোর—হে রূপসি
পূজিতে তোমার অই অলক্ত চরণ !

জীবন যৌবন এই রাগ ঢল ঢল
যাহা চাহ দিব আর প্রীত্যর্থে তোমার।
একবার, হে রূপসি, ছড়াইয়া আলো
এস এই শূন্য মনোমন্দিরে আমার !

জানিনাক আবাহন, কারে বলে আর !
অর্দ্ধেক জীবন ধরি' জাগ্রতে নিদ্রায়
আকুল নয়ন জলে—অতৃপ্ত আশায়
স্মরিয়াছি, হে রূপসি, কতই তোমায় !

বাজে অই শঙ্খ ঘণ্টা—আসে সন্ধ্যাসতী ;
এই বেলা, এস, করি প্রেমের আরতি।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

চিত্রা ও গৌরী।

বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম ঔপন্যাসিক কবি শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। দুইটি চিত্র উপন্যাস ডিমাই বারো পেজি ১১৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ৸৹ বারো আনা। ছাপা ও কাগজ উত্তম, বিলাতীর ন্যায় বাঁধাই, অতি সুন্দর। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

"চিত্রা ও গৌরী" উপন্যাসের নামটি যেমন শ্রুতিমধুর—অলৌকিক ঘটনা দুইটিও ততোধিক মধুরতায় পূর্ণ; চিত্রা উপন্যাসে বর্ণিত নায়ক "সুরেশচন্দ্র," নায়িকা "চিত্রা",—বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত যুবক সুরেশচন্দ্রের অসৎ সংসর্গে পাপের ভীষণ পরিণাম; আর তাহার পত্নী চিত্রা, প্রকৃত প্রস্তাবেই সতীসাধ্বিসাবিত্রী; জীবন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সুরেশচন্দ্রকে উদ্ধার করিয়াই তাহার মৃত্যু;—সে চরিত্র পাঠে পাঠক-পাঠিকা অনেক শিক্ষা লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

"গৌরী" ভাষা, ভাব, বর্ণনা বড়ই উপাদেয়; বাহ্যিক জগতের সহিত আধ্যাত্মিক জগতের সম্বন্ধ; সদ্‌গুরুর উপদেশ, পাপতাপময় সংসারে শান্তিহারা হইলে, ধর্ম্মজীবনে পারমার্থিক লাভ করা যায়; এবং ধর্ম্মজীবনের উন্নতি, বাহ্যিক আড়ম্বরশূন্য মূর্ত্তিতে সূর্য্যদেবের ন্যায় জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া বিমল আনন্দের হেতু হয়।

ত্রেতাযুগে রাবণরাজা স্বীয় মহিষী মন্দোদরীকে কহিয়াছিলেন, "দৈবাধীন্ মিদং ভদ্রেজীবতা কিন্ন দৃশ্যতে" অনেকদিন বাঁচিয়া থাকিলেই অনেক দেখিতে হয়; হারাণবাবুর "গৌরী" উপন্যাসে গৌরীর পিতা দুর্গাদাস সংসারে অনেক দেখিলেন, শেষে "মা বিশ্বপ্রসবিনী জননী, আমায় কোলে লও! লও মা;—আমার মনুষ্য জন্মের সাধ মিটিয়াছে" এই বলিয়া অনন্তধামে গমন করিলেন। আর দেখাইতেছেন,—"জীবের মৃত্যু নাই, মরা বাঁচা তুল্য মূল্য।"

আমাদের বিশ্বাস হারাণবাবুর সরল বিশুদ্ধ ও মনোহর কবিত্বপূর্ণ ভাষার সুলিখিত সুরুচিসঙ্গত উপন্যাস দুইটি; আমাদের ন্যায় সকলেই একাসনে পাঠ সমাধা করিয়া যারপরনাই মুগ্ধ হইবেন।

BENGAL LIBRARY
27. JUN. 19

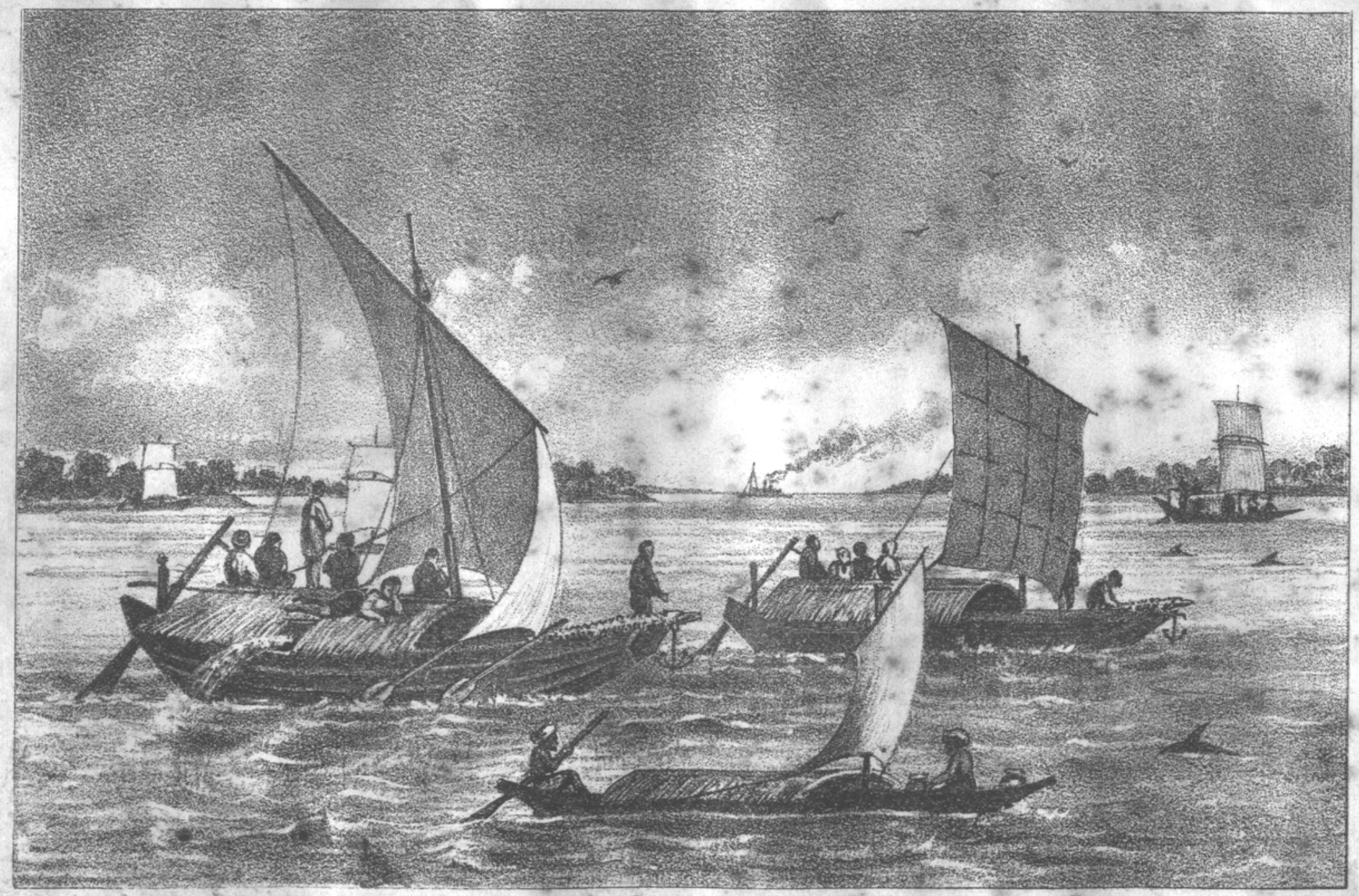

FOOT & TEGAY, LITHO. LONDON.

X/5 640
7197
BENGAL LIBRARY
4 JUL.

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক পত্র।)

নবম বর্ষ। } ১৩০৮ সাল, বৈশাখ। { ১০ম সংখ্যা।

বিক্রয় কাহাকে বলে।

(একটি প্রশ্ন।)

আজিও সকলে গ্রাহ্য করিতেছেন না, একটি মহা বিক্রয় পাপে বঙ্গদেশের দুই তিনটি শ্রেষ্ঠ জাতি ক্রমশঃ অধঃপতিত হইতেছেন। যদিও আজ আমরা সাধারণ গঠিত একটি চর্ব্বিত চর্ব্বণ প্রসঙ্গের পুনরুক্তি করিতেছি, তথাপি এতৎ প্রসঙ্গে আমরা একটি নূতন কথা জানিতে চাহিব।

পুনরুক্তি করিতেছি, আমাদের আধুনিক বৈবাহিক প্রথার কথা। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এই সুন্দরী প্রথার কেমন সুন্দর পবিত্রতা ছিল, এখন সেই প্রথা কতদূর কদর্য্য হইয়া পড়িয়াছে, বিবেচনাশক্তিসম্পন্ন আর্য্যসন্তান মাত্রেই বোধ হয় অহরহ দর্শন করিতেছেন, কায়স্থ ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহ আজকাল যেরূপ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, বড় বড় ধনবানেরা না হউন, গৃহস্থ ঘরের কন্যার পিতারা তদ্দ্বারা অতি শীঘ্রই পথের ভিখারী হইবেন, এইরূপ লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন যে প্রকারে বর কন্যার বিবাহ হয়, তাহাতে কন্যার পিতার নিকট হইতে পণ গ্রহণ পূর্ব্বক বরকে বিক্রয় করাই কি বরের পিতার ব্যবসা হইতেছে না? পূর্ব্বে নিম্ন-শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা কন্যা বিক্রয় করিত, এখনও অনেকে করে; সেই দোষে ভদ্র সমাজের ব্রাহ্মণেরা তাহাদের সহিত সামাজিকতা রাখেন না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইত। তদ্দেশং পতিতং মন্যে যদ্দেশে শুক্র বিক্রয়েৎ।—ইহার অর্থ এই, যে দেশে শুক্র বিক্রীত হয়, সে দেশটা পতিত বলিয়া গণ্য।

উত্তর।—যাহারা কন্যা বিক্রয় করিত কিংবা করে, তাহারা গরীব

লোক, সেই জন্য তাহারা সমাজে মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না; কিন্তু আজকাল ভদ্রবংশীয় বড় বড় ধনপতিগণ স্বচ্ছন্দে পণ গ্রহণ করিয়া বিষয় বৃদ্ধি করিতেছেন, কত শত দরিদ্র বৈবাহিককে এককালে ফতুর করিয়া ফেলিতেছেন, ইহাকে কি শুক্র বিক্রয় পাপ বলে না? তবে বিক্রয় করা কাহাকে বলে?

কন্যা বিক্রয় করিলে শুক্র বিক্রয় করা হয়, পুত্র বিক্রয় করিলে তাহা হয় না, শাস্ত্রে কি ইহার কোন প্রকার বর্জ্জিত বিধি আছে? আমরা জানি, কুত্রাপি নাই। যাঁহারা পুত্র বিক্রয় করিতেছেন, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে সমাজে মাথা উচ্চ করিয়া মহাগৌরবে বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছেন। কেন? তাঁহারা কি শুক্র বিক্রয় পাপে পাপী নহেন? অবশ্যই পাপী। তবে কেন তাঁহাদিগকে সমাজ মধ্যে খর্ব্ব করা না হয়?—কে করিবে?—লোক নাই—কেবল ইহাই একমাত্র উত্তর।

সাময়িক পত্রে, সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে, দৈনিক সংবাদ পত্রে, বক্তা-মহাশয়গণের দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতায়, নাট্যশালার রঙ্গমঞ্চে, এবং প্রচলিত যাত্রার উপসংহারে এই ব্যাপারের প্রচুরাধিক প্রচুর আন্দোলন হইতেছে, কেহই কিছু গ্রাহ্য করেন না। স্রোত যেরূপ বেগে চলিতেছে, বর্ত্তমান ঔদাসীন্যে সেই বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, ইহাই সর্ব্বদা মনে হয়। কায়স্থ জাতির বিবাহ ব্যয় লাঘব অভিলাষে, রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুরের নাটমন্দিরে দিনকতক এক সভা বসিয়াছিল; এখন আবার পাথুরীয়া ঘাটার ৺খেলাচন্দ্র ঘোষের বাটীতে মধ্যে মধ্যে ব্যয় নিবারিণী সভা হয়, নয়মাসে ছয়মাসে এক একখণ্ড বিবরণি প্রকাশ পায়—সভায় কেবল বক্তৃতা হইয়া থাকে; কার্য্য কিছুই হয় না। সভাই বা কোথায়! বর্ষাবধি সে সভার নাম গন্ধও শুনা যায় নাই, বাবু রমানাথ ঘোষ এবং বাবু পশুপতিনাথ বসু বৈবাহিকক্ষেত্রে উদাসীন থাকিবার কারণ কি?

সভায়, বক্তৃতায় প্রবন্ধে অথবা অভিনয়ে কিছুই হইবে না। যাঁহাদের সংকল্প নাই, দৃঢ়তা নাই, প্রতিজ্ঞা নাই, মূল কথায় যাঁহাদিগের আদৌ ঐক্য নাই, তাঁহারা সভা করিয়া কি করিবেন!—নাট-মন্দিরের সভার সময় জনকতক মান্যগণ্য কায়স্থ সন্তান অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন;—দলীলে লেখা ছিল, পুত্রের বিবাহে কন্যার পিতার নিকট পণের দাবি করিব না;

লেখা ছিল, কিন্তু স্বাক্ষরকারীদিগের ভিতর কেহ কার্য্যকালে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। একটি ভদ্রলোক ঐ দলের একজনের নিকট প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের হেতু জিজ্ঞাসু হইয়া উত্তর পাইয়াছিলেন, "কি করিব ভাই, গৃহিণীর মত হয় না, অল্প টাকায় পুত্রের বিবাহ দিতে।"

এ প্রকার সাহসী বীর পুরুষ যাঁহারা, সভার অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিয়া তাঁহারা পরিণামে উপহাসাস্পদ হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। এক-জনের চেষ্টায় অথবা দুই একজনের অঙ্গীকারে সমাজের কার্য্য হয় না;—বিশেষতঃ কায়স্থ ব্রাহ্মণের বৈবাহিক কার্য্যটি নিতান্ত ক্ষুদ্র ব্যাপার নহে; যাঁহাদের মতে সমাজ চলিবে, দুর্ভাগ্য বঙ্গে তাঁহারা কদাচ একত্র মিলিত হইয়া একমতে কার্য্য করিবেন না, বহু দৃষ্টান্তে এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা পতিপন্ন হইয়াছে। সমাজে লোক নাই। একথা বলিলে লোকেরা আমাদের উপর তুষ্ট হইবেন না; অতএব আমরা বলিব, সমাজের মস্তক নাই। মস্তকশূন্য সমাজের কেহই সমাজ বলিয়া গণনা করে না। এরূপ অব-স্থায় এ সমাজে সমাজপতির দ্বারা একটা কোনরূপ বন্ধন হইবে, এরূপ আশা অল্প; অথচ পুত্র বিক্রয় নিবারিত না হইলে সমাজের মঙ্গল নাই। এইজন্য কেহ কেহ রাজবিধির আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিবার উদ্যোগে আছেন। হিন্দু সমাজের কার্য্যে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি রাজার হস্তক্ষেপ আমা-দের বাঞ্ছনীয় ছিলনা, কিন্তু রাজা যখন স্ব ইচ্ছায় মধ্যে মধ্যে আমাদের সামাজিক ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, বর কন্যার একত্র বাসের বয়ঃ-ক্রম বিধিবদ্ধ করিয়া যখন দণ্ডবিধির অধীন করা হইয়াছে, পুত্র বিক্রয় বন্ধ করিবার আইনের প্রার্থনা করা তখন অপরামর্শসিদ্ধ হইবে না, বর্ত্তমান বৈবাহিক প্রথার কু লক্ষণ দেখিয়া এখন আমাদের এইরূপ ধারণা জন্মিতেছে।

আয়ুর্ব্বেদে দোষত্রয়

রোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই দোষ তিনটী আমা-দিগের শরীরের ধারক ধাতুত্রয়—বাত, পিত্ত, কফ। বায়ু পিত্ত কফ ব্যতীত স্থূল শরীরের—প্রাকৃতিক দেহের অস্তিত্বের সম্ভাবনা কোথায়? রস-রক্তাদি স্থূল ধাতুর সহিত দেহের নিত্য সম্বন্ধ হইলেও, বায়ু পিত্ত কফই তাঁহা-দিগের একমাত্র ধারক। রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র—এই সপ্ত-

ধাতুরই সমবায়রূপ শরীরে বাত পিত্ত কফের অনুলোম বিলোমে বাহ্যতঃ ও আভ্যন্তরতঃ বিবিধরূপ অবস্থান্তর পরিলক্ষিত হয়; আর এই ধাতু-ত্রয়ই সপ্ত স্থূলধাতুর ধারক বলিয়া, সূক্ষ্ম ধাতুনামে অভিহিত হইয়া থাকে। আর পূর্ব্বোক্ত সপ্ত স্থূলধাতুকে মলিন করিয়া থাকে বলিয়া, ঐ সূক্ষ্ম ধাতু-ত্রয়ের অপর নাম মল; অপিচ ঐ সপ্তস্থূল ধাতুকে আশ্রয় করিয়া, এই সূক্ষ্ম ধাতুত্রয় দেহকে দূষিত করে বলিয়া, ইহাদের আর একটী নাম দোষ। যাহা হউক, এই দোষ মল বা ধাতুর সহিত স্থূল-ধাতু-সপ্তকের যেরূপ সম্বন্ধ ও তাহাতে যেরূপ দোষোৎপত্তি হেতুক বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহারই যথারীতি বিন্যাস করিতে অদ্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। এক্ষণে বিবেচ্য—

কফ কি ?

কে অর্থাৎ জলে যাহা ফলে, তাহাই কফ; কিংবা কে মস্তকে যাহা ফলে, তাহাই কফ, (ক+ফল [নিষ্পত্ত্যর্থক]+ক্বিপ্) ইহার আর একটী নাম শ্লেষ্মা; যে পদার্থ শ্লেষণ বা আলিঙ্গন করিয়া থাকে, অন্যান্য ধাতুর সহিত তাহার নাম শ্লেষ্মা। চরকে মহর্ষি অগ্নিবেশ বলিয়াছেন,—

গুরুশীতমৃদুস্নিগ্ধমধুরস্থিরপিচ্ছিলাঃ।
শ্লেষ্মাণঃ——।”

শ্লেষ্মা গুরু, শীতল, মৃদু, স্নিগ্ধ মধুর, স্থির ও পিচ্ছিল। আমাদিগের স্থূল ধাতুর মধ্যে যাহারা ইহাদের সমগুণ, তাহাদিগের সহিত শ্লেষ্মার সগুণ সম্বন্ধ। যেমন আমাদিগের দেহস্থ রসধাতু স্নিগ্ধকর বলিয়া, ইহা শ্লেষ্মার সমগুণ বা সগুণ। রসের স্বতঃ গতি নাই বলিয়া স্থির। এইরূপ রসের চরম পরিণতি যে শুক্রে নির্দ্দিষ্ট, তাহাও শ্লৈষ্মিক ধাতু। শ্লেষ্মার সকল গুণই শুক্রের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহার অপলাপ করিবার যো নাই।

তাহা হইলেও, শ্লেষ্মার প্রধান অধিষ্ঠান মস্তকে। মস্তকের মস্তিষ্কও শ্লৈষ্মিক ধাতু। শ্লেষ্মক্ষয়ে—শুক্রশোষে গুরু শীতাদিগুণের বিপরীত গুণের আবির্ভাব হওয়ায়, ইহার বিপরীত-ধর্ম্মা বায়ুর প্রকোপ ঘটায়, শ্লেষ্মাধিষ্ঠান মস্তিষ্কের শূন্যতা বোধ ঘটে। আরও তজ্জন্য ঐরূপ মেহাদিহেতুক শুক্র-ক্ষয় ব্যাধিতে শিরঃশূন্যতার আবির্ভাব হয়। আর মস্তিষ্ক-কোষের নিম্নে মেরু-দণ্ডের ঊর্দ্ধ প্রান্তের বন্ধনীই ত স্নায়ুবন্ধনী! সেই শিরঃশূন্যতা এই স্নায়ুবন্ধনীর বিকৃতিতে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য (Nervous Debility) হয়। স্নায়ু

বায়ুবাহিনী নাড়ী বলিয়া, শ্লেষ্মক্ষয়ে বাতপ্রকোপজন্য রোগের—শিরঃ শূন্যতাদির সহিত অপরাপর বাতজরোগের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

পিত্ত কি ?

অপি উপসর্গের উত্তর পালনার্থক দে ধাতুর সহ ক্ত প্রত্যয় যোগে বা ছেদনার্থক দে ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় যোগে পিত্ত নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে অর্থ হইতেছে, প্রকৃতাবস্থায় শরীরের রক্ষা করে যে, কিংবা বিকৃতাবস্থায় নষ্ট করে যে, তাহাই পিত্ত। পিত্তগুণ সম্বন্ধে মহর্ষি অগ্নিবেশ বলিয়াছেন,—

"সস্নেহমুষ্ণতীক্ষ্ণঞ্চ দ্রব্যমম্লসরং কটু।"

পিত্ত আমাদিগের শরীরের উষ্ণভাব। পিত্ত ভিন্ন আর উষ্মা নাই, ইহাই আয়ুর্ব্বেদবক্তা ঋষিদিগের মত। এক্ষণে এই উষ্মার অধিষ্ঠান নির্ণয় করিতে গেলে, বহুস্থান দেখা গেলেও, পিত্তকোষ যকৃৎই যে প্রধান, তাহার নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। আবার সবিশেষ অবধানতার সহিত দেখিলে, এই উষ্মার সহিত রক্তসঞ্চালনের সম্বন্ধ থাকায়, স্থূলতঃ রক্ত পিত্তের সগুণ ধাতু। অপিচ রঞ্জক পিত্তকর্ত্তৃক রাগযুক্ত হয় বলিয়া, রক্ত নামের সার্থক্য। আর তাই পিত্তবিকারে রক্তজন্য বিকারের আবির্ভাব সম্ভবপর। যে পিত্তোষ্মজন্য, দেহস্থ উষ্মার বৃদ্ধি বা জ্বর হয়, তাহারই অতিবৃদ্ধিহেতুক রক্তদূষিত হইয়া, রক্তপিত্তের উদ্ভব হইয়া থাকে। এইজন্য রোগবিনিশ্চয়ের পঞ্চনিদানে কথিত হইয়াছে,—

তদ্‌যথা জ্বরসন্তাপাদ্ রক্তপিত্তমুদীর্য্যতে।

অত্যন্ত জ্বরসন্তাপহেতুক রক্তপিত্তের উদ্ভব হয়। এইরূপ হইবার কারণই হইতেছে, রক্তপিত্তের সগুণত্ব-সম্বন্ধ।

বায়ু কি ?

বহনার্থক বা গমনার্থক বা ধাতুর কর্ত্তৃবাচ্যের পদ হইতেছে বায়ু; যাহা বহন করে বা গমনশীল, তাহাই বাত বা বায়ু নামে অভিহিত। ইহার অপর নাম অনিল। ইহাদ্বারা প্রাণী জীবিত থাকে বলিয়া, (অন [জীবনার্থক] + ইলচ্) অনিল নামের সার্থক্য। শাস্ত্রে আছে, "বায়ুরেব প্রভুঃ।"—বায়ুই একমাত্র কর্ত্তা—ক্রিয়াশীল। চরকে মহর্ষি অগ্নিবেশ বলিয়াছেন,—

"রুক্ষঃ শীতোলঘুঃ সূক্ষ্মশ্চলোঽথ বিশদঃ খরঃ।"

চলত্ব বায়ুর ক্রিয়াশীলত্বের পরিচায়ক। ইহার সক্রিয়ত্বের খ্যাপন করিতে

পিত্তং পঙ্গুঃ কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবো মল-ধাতবঃ।
বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র বর্ষন্তি মেঘবৎ॥

পিত্ত ও কফ জড়ধর্ম্মা; কেবল বায়ুই শরীরের মধ্যে ক্রিয়াশীল। এই বায়ুবাহিনী নাড়ী হইতেছে, স্নায়ু;—স্নায়বো বন্ধনানি স্যুঃ। স্নায়ু সকল শরীরের বন্ধনী। এই বন্ধনের বিষয়ীভূত হইতেছে, রসরক্তাদি ধাতু ও অস্থি। আর যে স্নায়ু স্নায়ু-মূল হইতে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, তাহা যে অস্থিযোগে সঞ্চালিত, তাহা প্রকৃত তত্ত্বদর্শীদিগের অবশ্যস্বীকার্য্য। তাই বায়ুর সগুণ স্থূলধাতু হইতেছে, অস্থি। আর তজ্জন্যই অস্থিভঙ্গাদি-রোগে বাতবিকার পরিলক্ষিত হয়। অস্থিসংক্রান্ত ব্যাধিতে বাত প্রকোপ লক্ষণ সম্পূর্ণ বর্ত্তমান থাকে।

এইরূপ স্থূলধাতুর সহিত সূক্ষ্মধাতুর সম্বন্ধ অব্যাহতভাবে সুরক্ষিত। আয়ুর্ব্বেদে যে দোষত্রয়ের বিচার লইয়া সকল রোগের নির্ণয়াদির ব্যবস্থা আছে, প্রাচীন ঋষিগণ যে দোষত্রয়ের স্বরূপখ্যাপন করিতে গিয়া, ত্রিশক্তি ত্রিগুণাদির উল্লেখ করিয়াছেন,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বলিয়া বাত্যাদি ধাতুর আখ্যান্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ অধিগমন করিতে গেলে, স্থূল জগতের সহিত সূক্ষ্ম জগতের সম্বন্ধবিচারের শক্তি অর্জ্জন করা আবশ্যক; কিন্তু তাহা লেখনীদ্বারা ব্যক্ত হওয়া অসম্ভব। আমাদিগের কোন আর্য্য গ্রন্থই গুরুমুখ ব্যতীত অববোধের যোগ্য বা স্ববোধের আয়ত্ত বিষয় নহে;—শাস্ত্রের আভাস গুরুবক্ত্রনিঃসৃত উপদেশে বিকাশ পাইয়া থাকে; আর সেইরূপ বিকাশই ঋষিগণের অভিপ্রেত ও তাঁহাদিগের বিচারনীতিসঙ্গত। আর তাই ঋষিবাক্যে প্রকাশ,—যিনি এই দোষত্রয়ের বিচার করিয়া, গুরুর নিকট হইতে দৃষ্টকর্ম্মা হইয়া ক্রিয়ার (চিকিৎসার) অভ্যাস করিয়াছেন, তিনিই একজন অভিজ্ঞ ভিষক্‌শব্দবাচ্য। শাস্ত্রে আছে,—

"শ্রুতে পর্য্যবেদাতৃত্বং বহুশো দৃষ্টকর্ম্মতা।
দাক্ষ্যং শৌচমিতি জ্ঞেয়ং বৈদ্যে গুণচতুষ্টয়ম্॥"

শ্রুতে—বেদোক্ত বিধানে নির্ম্মলজ্ঞান—বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি, গুরুর নিকট বহুব্যাপারে কর্ম্মদর্শন, দক্ষতা ও শুচিতা বৈদ্যের আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যাপার দোষত্রয় লইয়াই বর্ণিত। দোষত্রয়ের অববোধ ব্যতীত চিকিৎসায় প্রবেশলাভের উপায়ান্তর নাই। এতৎসম্বন্ধে চরকের সূত্রস্থানে

"যথা শকুনিঃ সর্ব্বাং দিশমপি পরিপতন্ স্বাং ছায়াং নাভিবর্ত্ততে, তথা স্বধাতুবৈষম্যনিমিত্তজাঃ সর্ব্ববিকারাঃ বাতপিত্তকফান্নাতিবর্ত্তন্তে।"

শকুনি যেমন সকল দিক্ পরিভ্রমণ করিয়াও, নিজের ছায়ার অতিক্রম করিতে পারে না, তেমনই সকল ব্যাধি,—দোষকৃত প্রাকৃতিক ব্যাধি বা আগুন্তুজ ব্যাধি,—বাত পিত্ত কফ—এই দোষত্রয়ের অতিক্রম করিতে পারে না। সুতরাং দোষত্রয়ের স্বরূপোপলব্ধি করিয়া, তাহার অংশাংশের বিচার-পূর্ব্বক যথাবিধি ঔষধাদির ব্যবস্থাপন করিতে পারিলে, সদ্‌গুরুর উপদেশে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া যথাশাস্ত্র ভেষজ প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইলে, রোগ-নিরাকরণ ও আরোগ্যবিধান হওয়া সম্ভবপর। অদ্য আমরা দোষত্রয়ের সহিত স্থূলধাতুর সম্বন্ধগত কথঞ্চিৎ আভাসমাত্র প্রদান করিলাম; উপসংহারে আমরা ইহার পোষক একটী সুশ্রুত বচনের উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি,—

নর্ত্তে দেহঃ কফাদস্তি ন পিত্তান্ন চ মারুতাৎ।
শোণিতাদপি বা নিত্যং দেহ এতৈস্তু ধার্য্যতে॥

বাত পিত্ত কফ ব্যতীত দেহের অস্তিত্ব নাই। তবে স্থূলধাতু মধ্যে শোণিতেরও অতি খ্যাতিমাত্র বর্ণিত থাকিলেও, পূর্ব্বোক্ত ধাতুই দেহের একমাত্র ধারক। তবে শোণিতও আমাদিগের স্বাস্থ্যাদির অনুকূল বলবর্ণ বিধায়ক। চরকে কথিত আছে;—

তদ্বিশুদ্ধং হি রুধিরং বলবর্ণসুখায়ুষা।
যুনক্তি প্রাণিনাং প্রাণঃ শোণিতং হ্যনুবর্ত্ততে॥

বিশুদ্ধ রক্ত প্রাণীদিগের বল, বর্ণ, সুখ ও আয়ুর সংযোগ বিধান করে। প্রাণ রক্তের অনুগামী। প্রাণ-ধারণ-সম্বন্ধে রক্তের আবশ্যকতা থাকিলেও, বাত পিত্ত কফ—প্রধানতঃ দেহের যে ধারক, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং দোষত্রয়ের প্রকোপ প্রচয়াদি ভাব বা সাম্য-রূপ জানা চিকিৎসকমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজন। এই ধাতুত্রয়ের সহিত তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃষ্ট সম্বন্ধ থাকায়, ইহার অববোধজন্য বিমল তত্ত্বজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন। ঋষিগণের সকল উপদেশই যে তত্ত্বময়। অদ্য আমরা ধাতুত্রয়ের সহিত দেহের সম্বন্ধ বিচার, বায়ুর নেতৃত্ব ও বাতপিত্তের নীতত্ব—এই তিনের যোগে অবস্থার নিরন্তর বিপরিণাম প্রভৃতির অধিগমন করিতে নেতার প্রতি স্বাধিকার প্রসার বা প্রাণায়ামাদির সাধন আবশ্যক। আর

গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(ছাইখেগো ক্রোরীয়ান।)

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

তত্ত্বের রহস্য উদ্ভেদ করা সহজ ব্যাপার নহে। পুরাণে কথিত আছে, লঙ্কেশ্বর রাবণ আপন ছিন্ন মস্তক দ্বারা ইষ্টদেবের প্রীতিসাধন করিয়াছিলেন। গোবিন্দের ইষ্টদেব-পূজাও, সেইরূপ কি না, বলা যায় না। এরূপ মৃত্যুর বহুবিধ হেতুকল্পনা করা যাইতে পারে। কোন কারণবশতঃ একজন মুসলমান নবাবের সহিত তাঁহার বিবাদ হইয়াছিল, এরূপ জন-শ্রুতি আছে। সেই নিষ্ঠুর নবাবের ষড়যন্ত্রে গোবিন্দের তাদৃশ মৃত্যু ঘটিতে পারে। অথবা তাঁহাকে যে কার্য্য করিতে হইত, তাহাতে এতদ্দেশীয় তৎকালীন রাজগণের সহিত মনোবাদ হইবার সম্ভাবনা ছিল। কথিত আছে, অধীন রাজগণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবাবগণ, রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে গোলযোগ করিলে, সেই রাজগণকে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবাবগণকে ধরিয়া আনিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বৃক্ষে টাঙ্গাইয়া প্রহার করিতেন। বোধ হয়, অধীন রাজগণ এইরূপে অপমানিত হইয়া ইহার প্রতিশোধ লইবার মানসে বিষম ষড়যন্ত্র করিয়া গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর তাদৃশ মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন। কিম্বা যে গুরুর প্রসাদে তাঁহার তাদৃশী উন্নতি হইয়াছিল, সেই গুরুর বাক্য সার্থক করিবার জন্য আত্মঘাতের প্রবৃত্তি হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব নহে। সুজা উদ্দিনের রাজ্যারম্ভের কিছু পূর্ব্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী বঙ্গদেশে "মুকুটরায়" বলিয়া খ্যাত; নিম্নে তাঁহার এইরূপ খ্যাতির কারণ প্রকাশ করা যাইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—তাঁহার দুইটীমাত্র পুত্র—জ্যেষ্ঠ রূপরাম রায় ও কনিষ্ঠ মুকুটরাম রায়। কনিষ্ঠ মুকুটরাম রায় অধিকতর বিদ্বান্, সদ্‌গুণশালী ও কার্য্যক্ষম হইয়াছিলেন। পিতাও তাঁহাকে সম্যক্ উপযুক্ত দেখিয়া, সকল কার্য্য তাঁহার নামে চালাইতেন। গোবিন্দের অপেক্ষা মুকুটরাম অধিককাল ঐ কার্য্য-সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বোধ হয়, রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে মুকুট, রাজগণের সহিত অধিক রূক্ষ ব্যবহার করিতেন। কারণ, খাজনা আদায় সম্বন্ধে নানাপ্রকার পীড়াপীড়ির ঘটনা, পূর্ব্বস্থলীতেই ঘটিয়াছিল, এইরূপ শোনা

সময়েই নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা যে, কতদূর সত্য, তাহা জানা যায় না। কিন্তু গোবিন্দের পূর্ব্বনিবাসের ও কামরকুলিতে "বারভূমের" কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাই আমরা বলিতেছি যে, তিনি পূর্ব্বস্থলীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মুকুট রায়ের কর্ত্তৃত্বে এবং তাঁহার অভিপ্রায়-মতেই পূর্ব্বস্থলীর বসতি-বাটী, দেবায়তন, কাছারী বাড়ী, নহবৎ-খানা, হাওয়াখানা ইত্যাদি "আমিরী" ধরণের বাড়ীঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই আমিরী ধরণের যাবতীয় অট্টালিকা ও গৃহাদি, এক অত্যুচ্চ দুরারোহ প্রাকারে বেষ্টিত ছিল। ইহাকে "চৌদালী" কহিত। দক্ষিণে পাঠানেরা, তোরণ রক্ষা করিত এবং উত্তরে বাগ্‌দী-জাতীয় তীরন্দাজ ও তলোয়ার রাজচোয়াড়েরা, খিড়কী-দ্বার রক্ষা করিত। বাটীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে কর্ম্মকার, কায়স্থাদি অন্যান্য জাতির আবাস ছিল। কালক্রমে তাহারাও তত্তৎস্থানের অধিবাসী হইয়াছে। অদ্যাপি পূর্ব্বস্থলীতে ঐ সকল অধিবাসীর অবশেষ বর্ত্তমান আছে। মুকুট রায়ের সময় ক্রিয়াকাণ্ডের কিছু বাহুল্য হইয়াছিল। তিনি অতি সমারোহের সহিত খিড়কীর পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ কার্য্যে মিথিলার অধ্যাপকগণও আগমন করেন। উক্ত খিড়কীর পুকুর, ভাগীরথীর পবিত্র সলিল-গর্ভে নিমজ্জিত রহিয়াছে। পূর্ব্বস্থলীর বর্ত্তমান প্রাচীন ও প্রৌঢ়েরা, ঐ পুকুর দেখিয়াছেন। তাঁহারা উক্ত খিড়কীর পুষ্করিণীকে "পানা-পুকুর" বলিয়া থাকেন। বোধ হয়, উক্ত পুষ্করিণী, বহুদিনের সংস্কারাভাবে তাহাতে পানা ও শৈবালাদি জন্মিয়াছিল। তাই তাঁহারা উহাকে পানা পুকুর বলেন। * ঐ সময়ে অন্য রূপেও অনেক সদ্ব্যয় হইয়াছিল। বাবুগিরি করা, সদ্ব্যয়াদি দ্বারা দেশাবচ্ছিন্ন সুখ্যাতি লাভ করা, বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শন দ্বারা ছোট বড় সকলের কাছে সম্ভ্রম বৃদ্ধি করা—এ গুলি কর্ত্তার ভাগ্যে প্রায় ঘটে না—পৃথিবীতে ইহার ভূরি উদাহরণ বিদ্যমান। কর্ত্তার ভাগ্যে ঘটে না, তাহার বিশেষ কারণ আছে। অর্থোপার্জ্জনের পথ

---

* পূর্ব্বস্থলী হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে "একডালা" নামক গ্রামে "যমনা" নামক প্রস্তর দ্বারা ঘাট বাঁধান পুষ্করিণী ও এই পুষ্করিণীর নিকটে চারিটী দেবমন্দির, এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। গত ১২৯৮ সালের আশ্বিন মাসে গঙ্গার সহ্য না হওয়ায় তাহার পূর্ব্বচিহ্ন ভাঙ্গিয়া লইতেছিলেন। সমুদায় ভাঙ্গিয়া

আবিষ্কৃত করিতে ও অর্থোপর্জ্জন করিতেই, তাঁহার জীবনের অধিকাংশ ও উৎকৃষ্টাংশ, অতিবাহিত হইয়া যায়; পর-বংশীয়েরাই, ধনভোগের অধিকারী। মুকুটরাম রায় বড়লোকের সন্তান হইয়াই উচ্চ পদে আসীন হইয়াছিলেন। তাঁহাকে গোবিন্দের ন্যায় মেছুনীর গালী খাইয়া, পিতামাতা কর্ত্তৃক ছাই খাইতে দেওয়া ইত্যাদি নানা প্রকারে তিরস্কৃত হইয়া "টাকা রোজগার" করিবার জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয় নাই। তাঁহাকে অযত্ন-রক্ষিত নিরভিভাবক বালকের ন্যায় তালগাছে উঠিয়া বিপদে পড়িতে হয় নাই; তাঁহাকে সন্ন্যাসীর শিষ্য হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হয় নাই; তাঁহাকে পরান্নভোজী হইয়া স্বজনশূন্য দূরদেশে থাকিয়া লেখা পড়া শিখিতে হয় নাই। তাঁহাকে হঠাৎ উচ্চ পদলাভের বিষম-সঙ্কট সকল অতিক্রম করিতে হয় নাই। তিনি একবারেই নির্ব্বিঘ্নে বড়লোক হইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহার অধিকতর যশঃ, সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছিল। এই জন্যই তাঁহার আড়ম্বরানুগামিনী খ্যাতিতে পিতৃ-কৃত কার্য্য, বিলীন হইয়াছিল। এই জন্যই, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, দেশে মুকুটরাম রায় বলিয়াই খ্যাত হইয়াছিলেন।

"নবদ্বীপ অঞ্চলের কে একজন, প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিদেশে গিয়া বড় লোক হইয়া আসিয়াছে" ইত্যাদি সংবাদ, গোবিন্দের বাল্য-বিবরণের সহিত প্রথমে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। তাঁহার অধ্যবসায়, আত্মাবলম্বন, সদাশয়তা প্রভৃতি ক্রমে প্রচারিত হওয়ায় "লোকটি কে?" জানিবার জন্য সকলেরই ইচ্ছা হইতে পারে; কিন্তু তৎকালে এ দেশে মহান্ লোকে জীবন-বৃত্তান্ত অনুসন্ধানের প্রকৃত রীতি, প্রচলিত না থাকায়, মুকুটরাম রায়ই, অনুসন্ধিৎসুগণের নেত্রে পতিত হইলেন। যেহেতু, গোবিন্দ, তাঁহার অনেক পূর্ব্বে অনধিক ৪।৫ (চারি পাঁচ) বৎসর মাত্র রাজকার্য্য করিয়া পরলোকগত হইয়াছিলেন। লোকের অনুসন্ধান-কালে মুকুটরাম রায়ই, অধিকতর সমৃদ্ধির সহিত পিতৃপদে অভিষিক্ত ছিলেন। যখন লেখা পড়ায় সাধারণের চর্চ্চা অধিক ছিল না, কোন বিষয়ের স্বরূপ-নির্ণয়ে লোকের তত ইচ্ছা ছিল না, বঙ্গদেশের তাদৃশী অবস্থায়, একজন, আর একজন বলিয়া খ্যাত হওয়া, বড় অসম্ভব নহে।

যে সকল গুণ-প্রভাবে মনুষ্য, উন্নতি-সোপানে আরোহণ করে, অধ্য-

গোবিন্দের জীবনে প্রথমাবধি ঐ গুণগুলি ছিল বলিয়াই, তিনি তাদৃশ উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যখন সম্পূর্ণ বালক, পাখীর ছানা পাইলে, যেখানে সেখানে যাইতে পারিতেন, তখনই তাঁহাতে ঐ সকল গুণ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। যে বয়সে অন্য বালক, স্বগ্রাম মধ্যে একাকী বেড়াইতে সাহস করে না, সন্ধ্যার পর রুদ্ধ-দ্বার গৃহমধ্যে থাকিয়াও "ভূত-প্রেতের" ভয়ে চমকিয়া উঠে, গোবিন্দ, সেই আট বৎসর বয়সে অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া গৃহত্যাগ করেন! কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কে তাঁহার সহায় হইবে, তখন এ সকলের স্থিরতা ছিল না। তিনি আপনিই, আপনার অবলম্বন হইয়া গৃহত্যাগ করেন। গৃহত্যাগ করিয়াই, তালীয় তরুশিখরে নাগপাশে বদ্ধ হইয়া অসামান্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অসীম সাহসের পরিচয় দেন। পক্ষিশাবকের প্রত্যাশায় সন্ন্যাসীর সঙ্গে যথা তথা যাইতে সম্মত হওয়ায়, এক দিকে যেমন বালকতা, অন্য দিকে তেমনই সাহসও, প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার বাল্য-জীবন পর্য্যালোচনা করিলে, কাহার না অন্তরে উৎসাহ-স্রোতঃ প্রবাহিত হয়? কাহার না দুঃখের দশায় পড়িয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য ঘর ছাড়িতে সাহস হয়? কাহারই বা পরপ্রত্যাশী হইয়া, মনুষ্য-জীবনকে কলঙ্কিত করিতে ঘৃণা হয়? কাহারই বা আলস্যবশে বিবিধ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়?

যে স্থলে পার্থক্য দ্বারা অনিষ্ট সংঘটন হয়, অথবা ইষ্টোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটে, সেই স্থলে যিনি একীকরণের চেষ্টা করেন, তিনিই মহান্। ইষ্টানিষ্টের লাঘব গৌরব অনুসারেই, মহত্ত্বের তারতম্য হইয়া থাকে। ধর্ম্ম, রাজ্য, জাতি, বর্ণ ইত্যাদির মধ্যগত বিভিন্নতাকে লক্ষ্য করিয়াই লাঘব-গৌরবের কথা উত্থাপিত হইতেছে। ধর্ম্ম, যে সংসারের একটী প্রধান বস্তু এবং উহার পার্থক্যের বিষয় অনর্থ সংঘটিত হইতেছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই জন্যই নানক, চৈতন্য, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, প্রভৃতি ধর্ম্ম সংস্কারকগণ সর্ব্ব জাতীয় লোককে এক ধর্ম্মে আহ্বান করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ন্যায় ভক্তি ও সম্মান লাভ করিতে আর কে পারিয়াছেন? এই জন্যই প্রসিয়ার রাজমন্ত্রী কাউণ্ট বিস্মার্ক, জর্ম্মনির ক্ষুদ্র রাজ্য সকলকে একীভূত করিয়া তাদৃশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। সেই প্রাধা

শ্রীক্ষেত্রে আনন্দবাজারে সকল জাতিকে একত্র একান্ন ভোজন করাইয়া এত মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছেন। এই জন্যই আমরা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীকে মহান্ ও সদাশয় বলিতে অধিকার লাভ করিয়াছি। এ স্থলে কেহ যেন এমন মনে করিবেন না যে, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী উপরি-উক্ত মহাত্মগণের সহিত সর্ব্বাংশে তুলনীয় হইলেন। কেবল কার্য্যাগত আংশিক সাদৃশ্য হেতুই এ স্থলে তাঁহার নাম গৃহীত হইল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তিনি রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিক এই তিন শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ বর্ণের একীকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার সদাশয়তা ও মাহাত্ম্যের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ। সুনীতি শিক্ষা করা এবং উৎকৃষ্ট কার্য্যের "প্রস্তাব" করা, অপেক্ষাকৃত সহজ! আমরা কেবল তাহাতেই নিপুণ। বাল্য-বিবাহ ও বহু বিবাহ রহিত করা, বিধবা বিবাহ দেওয়া, ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা করা, ইচ্ছানুরূপ ব্যবসায়ে বুদ্ধি চালনা করা ইত্যাদি বিষয়ে অনেকের দ্বৈধ নাই। অন্যকে এই সকল কার্য্যে উপদেশ দান করিবার জন্য সভা-সমিতি, সমাজ, সংবাদ-পত্র, গ্রন্থ প্রণয়নের ছড়াছড়ি করিয়া থাকেন ও করিতেছেন। কিন্তু স্বয়ং কোন বিষয়ের প্রবর্ত্তক হইতে অনেকেই সাহস হয় না। যিনি সভায় গিয়া তেজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা বাল্য-বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া আসেন, হয় তো তিনি আপনার দুই একটী বালিকা কন্যার বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছেন, কিম্বা তাহাদিগের বিবাহের সম্বন্ধ দেখিতেছেন। যিনি অপরের বিধবা ভগিনী বা কন্যার পুনরুপযমে সবিশেষ যত্নশীল, তিনি হয় তো প্রাচীনগণের প্রশংসা-প্রত্যাশায় বাড়ীর বিধবাদিগকে, একখানি পাইড়ওয়ালা কাপড় পরিতে দেখিলে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আমরা যে যে বিষয়ে দুই একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিলাম, দেশকাল-পাত্রের অবস্থানুসারে ইহার মধ্যে অনেক তর্ক চলিতে পারে। ফলতঃ, অধুনাতন ব্যক্তিগণের নৈতিক সাহসের অভাব প্রতিপন্ন করাই, আমাদের উদ্দেশ্য। বোধ হয়, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ, আমাদের উক্তবিধ চিত্ত-রোগ প্রতিকারের একটি ঔষধ হইতে পারে। তিনি স্বয়ং সাধু কার্য্যের প্রদর্শক হইয়াছিলেন। তাঁহার তিন পত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণ, জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই তাঁহার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইত। মুকুটরাম রায়ই, তাহার প্রধান প্রমাণ।

থাকিলে কি তাঁহাদের বিবাহ হইত না? অবশ্যই হইত। সেই সঙ্গে সঙ্গে এই তিন শ্রেণী মিলিত হইয়া আসিত এবং রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণ, বৈদিক শ্রেণীর সংমিশ্রণে কঠোর কন্যাপণ দায় হইতে রক্ষা পাইত।

গোবিন্দের দুই পুত্র, রূপরাম ও মুকুট রাম। রূপরামের চারি পুত্র;—গোপাল রায়, চাঁদ রায়, বেণী রায় এবং কেশব রায়। বেণীরায়ের বংশে সূর্য্যকুমার রায় নামক একটীমাত্র পুরুষ বহুদিন গোয়ারীর সদর আলা বিখ্যাত বারিষ্টারপ্রবর শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষের পিতা রামলোচন ঘোষের পেসকারি কার্য্য করিয়া বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী-পুত্রহীন হইয়া গোবিন্দের পশ্চিম-প্রদেশস্থ নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া সম্পত্তির উপস্বত্বে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া ৭।৮ বৎসর হইল, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইনিই গোবিন্দের শেষ বংশধর। কিন্তু এ কথা, বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ, পূর্ব্বস্থলীতে রায় উপাধিধারিগণের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে, গোবিন্দের বংশধর কে আছেন, তাহা জানিতে পারা যায়।

রূপরামের পুত্রেরা "বর্গীর হাঙ্গামার" সময়ে পূর্ব্বস্থলীর বাটী ত্যাগ করিয়া বাখরগঞ্জে গিয়া বাস করেন। বহুকাল পরে তাঁহার বংশীয়েরা পূর্ব্বস্থলীতে ফিরিয়া আসেন। তখন তত্রত্য গৃহাদি, জঙ্গলাকীর্ণ ও বন্যপশুর আবাস হইয়াছিল। কালক্রমে ঐ সকল অট্টালিকা, গঙ্গার উদরসাৎ হইয়াছে। সূর্য্যকুমার উহার ভগ্নাবশেষ দ্বারা গঙ্গাতীরে যে সামান্য বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন, ঐ বাটী, গঙ্গাতীরে ভাগীরথীর-স্রোতোধৌত ভগ্নাবশেষে অদ্যাপি গোবিন্দের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু সেও, যায়—আর থাকে না।

উপসংহার।—যাঁহারা সংসারে উন্নত অবস্থার অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিদ্যা, ধর্ম্ম ও স্বাবলম্বন শিক্ষা করিয়াছিলেন। পুরাবৃত্ত-পাঠে অবগত হওয়া যায়, দরিদ্রের গৃহ হইতেই অধিকাংশ মনস্বী ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই, স্বাবলম্বন-বলে সুশিক্ষা পাইয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। আত্মাবলম্বন, বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা না হইলে, উন্নতি কোথায়?

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

বসন্ত-বাহার।

কে গাও মধুর গীতি গাও আরবার।
কিবা রাগ চমৎকার
স্বরেতে সুধার ধার
ঢালে, প্রাণে বিমোহিত এ স্বরে আমার
গাও পুনঃ অই গীতি বসন্ত বাহার।

(২)

বাসনার পরিতৃপ্তি এ স্বরে আমার
এ রাগ কোথায় ছিল
ধরাতলে কে আনিল
হেন মধুমাখা সুর সৃষ্টি বল কার ?
অনুপম সুধাসার বসন্ত বাহার।

(৩)

জানি বটে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী
দীপকে আগুণ জ্বলে
মেঘেতে ভাসায় জলে
ভৈরবের হুহুঙ্কারে কম্পিত মেদিনী
আতঙ্কে শঙ্কিত জীব তরাসে পরাণী।

(৪)

মালবের মধুরতা মানবের নয়
সারঙ্গে কুরঙ্গ আনে
কামনা জাগায় প্রাণে
হিন্দোলে দোলায় হিয়া বিষম সংশয়
সংগঠিত চিত্তে বল কোথা সুখোদয়।

(৫)

ললিতের কোমলতা কেবল কথায়
ললিতে লালিত্য কোথা
জাগায় প্রাণের ব্যথা
বিভাষে দুঃখের ভাষ আনিয়ে দেখায়

(৬)

পুরবি উদাস ভাব এনে দেয় মনে
ধন জন সুত জায়া
কিছু নয় শুধু ছায়া
"দিবা অবসান হোলো" বলে ঘনে ঘনে
এ রাগে বিরাগ বাড়ে সংসার-বন্ধনে ।

(৭)

বেহাগে বিষম জ্বালা বিরহ বেদন
প্রতি পলে অশ্রু ধার
"শিথিল কবরী ভার"
অবশ অঙ্গেতে হয় যামিনী যাপন
কেবল সুধায় "সুখে আছত এখন" ।

(৮)

সিন্ধু সত্য সুধাসিন্ধু মানি বটে তায়
কিন্তু বড় অভিমান
সঙ্গী প্রায় [illegible]
কভু সে গম্ভীর ভাব প্রাণে নাহি চায়
বাগেশ্রীর সিংহনাদে আতঙ্ক বাড়ায় ।

(৯)

ভালবাসে রামকেলি কেলিমত্ত জনে
সাহারার মরুপ্রায়
ধুধু শুধু সাহানায়
যুবক যুবতী জাগে ছায়ানট স্বনে
সোহিনী মোহিনী শুধু কামীগণ মনে ।

(১০)

শুনি বটে কত মুখে টৌরীর বাখান
যে পঞ্চম পিক স্বরে
অমিয় বর্ষণ করে
সে পঞ্চম টৌরী হতে হয় তিরোধান

(১১)

পিলুর শকতি কোথা অতি ক্ষুদ্র প্রাণ
বারোয়া সহায় করে
সজনীর কলেবরে
যতনে রতন এনে সজ্জা সমাধান
নেপথ্যকারিণী পিলু কোথা তার মান।

(১২)

সুরটে ভীরুতা অতি ভরসা মল্লার
বিরহে আপনা হারা
কেঁদে কেঁদে হয় সারা
"বাঁচি যদি দেখা হবে" বলে বার বার
পরজে গরজ বড় স্বার্থের আধার।

(১৩)

ঝিঝিট খাম্বাজে দেখি কেবল ঝঙ্কার
শূন্য গর্ভ অতিশয়
কেবল ঝঙ্কারময়
শূন্যপাত্র চিরদিন শব্দমাত্র সার
ইমন্ বাণীর প্রিয় কি কাজ আমার।

(১৪)

পুরবীর সহোদর ভঁয়রো যোগিয়া
সন্ন্যাসী বন্দির মুখে
থাকে দোঁহে মহাসুখে
পুলকিত নহে তাহে সংসারীর হিয়া
কালাংড়ার সদা বাস লম্পটে চাহিয়া।

(১৫)

সুতান মুলতান বটে "সাধন সমরে"
হৃদিপদ্মে কুণ্ডলিনী
সে তানে প্রবুদ্ধা তিনি
"রসিক" ডাকিত ভয় পাইয়ে অন্তরে

(১৬)

"সে নামে শিহরে প্রাণ" ভৈরবীর তানে
আলেয়া আলেয়া প্রায়
ধাঁধায় ফেলিয়া যায়
হা শিবানী ব'লে শিব কাঁদেন শ্মশানে
কানেড়া-নিপুণা শুধু প্রিয়ার আহ্বানে।

(১৭)

জয়ন্তী সুরূপা বটে মধুর ভাষিণী
"শ্যামবিলাসিনী" তরে
কেবল ভাবিয়া মরে
"কা হেতু কা হেতু" মুখে দিবস যামিনী
পাঠায় কাননে একা ফুলের কামিনী।

(১৮)

ভাবিলে "দেশের" কথা বহে নীরধার
দেশেতে সম্বন্ধহীন
প্রবাসীর চিরদিন;
সে "দেশ" তুষিবে বল শক্তি কিবা তার
"কাফিতে" বাড়ায় মাত্র চিত্তের বিকার।

(১৯)

মালকোষ মল্লপ্রিয় সমর সজ্জায়
তুরী ভেরী শঙ্খনাদে;
মালকোষ সিংহনাদে
বীরের শিরায় রক্ত আনিয়ে জোয়ার
চৌতালে হাসির চলে ধনীর সভায়।

(২০)

বাহারে বাহার বটে একা কিন্তু নয়
কখন শরজ পাশে
কভু বা বাগেশ্রী বাসে
আড়ানা মোহিনী সনে গোপনে প্রণয়

(২১)

ভাই বলি গাও গীতি বসন্ত বাহার
পৃথিবীর কোমলতা
স্বরগের পবিত্রতা
নন্দনের পারিজাত সৌরভ সম্ভার
একাধারে বিরাজিত তুলনা কি তার।

(২২)

কেন প্রাণ ভালবাসে বসন্ত বাহার
[redacted]
পুরায় প্রাণের আশা
খুলে দেয় অনুপম সুখের ভাণ্ডার
আনন্দ লহরী তুলে হৃদয় মাঝার।

(২৩)

বসন্ত বাহারে প্রাণ সুধায় মগন,
শীতের তুহিন বাত,
বরষার ধারাপাত,
মনে নাহি পড়ে ঘোর শারদ গর্জ্জন,
সুখের বসন্ত মনে জাগে অনুক্ষণ।

(২৪)

বসন্ত বাহারে সদা উল্লাস অন্তর,
মনে পড়ে কত কথা,
"ললিত লবঙ্গলতা,"
মনে পড়ে বৃন্দাবনে নিকুঞ্জ বাসর,
মনে পড়ে রাধাসনে শ্যাম নটবর।

(২৫)

মনে পড়ে সুখস্পর্শ মলয় পবন,
কদম্বের তরু-মূল,
যমুনার কুল কুল,
মনে পড়ে কোকিলের ললিত কুজন,
মনে পড়ে ফোটা ফুলে অলি বিহরণ।

(২৬)

মনে পড়ে পূর্ণিমার পূর্ণ শশধর,
চকোর চকোরী মেলি,
চাঁদপাশে করে কেলি,
মনে পড়ে কুমুদির সহাস অধর,
জোছনায় ঢল ঢল ফুল্ল কলেবর।

(২৭)

মনে পড়ে বসন্তের বাসর বিলাস,
কুসুমে সজ্জিত কেশ,
কুসুমে রচিত বেশ,
শয়নের চারিভিতে কুসুমের রাশ,
মনে পড়ে সে অধরে কুসুম সুহাস।

(২৮)

মনে পড়ে প্রিয়াসনে কুসুম শয়নে,
কত কথা আলাপন,
সারা নিশি জাগরণ,
মনে পড়ে বিহরণ প্রভাত পবনে,
মনে পড়ে কথা বলা নয়নে নয়নে।

(২৯)

মনে পড়ে কত দিন বকুলের তলে,
যতনে বকুল-মালা,
গাঁথিয়ে সাঁজের বেলা,
পরায়ে দিয়েছি এনে প্রেয়সির গলে,
নীরবে রয়েছি চেয়ে এ সংসার ভুলে।

(৩০)

মনে পড়ে প্রেয়সির সুষুপ্ত আনন,
অলক শোভিত তায়,
ভ্রমরের পাঁতিপ্রায়
নিদ্রাবশে অধরের ঈষৎ কম্পন

(৩১)

মনে পড়ে প্রিয়ার সে বনদেবী বেশ
লুণ্ঠিত কুন্তল ভার
ফুল ফুল অলঙ্কার
সুনীল নলিন নেত্রে সোহাগ আবেশ
সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টিত কিবা দিব্য পরিবেশ।

(৩২)

তাই ভালবাসে প্রাণ বসন্ত-বাহার
বসন্তের ভালবাসা
পূরায় প্রাণের আশা
খুলে দেয় অনুপম সুখের ভাণ্ডার
আনন্দ লহরী তুলে হৃদয় মাঝার।

(৩৩)

তাই বলি কে গাহিছ গাও আরবার
কিবা রাগ চমৎকার
স্বরেতে সুধার ধার
ঢালে, প্রাণ বিমোহিত এ স্বরে আমার
গাও পুনঃ অই গীতি বসন্ত-বাহার।

(৩৪)

গাও পাখী ভালবাসি সুস্বর তোমার
বিনয়ে তোমারে বলি
অন্য স্বর যাও ভুলি
প্রাণ খুলে গাও পাখী বসন্ত-বাহার
প্রাণ মন বিমোহিত হউক আমার।

(৩৫)

গাওরে কোকিল তুমি বসন্ত বাহার
বসন্তের পাখী তুমি
বসন্তের অনুগামী
অন্য স্বরে প্রয়োজন কি আছে তোমার

(৩৬)

কল্লোলিনী কলরবে সাগর মাঝার
যাইছ সুতান তুলি
এ সুতান যাও ভুলি
বীচি রবে গাও তুমি বসন্ত বাহার
রাখ নদি সোহাগিনী মিনতি আমার।

(৩৭)

পল্লবিত তরু-মাঝে মধুর স্বননে
বসন্ত বাহার তান
তোল হে জগৎ প্রাণ
সে স্বরে ফুটিবে ফুল শুষ্ক উপবনে
শোন বন্ধু রাখ কথা নিবেদি চরণে।

(৩৮)

গাও সব গ্রহগণ মিলি একতানে
বসন্ত বাহার গান
তুলাও মানব-প্রাণ
ত্রিদিববাসীরে তোষ সে সুধা প্রদানে
তুষিবে ত্রিদিববাসী সে অমিয় পানে।

(৩৯)

গাও বীণা গাও তুমি বসন্ত বাহার
গাও তুমি সপ্তস্বরা
তব কণ্ঠে মধুভরা
শুনিবে ঝঙ্কার তব হৃদয়-মাঝার
চিরদিন বিরজিবে বসন্ত আমার।

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়।

দোপাটী।

(১)

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

তৃপ্তি হয় না! এ তো আর নূতন কথা নয়! শ্যাম-সুন্দরের রূপই দেখ—আর মুকুর-প্রতিফলিত নিজের রূপের বিকাশই দেখ';—দেখার মত দেখিতে হইলে, দেখার সাধ কখনই মিটে না।

সাধ মিটে না বলিয়াই তো যত সর্ব্বনাশ হয়! সাধ মিটে না বলিয়াই তো যত সুখের সঞ্চার হয়! সাধ মিটিলেই তো সব শেষ হইল!—সুখেরও শেষ, দুঃখেরও শেষ। কিন্তু সুখ-দুঃখ লইয়া সংসার; সুখ-দুঃখের শেষ হইলে, সংসারেরও শেষ হয়। তাই কভু—

"নয়ন না তিরপিত ভেল।"

(২)

সুরূপা সুন্দরী। নামেও সুরূপা, গুণেও সুরূপা, দেহেও সুরূপা। বাহিরের অন্য দশজনের দৃষ্টিতে সে সুরূপা বলিয়া পরিগণিত হইত কি না, তাহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। তবে স্বামী কান্তিচন্দ্র, সত্য সত্যই সুরূপাকে সুরূপা দেখিতেন, তাহা নহে; তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে অতি সুন্দর দেখিতেন।

কান্তিচন্দ্র মালদহে চাকরি করিতেন। সেকালে, কালেক্টারীর সেরেস্তাদারকে কালেক্টারীর দাওয়ান বলিত। কান্তিচন্দ্র, সেই দাওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অল্পবয়সেই উচ্চপদ পাইয়া, কান্তিচন্দ্রের মাথা খারাপ হয় নাই; তবে কান্তিচন্দ্র অবস্থার-অতীত দাতা ছিলেন। নিজের বাসা-বাটিতে প্রত্যহ দুই বেলা ৫০।৬০ জন লোকের আহারের যোগাড় হইত। কান্তিচন্দ্র যাহা রোজগার করিতেন, তাহাই ব্যয় করিতেন। সঞ্চয় করিবার তাঁহার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। কারণ, তিনি অপুত্রক। বৃদ্ধ পিতা-মাতা, বহুকাল পূর্ব্বেই স্বর্গ-গমন করিয়াছেন। কান্তিচন্দ্রের সংসারে আপনার বলিবার আর কেহ নাই। আছেন, কেবল এক বৃদ্ধা মাতৃষসা; তিনিই কান্তিচন্দ্রের সংসারের গৃহিণী।

এই সংসারে, কান্তিচন্দ্রের আর একজন আত্মীয় ছিলেন। তিনি মালদহ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার প্রসিদ্ধ র‍্যাভেন্‌সা সাহেব। কোমলে ও কঠোরে এমন সংযোগ, মধুরে-রৌদ্রের এমন সম্মিলন, আর কোনও 'সিভিলিয়ানে' দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা কিছু ছিল, তাহা র‍্যাভেন্‌সা সাহেবেরই ছিল। তাঁহার প্রভাবে, গৌড়ের গহন বনের বেদিয়া-সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণ, সংযত ও শান্ত হইয়া ছিল। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া, এই সকল দুর্দ্ধর্ষ বর্ব্বর, স্বেচ্ছায় ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। এই র‍্যাভেন্‌সা সাহেব, কান্তিচন্দ্রকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার ভালবাসার গুণেই, কান্তিচন্দ্র মালদহ-জেলার দাওয়ান।

(৩)

মাঘী পূর্ণিমা,—পুণ্যাহ। হিন্দুমাত্রেই গঙ্গাস্নান করিবার জন্য উদ্যোগী। পশ্চিমে বাতাস ফুর্‌ফুর্‌ করিয়া একটু বহিতেছে। বাতাসের উপর শীত ;—ছোট ছেলেটির মত ঘোড়-সওয়ার হইয়া, সূর্য্য-রশ্মির প্রখরতাকে নষ্ট করিতেছে ; আর দরিদ্রের ছিন্নকন্থা উল্টাইয়া ফেলিয়া, শীর্ণ ও শুষ্কদেহে যেন সূচীবিদ্ধ করিতেছে। দরিদ্র, শীতের জ্বালায় অস্থির হইয়া কাঁপিতেছে ; আর ধনী নানা বস্ত্রাবৃত হইয়া, শীত-প্রফুল্লিত রাগরক্তিম মুখে, যেন দরিদ্রের এই কম্পনকে বিদ্রূপ করিতেছে।

কারাগোলালার মেলা। এইখানে কুশী নদী, গঙ্গায় আসিয়া নিজ অঙ্গ মিলাইয়াছেন। বৎসরে বৎসরে মাঘী পূর্ণিমার দিন এই সঙ্গম স্থলে মহা মেলা হয়। মালদহ, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, রাজমহল প্রভৃতি নানা জেলার, নানা স্থানের লোক এই দিনে আসিয়া, এইখানে গঙ্গাস্নান করিয়া কৃতার্থ হন।

সুরূপা, স্বামিসহ গঙ্গাস্নানে আসিয়াছেন। দাওয়ানজীর এক তাঁবু পড়িয়াছে। তাঁবু সঙ্গমের মুখে চরভূমির উপর স্থাপিত। তাঁবু মধ্যে বৃদ্ধা মাসী, একখানি 'গড়া-কাপড় পরিয়া, শীতে কাঁপিতেছেন ;—আর দণ্ডে দণ্ডে গিয়া গঙ্গায় ডুব দিয়া আসিতেছেন। কান্তিচন্দ্র, মাসী-মাকে বারে বারে হাত ধরিয়া গঙ্গায় লইয়া যাইতেছেন ; আর তাঁহার স্নানান্তে আবার তাঁহাকে তাঁবুতে আনিয়া বসাইতেছেন।

সুরূপার বয়স আঠার বৎসর। ব্রাহ্মণের কন্যা, সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া ; আবার দাওয়ানজীর পত্নী। সুরূপার অবরোধে থাকিবারই কথা। কিন্তু আজ পুণ্যদিন ; স্থান—পবিত্র তীর্থক্ষেত্র ; কাজেই সুরূপার অন্য আর তেমন

অবরোধ নাই। তিনি একটি দাসী সঙ্গে করিয়া স্বেচ্ছায় গঙ্গাস্নান করিতেছেন, এবং আর্দ্রবস্ত্রে থাকিয়াই অন্নদান অর্থদান করিতেছেন।

(৪)

দাওয়ানজীর তাঁবুর সম্মুখে বড় ভিড়। দীন-দুঃখী কাঙ্গালীর ভারি ভিড় লাগিয়াছে। হঠাৎ ভিড় ঠেলিয়া, একটী বালিকা আসিয়া কান্তিচন্দ্রের হাত ধরিল। বালিকার পরিধানে কিছুই নাই বলিলেও চলে। একটুক্‌রা ছেঁড়া কম্বল, কষ্টে কোমরে জড়াইয়া লজ্জা-নিবারণ করিয়াছে। বালিকার বয়স ষোল বৎসর। বালিকা, কান্তিচন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিল,—"বাবুজী, বড় শীত, বড় ক্ষুধা; আমায় কিছু দাও।"

"তুমি কি নেবে? চা'ল, ডা'ল, কাপড় সবই আছে; তোমার যা ইচ্ছে, তাই নেও।"—উদাসভাবে বালিকার প্রতি তাকাইয়া, কান্তিচন্দ্র এই কয়টি কথা বলিলেন।

"চা'ল-ডা'ল নিয়ে কি কর্‌বো? কাপড় চোপড় নিয়ে কি কর্‌বো? আমায় ভাত রেঁদে দেবে কে? কাপড় পর্‌লেই ওরা যে আমার কাপড় কেড়ে নেবে!"

"তুমি কে? তোমার সঙ্গে আর কেউ নেই? তোমার বাপ-মা নেই? তুমি যদি ভাত খেতে চাও, তবে ঐ তাঁবুতে গিয়ে ব'সো"—একটু যেন সাগ্রহে এই কয়টি কথা বলিয়া, কান্তিচন্দ্র বালিকাকে তাঁবু দেখাইয়া দিলেন। একটি দাসী বালিকার হাত ধরিয়া তাঁবুতে লইয়া গেল।

সুরূপা, বালিকাকে পাইয়াই তাহাকে একখানি বস্ত্র পরিতে দিলেন। বালিকা, কাপড় হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুরূপা তাহা দেখিয়া বলিলেন,—"লজ্জা কি? কাপড় পর।"

"আমি যে কাপড় পরিতে জানি না। আমি কখনও কাপড় পরি নাই।"

সুরূপা।—তবে তুমি কাপড় চাহিতেছিলে কেন?

বালিকা।—যাদের কাছে আমি থাকি, তাদের জন্যই আমি কাপড় ভিক্ষা ক'রে নিয়ে যাই। এই শীতে আমায় একখানা ছেঁড়া কাপড় দিয়েছিল; সেখানও আজ কেড়ে নিয়েছে। আমি সে কাপড়খানি গায়ে দিতাম। আজ এই মেলায় নতুন কাপড় ভিক্ষে করে নিয়ে গেলে, তবে সেই কাপড়খানি পাবো।

সুরূপা।—তোমার তারা কোথায়?

বালিকা।—এই ভিড়ে তাদের হারিয়েছি। তারা আমায় খুঁজে নেবে।

সুরূপা।—তারা তোমার কে? তোমার বাপ-মা নেই?

বালিকা।—তারা বেদে; ভিক্ষা ক'রে, মেয়ে-ছেলের হাত দেখে ঔষুধ-পত্র দেয়, আর গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। আমার ক্ষিদে পেয়েছে, আমায় কিছু খেতে দাও; আর এই কাপড়খানি পরিয়ে দাও।

সুরূপা, সরলা বালিকার কথা শুনিয়া, মুখ ঘুরাইয়া চক্ষের জল মুছিলেন। তাঁবুতে গরম জল ছিল; সেই গরম জলে বালিকার দেহ সুন্দররূপে মার্জ্জিত করিয়া, দিব্য একখানি চুন্নরী কাপড় তাহাকে পরাইয়া দিলেন। বালিকা কাপড় পরিয়া তাঁবুর এক কোণে বসিয়া রুটি খাইতে লাগিল। আর সুরূপা একদৃষ্টে সেই বালিকাকে দেখিতে লাগিলেন।

বালিকা অপূর্ব্ব-সুন্দরী। মাথায় জটাভার আছে বটে; ফণি-বিনিন্দিত কুঞ্চিত কেশরাশি নাই; কিন্তু জটাভারেই গ্রীবার ও মস্তকের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। রং মাজা, শ্যামবর্ণ। কার্ত্তিকের গঙ্গার জলের ন্যায় দেহের আভা। গঠন অতি সুন্দর; ঠিক যেন পাথরে কোঁদা।

সুরূপা দেখিতে লাগিলেন; আর মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"বেদের মেয়ে এমন সুন্দরী হয়! এ নিশ্চয় ভদ্রঘরের মেয়ে; বেদেরা চুরি করিয়া আনিয়াছে।"

এমন সময় বাহিরে একটা গোল হইল। এক প্রৌঢ়া রুক্ষ-কেশা স্খলিত-দেহা রমণী তাঁবুর ভিতর আসিয়াই কিচিমিচি কি বকিয়া উঠিল। সে ভাষা কেহই বুঝিতে পারিল না। হঠাৎ সুরূপাকে দেখিয়া, সে থমকিয়া দাঁড়াইল। একবার সেই বালিকার দিকে তাকায়, আবার সুরূপার দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি করে।

"রেখো না মা, ওকে রেখো না, ও তোমার সর্ব্বনাশ করবে।"

"করে করবে। তোকে এখানে ডাক্‌লে কে?"

"যদি রাখ—তো আমার বেটীর দাম দাও। দশ টাকা দাম।"

সুরূপা, বিরক্তির ভাবে দশটা টাকা মাগীর দিকে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। মাগী ধীরে ধীরে সেই কয়টি টাকা, এক একটি করিয়া গণিয়া তুলিয়া লইল। মাগী যাইবার সময় মুখ ফিরাইয়া সুরূপাকে বলিয়া গেল,—"যখন কেবল কাঁদ্‌বে মা, তখন গৌড়ের জঙ্গলে 'সা'-সাহেবের মস্‌জিদে

(৫)

বালিকার নাম দোপাটী। বালিকা কিছুই জানে না। যাহা জানিলে, মানুষ—মানুষ হয়, সুখ-দুঃখ বুঝিতে পারে, পাপ পুণ্যের বিচার করিতে পারে, বালিকা তাহার কিছুই জানে না। বালিকার ভয় নাই, লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, সন্দেহ নাই। অথচ বালিকার বয়স ষোল বৎসর হইয়াছে।

বালিকার মাথায় আর জটা নাই। জটার স্থানে এখন কুঞ্চিত কেশ-রাশি এলাইয়া আছে। বর্ণের সে পাংশুল ভাব নাই—দিব্য গৌরকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সুরূপাকে সে দিদি বলিয়া ডাকে; কান্তিচন্দ্রকে কখনও দাদা বলে, কখনও বাবু বলে; সর্ব্বদাই ছুটিয়া ছুটিয়া নাচিয়া বেড়ায়।

কাজের মধ্যে বালিকা পান সাজিতে শিখিয়াছে। সে যতগুলি পান সাজে, সকলগুলিই কান্তিচন্দ্রকে খাওয়ায় বা সুরূপার মুখে গুঁজিয়া দেয়। বালিকার আচার-বিচার-জ্ঞান নাই, উচিত-অনুচিত-বোধ নাই। কান্তিচন্দ্র পান খাইতে না চাহিলে, সে তাঁহার গলা ধরিয়া মুখে পান গুঁজিয়া দিত। তখন কান্তিচন্দ্র কেবল শিহরিতেন। কি জানি, দোপাটীর গায়ে কি লাগান ছিল! কি জানি, দোপাটীর ভাবভঙ্গিতে কেমন মাধুর্য্য ছড়ান ছিল!

(৬)

সুরূপা দোপাটীকে বড় ভালবাসিত, চাকর-বাকর বা অন্য কেহ দোপাটীর অতিচাঞ্চল্য দেখিয়া যদি তিরস্কার করিতে যাইত, তাহা হইলে সুরূপা সকলকেই ভৎর্সনা করিতেন। এমন কি স্বামী কান্তিচন্দ্র যদি কদাচিৎ দোপাটীকে শাসন করিতে উদ্যত হইতেন, তাহা হইলে সুরূপা স্বামীকেও তিরস্কার করিতে ছাড়িতেন না।

এত ভালবাসা, এত টান, এত আদর, এত সোহাগ সত্ত্বেও যখন দোপাটী কান্তিচন্দ্রের গলা জড়াইয়া তাহার মুখে পান গুঁজিয়া দিত, তখন কিন্তু সে দৃশ্য দেখিয়া সুরূপার কেমন কেমন ঠেকিত, একদিন সন্ধ্যার সময় দোপাটী কান্তিচন্দ্রের মুখে একটা বড় পান দিয়া সেই পানের অর্দ্ধেকটা নিজের দাঁত দিয়া কাটিয়া লইল, সুরূপার কেমন-কেমন-ভাব রোষে পরিণত হইল। সুরূপা স্বামীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে কক্ষাভ্যন্তরে টানিয়া লইয়া গেলেন এবং একটু যেন ভাবে স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ, হাজার হউক দোপাটী মেয়েমানুষ—সুন্দরী—ষোড়শী—পূর্ণযুবতী—ও কিছু না জানিলেও বয়সের গুণে ধীরে ধীরে আপনা-আপনি অনেক কথা

বুঝিতে পারিবে। তুমি ওকে অমনভাবে ঘাড়ে পিঠে কর, মুখে মুখ দিয়ে পান খাও, পান দাও;—এ সব কিন্তু আমার ভাল লাগে না, তোমার মনে পাপ না থাক্‌লেও লোকত ধর্ম্মত এ সব কাজ মন্দ, তুমি আর ওর সঙ্গে অমন ব্যবহার করো না।" কান্তিচন্দ্র একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "রূপ! ভয় কি, আমিও অষ্টপ্রহরই তোমার কাছে থাকি—আর যা কিছু করি, তোমার সম্মুখেই করি, তবে আর ওতে পাপ কি?"

সুরূপা।—আমার সম্মুখে কর বলেই পাপকাজ পুণ্যময় হবে, এমন কিছু লেখা আছে কি? তুমি আর অমন ব্যবহার কর্‌তে পার্‌বে না, অন্তত আমার সমুখে ও সব কিছু কর্‌তে পার্‌বে না।

কান্তিচন্দ্র স্ত্রীর আদেশবাণী শুনিয়া সুরূপার দিকে তাকাইয়া মুসলমানী ধরণে একটা লম্বা সেলাম করিলেন এবং বলিলেন, "জো-হুকুম মহারাজ, গোলাম হুজুরের হুকুম তামিল করিবে।"

(৭)

শিশুকে যাহা করিতে বারণ করা যায়, শিশু তাহা অগ্রে করে। নবাগত শিশু সংসারে তাবৎ বিষয়ই নূতন দেখে—সকল সামগ্রী দেখিয়া তাহার মনে হয়, এমন বুঝি আর দেখি নাই—একবার দেখি, দুইবার দেখি, বারবার দেখি। ইহার উপর যদি তাহাকে কোন কার্য্য করিতে বারণ করা যায়, তাহা হইলে শিশুর অনুসন্ধিৎসা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া যায়; সে সহস্র বিঘ্নসত্ত্বেও গোপনে সেই কাজ করে, গুপ্তভাবই পাপের মূল।

কান্তিচন্দ্র বিজ্ঞ কর্ম্মচারী হইলেও ভাবজগতে তিনি শিশু। সুরূপ যখন দোপাটীর সহিত অত হুড়াহুড়ি করিতে বারণ করিল, তখন কান্তিচন্দ্রের হৃদয়ের ভস্মাচ্ছাদিত বিলাসবহ্নি একবার যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। লজ্জা ও ভয় সে জ্বালা যেন বস্ত্রাঞ্চলে চাপিয়া রাখিল, কান্তিচন্দ্র সামলাইলেন—কিন্তু মনের সাধ তুষের আগুনের মত মনের মধ্যে ধিকিধিকি জ্বলিতে লাগিল। কান্তিচন্দ্র মনে মনে স্থির করিলেন, অতঃপর দোপাটীকে লইয়া সুরূপার চক্ষের অন্তরালে হুড়াহুড়ি খেলা করিবেন; তাহার সহিত খেলা করিলে তিনি সুখ বোধ করেন,—পাপভুজঙ্গ এমনি ভাবেই মনুষ্য-হৃদয়রূপী কল্পতরুকে জড়াইয়া ধরে।

(৮)

পান দে না”—দোপাটী কিন্তু এখন আর তেমন হাসে না, তেমন হুড়াহুড়ি করে না,—দোপাটী যেন এখন কেমন হইয়া গিয়াছে। সুরূপাকে সম্মুখে রাখিয়া দোপাটী যেমন দুষ্টামি করিত, বাহিরের ঘরে বা বাগানবাটীতে কান্তিচন্দ্রকে একলা পাইলেও দোপাটী তেমন হাসে না, তেমন বকে না; ঐ শুন না, বিহ্বল কান্তিচন্দ্র দোপাটীকে বারবার ডাকিতেছেন। দোপাটী কাছে আসিতেছে না, একটু যেন সলজ্জভাবে দূরে সরিয়া যাইতেছে।

না পাইলেই আকাঙ্ক্ষা বাড়ে, মনের মতনটি না হইলেই মনের মতন হইবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিতে ইচ্ছা করে; কান্তিচন্দ্র দোপাটীর জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, গৃহ ছাড়িয়া বাগানবাটীতে বাস করিতেছিলেন; দিনান্তে সুরূপার শুষ্কমুখ দেখিবার জন্য একবার বাসায় যাইতেন বটে; কিন্তু সে যাওয়া মাত্র; সে লোকদেখান যাওয়া; তথাপি দোপাটী কিন্তু তাঁহার হইল না, ফুলের প্রজাপতির মত দোপাটী এক একবার তাঁহার কাছে আসে, আবার রূপের পাখা ছড়াইয়া দূরে পলাইয়া যায়। আশায় উৎকণ্ঠায়—নৈরাশ্যে বিষাদে কান্তিচন্দ্রের অপরূপ রূপ শুকাইয়া গেল, চক্ষু কোটরগত হইল, তিনি একপ্রকার আত্মহারা হইলেন।

(৯)

ওদিকে সুরূপা কৃষ্ণপক্ষের শশীর ন্যায় দিনে দিনে মলিন হইয়া যাইতে লাগিলেন; স্বামীর মঙ্গলচিন্তা, সংসারের চিন্তা, নিজের চিন্তা, ইহকাল-পরকালের চিন্তা, কত চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ধরিল, জীয়ন্ত অবস্থায় চিন্তারূপ-চিতায় অহরহ পুড়িতে লাগিলেন।

দুঃখে পড়িয়া সুরূপার মেজাজটাও খারাপ হইয়া গেল; স্বামী আসিলে স্বামীর সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন না, এমন কি তাঁহার কাছে পর্য্যন্ত যান না। একদিন সন্ধ্যার সময় কান্তিচন্দ্র বিষাদমুখে বাসায় আসিয়াছেন, মনের সাধ সুরূপার সহিত দণ্ডকয়েক কথা কহেন; সুরূপা কথা কহিল না, সরিয়া পলাইতে চেষ্টা করিল। কান্তিচন্দ্র সুরূপার হাত ধরিলেন। বলিলেন, “রূপ! একটু দাঁড়াও, আমার দুটা কথা শুন। তুমি কেন অমন কর, আমি ত কোন দোষের দুষী নহি। আমি ত কোন পাপই করি নি, তোমায় যথেষ্ট অর্থ দিচ্চি। তুমি যা চাচ্ছ, তাই পাচ্চ, তবে তুমি এমন কেন?”

সুরূপা।—কথা কইব না ভেবেছিলেম, কিন্তু তুমি যখন হাত ধরে কথা কইলে, তখন একটা উত্তর দিতেই হয়। আমি তোমার টাকা পয়সা চাইনে, ধনদৌলত চাইনে, আমি তোমাকে চাই। তুমি যখন আমার হ'লে না, তুমি যখন আমার চক্ষের উপর একটা বেদের মেয়েকে নিয়ে বাগানে আমোদ-প্রমোদ কর্‌তে লজ্জা বোধ কোচ্ছো না, তখন তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই। আমার ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে।

ছি ছি সুরূপা! হেলায় হাতের পাঁচ হারাইলে, এখন যে অনেক খেলা বাকি আছে।

(১০)

পাঁজরভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কান্তিচন্দ্র উদাসনয়নে বাগানের দিকে চলিয়া গেলেন; তিনমাস দোপাটীর সাধনা করিয়াও তাহাকে নিজের করিতে পারেন নাই বলিয়া সুরূপার আশ্রয়ের আশায় গিয়াছিলেন; স্ত্রী হইয়া সুরূপা তাঁহাকে দূর করিয়া দিল, ধীরে ধীরে কান্তিচন্দ্র বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়াছে; আকাশের পূর্ব্ব-কোণে চাঁদ উঠিয়াছে; গ্রীষ্মকাল, ঝির্ ঝির্ করিয়া একটু হাওয়া বহিতেছে; বাগানে বেলা চামেলি জুঁইফুল ফুটিয়াছে, সৌরভে দশ দিক্ আমোদ করিয়াছে; দোপাটী ফুলের হার, ফুলের বলয়, ফুলের মুকুট পরিয়া, বনবালা সাজিয়া, নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একরাশি চুলের উপর থরে থরে চম্পকের মালা সাজান আছে, দোপাটীর অপরূপ রূপ! ভগ্নহৃদয় কান্তিচন্দ্র উদাসমনে বাগানে প্রবেশ করিলেন। উপরে চাঁদের আলো, নীচে ফুলের আলো, আর এই দুই আলোর মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া দোপাটী নিজের রূপের আলোর সহিত ফুলের আলো মিশাইয়া চাঁদের আলোয় যেন ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে; কান্তিচন্দ্রের বিষাদ গেল, নৈরাশ্য দূর হইল। কান্তিচন্দ্র ভাবিলেন, দেখি কোন্‌টা; উপরে আকাশ, আর আকাশের চাঁদ দেখিব না; নীচে বাগান, আর বাগানের ফুল দেখিব না; নানা-পুষ্পাভরণভূষিতা ফুল্লারবিন্দবদনা কিশোরী বনদেবীকে দেখিব। কান্তিচন্দ্র বিহ্বল বিমূঢ় হইলেন, বিভ্রান্তভাবে অগ্রসর হইতে হইতে দোপাটীর কাছে গিয়া পড়িলেন। দোপাটীর আর সে ভাব নাই, এখন সে সলজ্জা গম্ভীরা নারী; কান্তিচন্দ্র এই নারীমূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ধীরে ধীরে তাহার দুইটি হাত ধরিয়া বলিলেন, "দোপাটী! এমন করিয়া

কতদিন কাটিবে, আমি যে আর পারি না; তোমার আমি যা উপকার করিয়াছি, তোমাকে আমি যে ভাবে প্রতিপালন করিয়াছি, তাহাতে তোমার কি আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করা শোভা পায়? তুমি যে আমায় তিল তিল করিয়া ক্ষয় করিতেছ, তাহা কি তুমি বুঝিতেছ না; তোমার ধর্ম্মে যাহা হয়, তুমি তাহাই কর।"

দোপাটী।—বস্ বাবু বস্, আর বলিতে হইবে না। আমাদের মধ্যে ধর্ম্ম নাই, অধর্ম্ম নাই, পাপ নাই, পুণ্য নাই, কেবল আমরা উপকারকের উপকার ভুলি না, সে ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আমরা সর্ব্বস্ব পণ করিতে পারি; কিন্তু আমাকে পাইলে তোমার ভারি অমঙ্গল হইবে। এ কথা আমাদের কত্তা-মা সেই কারাগোলার ঘাটে তোমার পত্নীকে প্রথম দিনই বলিয়া গিয়াছেন। সে কথা আমি বিশ্বাস করি, তাই এতদিন ইচ্ছা করিয়াই তোমার সাধ মিটাই নাই; যখন উপকারের কথা তুলিয়াছ, তখন তোমার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই হউক। সে ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আমি তোমার হইলাম। কিন্তু জানিও, বেদের মেয়ে চির-কাল কাহারও হইয়া থাকে না। আর জানিও, বেদের মেয়ে ভালবাসিতে জানে না।

কান্তিচন্দ্র।—আমার আবার বিপৎ-সম্পদ্ কি, বাঁচিলে তবে ত?

দোপাটী।—তোমার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই হইবে, আমি কি করিব বল। কিন্তু জানিও, সতী নারীর দীর্ঘশ্বাস ব্যর্থ যায় না, বেদের মেয়ে হইলেও এ কথা আমরা বেশ জানি।

(১১)

কান্তিচন্দ্র এখন কি সুখী? তাহার ত মনের সাধ মিটিয়াছে। সে ত অলভ্যকে লাভ করিয়াছে। জ্ঞানহারা দিশেহারা হইলে যদি সুখী হওয়া যায়, তাহা হইলে কান্তিচন্দ্র সুখী বটে; কিন্তু সে যে পাগল, পাগলকে সুখী বলিব কেমন করিয়া! কান্তিচন্দ্র দোপাটীর রূপে পাগল, দোপাটীর গুণে পাগল, দোপাটীর ভাবে পাগল, সে এখন ত্রিভুবন দোপাটীময় দেখে। উপাসক ইষ্টদেবীর যেরূপ সেবা করেন, কান্তিচন্দ্র দোপাটীর ততোধিক সেবা করে। কাছারীর কাজ নাই, বাটীতে যাতায়াত নাই, লোক-লৌকিকতা নাই, তেমন স্বজন-প্রতিপালন নাই,—কান্তিচন্দ্রের আছে কেবল দোপাটী।

শ্রাবণ মাস, আকাশ সর্ব্বদাই মেঘে ঢাকা, ধরাতল সর্ব্বদাই জলে ভরা, অনবরত বৃষ্টির ধারা পড়িতেছে; দেখিলে মনে হয়, আকাশের দেবতাগণ যেন পৃথিবীর জন্য কেবল রোদন করিতেছে; এ রোদনে দেবতার গর্জ্জন নাই, বিদ্যুতের বিকাশ নাই, সব স্তম্ভিত ভাব; কেবল ঝর্ ঝর্ আসার-সম্পাত, ঘোর অন্ধকার, আকাশেও আলো নাই, ধরাতলেও আলো নাই, কোলের মানুষ চেনা যায় না—কেবল অন্ধকারের স্তূপের মধ্যে মাঝে মাঝে খদ্যোতের অগ্নিবিন্দু দেখা যাইতেছে। কান্তিচন্দ্র বাগানবাড়ীর বারাণ্ডায় বসিয়াছেন, বাহিরের অন্ধকারের সহিত নিজের অন্ধকারময় মনকে মিশাইয়া দিয়া তমপিণ্ডের ন্যায় বসিয়াছেন। এমন সময় অন্ধকার ঠেলিয়া যেন, দোপাটী আসিয়া দাঁড়াইল। দোপাটীর অপূর্ব্ব বেশ, পরণে ভিজা কাপড়, বস্ত্রাঞ্চল হইতে টশ্ টশ্ জল পড়িতেছে, আজানুপরিলম্বিত কেশরাশি বাহিয়াও জল পড়িতেছে, আর সেই কেশরাশির উপর খদ্যোতের মালা জড়ান আছে; দপ্ দপ্ করিয়া খদ্যোতের মালা জ্বলিতেছে, আর মনে হইতেছে, যেন ঝর্ ঝর্ করিয়া কত মণিমাণিক্যের দ্যুতি ঝরিয়া পড়িতেছে। দোপাটী বেদের মেয়ে, ফুল ফল লতা লইয়া, বেশবিন্যাস করিতে তাহার ন্যায় কেহ জানিত না। সে যেমন জোনাকী ধরিয়া জোনাকীর মালা গাঁথিত, তেমন বুঝি কেহ জানিত না। তাই তাহার সাজের গুণে তাহাকে মর্ত্ত্যের নয় বলিয়া মনে হইত।

দোপাটী।—বাবু সাহেব! আমি আপনার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি, আমার কাল ফুরাইয়াছে, আমি আর আপনার নিকট থাকিতে পারিব না; আমার ঋণ আমি পরিশোধ করিয়াছি।

কান্তিচন্দ্র।—সে কি দোপাটি! তুমি যাবে কি? তুমি গেলে যে আমি মরে যাব, তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব, অমন কথা বলে ঠাট্টা কোরো না দোপাটী।

দোপাটী।—আমি ত ঠাট্টা-তামাসা কখন জানিনে। আপনি ত আমায় ভালবাসার জোরে পান নাই, আমাকে ভাল বাসাইতেও শেখান নাই; আপনি আমার উপকারক, সেই উপকারের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে প্রার্থনা আমি মঞ্জুর করিয়াছিলাম। আমি এখন গর্ভবতী, আপনার আমার উপর আর কোন অধিকার নাই; আপনার গৃহে, আপনার আশ্রয়ে আমি সন্তান প্রসব করিব না। আমাদের বেদীয়া

চিরজীবন আপনার দাসত্ব করিতে হইবে,—আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না। গৌড়ের জঙ্গলের কোন এক গুপ্তস্থানে আমাদের একটী আড্ডা আছে, আমি সেইখানেই থাকিব।

কান্তিচন্দ্র।—সে কি দোপাটি! তা হবে না, আমি তোমার নিকট অনেক অপরাধে অপরাধী, আমার সে সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমার কাছে থাকো, তুমি চক্ষের আড়াল হইলে ত মরিব।

অনতিদূরে অন্ধকার ভেদ করিয়া উত্তর আসিল, "তুমি মরিবে না, পাগল হইবে, তুমি মরিবে না, পাগল হইবে, আমি চলিলাম।" উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত কান্তিচন্দ্র "কোথায় যাও" ঊর্দ্ধশ্বাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আর সেই শব্দের দিক্ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিলেন। সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারকে গাঢ় করিয়া বারবার মুষলধারে শ্রাবণ মেঘের অশ্রান্ত বর্ষণ হইতে লাগিল; অগণিত ভেককুল অজস্র বর্ষাবারি পানে উল্লসিত হইয়া চারিদিক হইতে যেন বিকট হাস্যের শব্দ করিতে লাগিল; আর সেই শব্দরাশির সহিত কান্তিচন্দ্রের আর্ত্তস্বর অতীতের অনন্তে মিশাইতে লাগিল।

(১২)

প্রভাত হইয়াছে, বর্ষাকালের প্রভাত। এ প্রভাতের কোন শোভাই নাই, কেবল নিশাকালের ঘনান্ধকার অপসৃত হইয়াছে মাত্র,—আর সেই বৃষ্টি, সেই মেঘ, সমানই বর্ত্তমান। সূর্য্যের প্রভা আছে বটে কিন্তু কিরণ নাই, পাতায় পাতায় সোণার বরণ নাই। যা হউক, প্রভাত হইয়াছে, পথের দুইধার দিয়া নদী বহিয়া যাইতেছে, পথ দিয়াও নদী বহিতেছে।

ওকি ও! ওই ভাঙ্গাবাড়ীটার সম্মুখে ভাঙ্গাদরজার পাশে ওটা কি ও! ওকি মনুষ্যের শবদেহ, না ভস্মাচ্ছাদিত মনুষ্যদেহ! একটু অগ্রসর হইয়া দেখ দেখি, একি এ! এ যে কান্তিবাবুর বাড়ী, সে বাড়ীর এই শ্রী হইয়াছে! যে বাড়ীতে বারমাস দুর্গোৎসব ব্রাহ্মণভোজন হইত, সে বাড়ী এখন জনশূন্য!

(ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

X1/5 642
BENGAL LIBRARY 9 SEP.
12677
37177

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক পত্র ।)

নবম বর্ষ । } ১৩০৮ সাল, আষাঢ় । { ১২শ সংখ্যা ।

"সরস্বতী" স্রোতস্বতী ।

১।—সরস্বতী—হিন্দুর পরমপবিত্র নদী। তজ্জন্যই উহার একতম নাম "দেব নদী।" ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাঠক মহাশয়ের নিকট পেশ্ করিতেছি। মোক্ষদায়িনী সপ্ত পুরীর (১) ন্যায়, ৭ (সাতটী) তটিনীও "দেব নদী" নামে প্রথিত। যথা,—

"গঙ্গে চ যমুনে চ গোদাবরি সরস্বতি ।
নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥"

২।—অতি প্রাচীন কালে আমাদের আর্য্য-পূর্ব্ব-পিতামহগণ, 'সরস্বতী' ও 'দৃশদ্বতী' এই দুই পবিত্র নদীর মধ্য-ভাগস্থ প্রদেশে প্রথম উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সেই প্রদেশের নাম 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' (২)। ঐ প্রদেশে "সরস্বতীর" নামান্তর—"কাগার"। কুরুক্ষেত্রের নিকটে উহা 'ফল্গু'-তরঙ্গিণী-বৎ অন্তর্জ্জল-বাহিকা।

৩।—দেবনদী সরস্বতী, প্রায় সর্ব্বত্রই অন্তঃ-সলিল-বাহিনী হইয়া, প্রয়াগে গঙ্গার সহিত সঙ্গত হইয়াছেন। পরে পুনর্ব্বার ত্রিবেণীতে গঙ্গা হইতে পৃথক্ হইয়া হুগলী জেলার নানা স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কলিকাতার পর-

(১) মুক্তিপ্রদা সপ্ত পুরীর নাম :—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া, কাশী কাঞ্চী হ্যবন্তিকা ।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ ॥"

(২) মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়।

পারবর্ত্তি-'শিবপুরস্থ' "কোম্পানির বাগানের" অদূরে পুনর্ব্বার ভাগীরথীতে সম্মিলিত হইয়াছেন (৩)।

৪। হিমগিরিরাজ হিমাদ্রির পাদ-প্রদেশ-সন্নিহিত, অথচ সমুদ্র হইতে ষট্‌শত (৬০০) ক্রোশ দূরবর্ত্তী "পারওয়ার্" (৪) নামক এক জনপদের সন্নিকটস্থ ক্ষুদ্র পর্ব্বত হইতে বিপুল সলিল রাশির যে একটী প্রবাহ, শতদ্রু (সট্‌লেজ)-নাম্নী তটিনীতে সম্মিলিত হইয়াছিল, ঐ স্রোতস্বতীর নাম "সরস্বতী"। উহারই অনতিদূরে একতমা ক্ষুদ্রতমা তরঙ্গিণী প্রবহমানা। এই দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র নদীদ্বয়ের মধ্যে এক প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডের ব্যবধান, বহু দিন বিদ্যমান ছিল। যে সময়ের কথা এখানে বর্ণন করা যাইতেছে, তাহা খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ঘটনা।

ঐ ভূমি-ভাগের ব্যবধান-মৃত্তিকা খনিত হইলে, "সার্হিন্দ" ও "মন্‌সুর্" প্রদেশীয় বিশাল ভূ-খণ্ডের উর্ব্বরা-শক্তি সমুৎপাদিত হইবে, এই সংস্কারের ও উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া, "ফিরোজ্ উদ্দিন্" বাদশা—উল্লিখিত উভয় পর্ব্বত-দুহিতাকে একত্র সম্মিলিত করিতে, কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কেবল সঙ্কল্প নয়—উহা প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যেও পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

মহারাজ ফিরোজের মনঃকল্পনা, যাহাতে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তদুদ্দেশে উক্ত স্থানগুলি, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার কামনায় রাজধানী হইতে তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই সূত্রে তাঁহাকে সমস্তই নিরীক্ষণ করিতে হয়। তিনি তৎ-প্রদেশাভিমুখে যাত্রা পূর্ব্বক একাদিক্রমে তাবৎ বৃত্তান্ত পর্য্যবেক্ষণ-সাহায্যে বিদিত হইবার পর, স্বীয় মনোরথ পরিপূরিত করিতে সমর্থ হইলেন। ধন্য সম্রাটের উৎকৃষ্ট উদ্যম! তাঁহার পর্য্যবেক্ষণের সুগুণে সুফলই ফলিল। পাতশার যেরূপ অভিলাষ, সেই রূপই আদেশ! তাঁহার অনু-

---

(৩) প্রকৃত প্রস্তাবে হুগলী জেলার অন্তর্গত "সপ্তগ্রাম" নামক গ্রামের নিম্ন দিয়া, প্রাচীন কালে ভাগীরথীরই স্রোতঃ, প্রবাহিত ছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত 'সপ্তগ্রামের' নিম্ন দিয়া প্রবাহিতা ভাগীরথী, একটী সুনাব্যা নদী ছিল—অর্থাৎ উহাতে নৌকা ও জাহাজাদিও গতায়াত করিত। উহার উপর দিয়া বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যপোত, সদা বাহিত হইত। এই নদীই, পবিত্র-সলিলা ভাগীরথী বলিয়া হিন্দুগণ কর্ত্তৃক প্রপূজিত হইতেন।

ক্রমানুক্রমে একেবারে ৫০,০০০ (পঞ্চাশৎ সহস্র) শ্রমজীবী, একাদিক্রমে অক্লান্ত ও অশ্রান্ত শ্রমে ঐ বিষম কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া গেল!

খনন-কালে দৃষ্ট হইল—উক্ত ভূ-ভাগের একাংশ হইতে মৃত হস্তীর অস্থি—অন্যাংশ হইতে সুদীর্ঘ প্রকাণ্ড মানব-দেহের বিশাল ভুজদেশ, অবলোকিত ও উত্তোলিত হয়। খনন-লব্ধ নর-শরীরের বাহুদেশ, ৫ (পাঁচ) ফুট, ১ এক ইঞ্চি অর্থাৎ প্রায় হস্তত্রয়-অষ্টাঙ্গুলি-পরিমিত।

ঐ খনিত খাত, সম্প্রতি বর্ত্তমান নাই। যখন "ফিরিস্তার" ইতিবৃত্ত, ইংরাজিতে ভাষান্তরিত হয়, তাহার ৫০০ (পাঁচ শত) বৎসর পূর্ব্বে উহার বিদ্যমানতা ছিল।

৫।—১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সরস্বতীর মোহানা, বালুকাপূর্ণ হইয়া অনাব্য হইয়া উঠে। এই জন্য তদানীন্তন পোর্ত্তুগীজ বণিগ্‌গণ, সপ্তগ্রাম (৫) বন্দর পরিত্যাগ করিয়া কয়েক ক্রোশ নীচে "গোলাঘাট" (৬) নামক স্থানে এক নূতন বন্দর স্থাপন করেন। আজি-কালি ত্রিবেণীর নিকট সরস্বতীর চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু উহা একটি ক্ষুদ্র খালের ন্যায়। জোয়ারের সময় উহা কেবল জলময় হয়। সপ্তগ্রামের নিম্ন দিয়া প্রাচীন কালে দীর্ঘ নদী প্রবাহিত ছিল। সেই নদী, অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এমন কি, তাহার বিস্তার, চতুঃ-শত-ক্রোশ-পরিমিত ছিল। কিন্তু এখন তথায় সরস্বতীর চিহ্নমাত্রও নাই। অদ্যাবধি 'মগ্‌রার বালী' বলিয়া যে বালুকা, কলিকাতার বাজারে বিক্রীত হয়, উহা প্রাচীন সরস্বতীরই বালুকা। তথায় প্রায়ই বালী খুঁড়িবার সময় জাহাজের ভগ্নাবশেষ (মাস্তুলাদি) পাওয়া যায়। তাহা দেখিয়াই সরস্বতীর অবস্থান-স্থানের অনুমান হয়। বিশুষ্ক সরস্বতীর স্রোতঃ, কিন্তু অদ্যাপি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ত্রিবেণীর দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ বহু-সংখ্যক গ্রামের ভিতর এখনও সরস্বতীর স্রোতঃ পরিদৃষ্ট হয়। হুগলী জেলার অন্তর্গত আম্‌তা গ্রামের সান্নিধ্যে সরস্বতীর একটি শাখা, দামোদর নদে প্রবেশ করিয়াছে। সরস্বতীও, শাঁকরাল নামক স্থানের নীচে পুনর্ব্বার প্রকাণ্ড নদীর আকার ধারণ পূর্ব্বক উলুবেড়িয়া, ডায়মণ্ড-হার্ব্বার প্রভৃতি জনপদের নিম্ন দিয়া প্রবাহমান হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছেন। সকলেই,

---

(৫) অন্য নাম—"সাত গাঁ"।

(৬) গোলাঘাটই সহর হুগলী নামে পশ্চাৎ প্রসিদ্ধ হয়।

অবগত আছেন, ভাগীরথী,বাম-বাহিনী হইয়া,কালীঘাটের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইয়া ক্রমে সাগর-সঙ্গতা হইয়াছেন। ভাগীরথীর স্রোতঃ, সম্প্রতি কালী-ঘাট অতিক্রম পূর্ব্বক ক্রমশঃ মজিয়া গিয়াছে ; কিন্তু সাগর-সঙ্গমের সমীপে উহার কিয়দংশ, প্রবল আকারে অদ্যাপি দেখা যাইতেছে।

৬।—খিদিরপুরের নিম্ন হইতে প্রবাহিত পশ্চিমাভিমুখীন স্রোতঃ, একটী কাটা-খাল-মাত্র। ঐ খাল-কাটার পর গঙ্গার স্রোতঃ, উহার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া, সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়া সাগরগামী হইয়াছে। সপ্তগ্রাম, এই ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত। এই গ্রাম, এখন সুবর্ণ-বণিক-দিগের একটি প্রধান সমাজ-স্থান।

৭।—এবার এই পর্য্যন্ত বর্ণিত হইল।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

কাদম্বিনী।

(ক্ষুদ্র গল্প।)

বাপের বয়স ৫৫ পঞ্চান্ন বৎসর, ছেলের বয়স ২৪ চব্বিশ বৎসর, বাবার পরিবারের বয়স ২৪ চব্বিশের কাছাকাছি। বাবার নাম রামধন বিশ্বাস, ছেলের নাম তারাপদ, রামধনের পরিবারের নাম কাদম্বিনী।

রামধন পূর্ব্বে কোম্পানির পরমিট গুদামে কাজ করিতেন, একটী চক্ষু যাওয়াতে কর্ম্ম ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে, পেন্‌সন্ হয় নাই, তারাপদের যখন ১৩ বৎসর বয়স, সেই সময় তাহার মাতৃ-বিয়োগ হয় ; এক বৎসর পরে রামধন পুনরায় একটি ডাগর মেয়ে বিবাহ করেন, সেই মেয়ের নাম কাদম্বিনী। বিবাহের এক বৎসর পরে কাদম্বিনীর একটি পুত্র-সন্তান জন্মে ; তাহার পর বৎসর একটি কন্যা ; তৃতীয় বৎসরে একসঙ্গে একটি পুত্র একটি কন্যা। তাহার পর তিন বৎসর বন্ধ। তিন বৎসর পরে একটি হাতকাটা কন্যা ; এখন অর্থাৎ বর্ত্তমানে একটি কচিছেলে কাদ-ম্বিনীর কোলে।

তারাপদের বিবাহ হয় নাই। তাহার পিতা পিতামহেরা কোন জাতি তাহা আমরা জানি না। ব্রাহ্মণ কায়স্থ হইলে আজিকার বাজারে মূর্খ ছেলেও

উচ্চ ডাকে নীলাম হইয়া যাইত; তারাপদ মূর্খ ছেলে, তথাপি তাহার ডাক হয় নাই। ইহাতেই বুঝিতে হইবে, তারাপদ কায়স্থ ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে নয়।

তারাপদ নিরেট মূর্খ, তারাপদ গোঁয়ার, তারাপদ গুলিখোর। তারাপদের কিন্তু দুটি গুণ আছে;—তারাপদ চোর নয়, তারাপদ লম্পট নয়। বিবাহ হয় না কেন, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি না। পাড়ার কেহ কেহ বলে, উহাদের বিবাহে অনেক টাকা লাগে; মেয়ে কিনিয়া বিবাহ করিতে হয়। রামধনের টাকা নাই, সুতরাং ২৪ বৎসরের পুত্র অবিবাহিত।

রামধনের অবস্থা ভাল নহে। চাকরি ছিল উপজীবিকা, বিধির বিড়ম্বনায় চাকরিটি গিয়াছে, অন্য কাজকর্ম্ম জোটেনা, কাজে কাজেই রামধনের বড় দুরবস্থা। যখন চাকরি ছিল, রামধন তখন কলিকাতার খালের পূর্ব্বদিকে উল্টাডিঙ্গি নামক স্থানে সস্তাদরে একখণ্ড জমি খরিদ করিয়া একখানি একতালা বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন;—সেই বাড়ীখানি এখন বন্ধক পড়িয়াছে;—সেই টাকায় গোছে গাছে এখন সংসার চলিতেছে।

মানুষের অবস্থা মন্দ হইলে ধর্ম্মকথা বলিতে হয়। আমরা রামধনের অনুকূলে ধর্ম্মকথা বলিব। পেটে খাইবার জন্য রামধন বাস্তবিক বাড়ী বন্ধক দেন নাই, মৎলব ছিল। বন্ধক দিবার পরেই তিনি বড়বাজারে দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীটে একখানি সুতার দোকান খোলেন; দোকানখানি দেড়বৎসর চলিয়াছিল; কিছুই লাভ হয় নাই, একথা বলা যাইবে না;—হইয়াছিল কিঞ্চিৎ, কিন্তু খাতাপত্রে লাভের অপেক্ষা দেনা বেশী দাঁড়ায়। কাপড়ের কারবারে সুতার কারবারে, আরও কয়েকটা কারবারে দোকানদারকে অথবা জানাশুনা খরিদারকে ধারে জিনিষ পত্র ছাড়িয়া দিতে হয়, না দিলে কারবার চলে না; সেই হিসাবে রামধনের অনেক টাকা বিলাত-বাকী পড়ে। কাজে কাজেই দোকান বন্ধ হইয়া যায়। মহাজনেরা নালিশ করিয়া ডিক্রী করে, রামধন গা ঢাকা হন। আজিও গা-ঢাকা।

তারাপদ কোন কাজ করে না। বাড়ীতেই প্রায় থাকে না। বেলা একটার সময় একবার আসিয়া ভাত খাইয়া যায়, সন্ধ্যার পর একবার কিছু খাবার চায়; বাড়ীতে মুড়ী কেনা থাকে, বিমাতার স্নেহের হস্তে

একজন পাঁচালীওয়ালা বন্ধুর বৈঠকখানায় শয়ন করে। নিজ বাড়ীর সঙ্গে তারাপদের ঐ পর্য্যন্ত সম্পর্ক।

সংসারে বড় কষ্ট। পরিবার অনেকগুলি। ধার করা টাকা। কর্ত্তা গা-ঢাকা। কাজে কাজেই বড় কষ্ট। দুই বেলা রন্ধন হয় না;—প্রতিদিন বেলা দুই প্রহরের পর যৎসামান্য উপকরণে অন্ন প্রস্তুত হয়। এই কষ্টের সংসারে কাদম্বিনী কিন্তু চওড়া চওড়া পাড়ওয়ালা ফরসা ফরসা কাপড় পরেন, কর্ত্তার চাকরির আমলে খান্‌কতক গহনা হইয়াছিল, বাড়ী বন্ধকের পূর্ব্বে কাদম্বিনী তাহার একখানিও বন্ধক দিতে দেন নাই, সেই গহনাগুলি কাদম্বিনী নিত্য বৈকালে অঙ্গে দেন, কবিরাজ এন সেন, এবং এন, দত্তের সুগন্ধি তৈলে চুল বাঁধেন, হাতে পায়ে, নখে ঠোঁটে, এন, দত্তের সুপ্রশংসিত পরিমলময় তরল আলতা মাখিয়া বিবি হন, কালো কালো গুবরে পোকার টিপ্‌ কাটেন, এন দত্তের সুরভিময় তাম্বুলীন মিশাইয়া পান খান, দিব্য সৌখিনভাবে থাকেন। সংসারের তত কষ্টেও ঐরূপ নাগর মোহিনী সজ্জায় দিব্য হাসি হাসি মুখে পঞ্চান্ন বৎসরের পতির সঙ্গে সটান আমোদ আহ্লাদ করেন।

রামধন বিশ্বাস কাদম্বিনীর অত্যন্ত বাধ্য। অধিক বয়সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেই স্ত্রীর বাধ্য হইতে হয়, এই বিশ্বজনীন সূক্ষ্ম তত্বটী রামধনের উত্তমরূপ জানা হইয়াছে। অতগুলি ছেলেমেয়ে হইলেও কাদম্বিনী এখনও যুবতী, রামধন ৫৫ বৎসরের বৃদ্ধ;—সুতরাং সর্ব্বদাই যুবতীর মন জোগাইয়া চলিতে হয়। কেবল তাহাই নহে, রামধনকে পদে পদে কাদম্বিনীকে ভয় করিয়া চলিতে হয়।

তারাপদ এই বিমাতাকে মা বলে না। সমবয়স্কা বলিয়া নাম ধরিয়াও ডাকে না। কাদম্বিনীর প্রথম সন্তানের নাম মন্মথনাথ; সেই নামের যোগে তারাপদ কাদম্বিনীকে মোনার মা বলে। যাহাই বলুক, তারাপদ কিন্তু মোনার মাকে মনে মনে অত্যন্ত ঘৃণা করে;—চক্ষেও কালসার্পিনী দেখে।

কাদম্বিনী অত্যন্ত মুখরা। স্বামীর সহিত যখন কলহ হয়, কাদম্বিনী তখন জাতি-বিচার পর্য্যন্ত বাকী রাখেন না। সেকালে বধূ-ননদে যেরূপ ঝুটাপুটি ঝগড়া হইত, কাদম্বিনী এখন পতির সঙ্গে সেই রকম ঝুটাপুটি ঝগড়া করেন। মধ্যে মধ্যে সপত্নীপুত্র তারাপদের সঙ্গেও দুই এক হাত লাগিয়া যায়। একবার আমরা আসল কথা বলিব।

একদিন সন্ধ্যার পর বৃদ্ধ রামধন আপনার শয়ন ঘরে বসিয়া কাশী-রাম দাসের মহাভারত পড়িতেছেন, পাশের ঘরে কাদম্বিনী শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার চারিধারে ছেলে মেয়েরা খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, এমন সময়ে তারাপদ আসিয়া ডাকিল, "মোনার মা!"

মোনার মা উত্তর দিলেন না। তারাপদ আবার ডাকিল, "মোনার মা!" সেবারেও মোনার মা, কথা কহিলেন না। পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক গর্জ্জনে তারাপদ তৃতীয়বার ডাকিল, "মোনার মা!"

এইবার মোনার মা গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিলেন। পূর্ব্ববর্ণিত মোহিনী বেশ। চক্ষুদুটি রক্তবর্ণ, সুন্দর মুখখানিও রক্তবর্ণ। কেননা, কাদম্বিনী সুন্দরী। ক্রোধের সময় সুন্দরীদের মুখ চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, সেই লক্ষণে তারাপদ বুঝিল, রাগ হইয়াছে।

তিনবার ডাকে উত্তর না পাইয়া তারাপদেরও রাগ হইতেছিল, এমন সময়ে কাদম্বিনী হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "জোটে কোথা থেকে? হয় কোথা থেকে? আসে কোথা থেকে? মুখে কেবল খাবার—খাবার—খাবার! আজ কেবল উনুনের ছাই আছে। পঁচিশ বছরের মদ্দ, এক-কড়ার ক্ষমতা নেই, রোজ রোজ কেবল খাওয়াও—খাওয়াও—খাওয়াও! বুড়ো আর পার্‌বে না, দূর হয়ে যা!"

তারাপদ ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না। অত্যন্ত কর্কশস্বরে বলিল, "হাজারবার খাবো! তোর বাবার কি! আজ তুই মদ খেয়েছিস! নিশ্চয় খেয়েছিস! মুখ চক্ষু লাল! তোর ঐ মুখে আমি লাথি মারি!"

তারাপদ লাথি মারিতে উদ্যত হইল। ছেলেরা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বৃদ্ধ রামধন কাঁপিতে কাঁপিতে দ্বারের কাছে আসিয়া উঁকি মারিলেন। দেখিতে পাইয়া তারাপদ পিতাকে এক ধাক্কা দিয়া সক্রোধে বলিল, "তুমি কেন এখানে? আচ্ছা দাঁড়াও! তোমার সাক্ষাতেই আজ আমি এই বেটীর দর্প চূর্ণ করিব! বেটী মদ খেয়েছে! মুখ চক্ষু লাল করেছে! আবার এক কালা পোকার টীপ্ কেটেছে। রঙ্গ দেখ! কথা কহিও না! বাবা আছ, বাবাই আছ! কথা কহিলে এক চড়ে তোমার—" কর্ত্তাকে এই রকম ধমক দিয়া, কাদম্বিনীর দিকে ফিরিয়া, তারাপদ

ভালবাসা আছে! নিশ্চয় আছে! তারি সঙ্গে তুই মদ খাস! এক লাথিতে আজ তোরে আমি সোজা করিব! কারে কি বলিস, তাহা তুই জানিস? আমি তারাপদ বিশ্বাস, আমার হাতে তোর—আমি-বাবা নই বাবা! আমার হাতে তোর নিশ্চয় মৃত্যু!"

তারাপদ পুনর্ব্বার লাথি তুলিল, কাদম্বিনী কাঁদিয়া উঠিলেন, যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিয়া গালাগালি পাড়িতে লাগিলেন, ছেলে মেয়েরা চীৎকার করিয়া উঠিল।

কর্ত্তা আর চুপ্ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; কদলীদলের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। কাদম্বিনীকে ছাড়িয়া, দুই হাতে ঘুসি পাকাইয়া, দন্ত পেষণ করিতে করিতে, তারাপদ এক লম্ফে কম্পিত বৃদ্ধের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; ভ্রূকুটি করিয়া জিজ্ঞাসিল, "কিসের কম্প? শীতের না জ্বরের? জ্বরের না ভয়ের? অত কম্প ভাল নয়! দেখ বাবা! তোমার ঐ মেয়েমানুষটির জগত-মোহিনী সাজ-সজ্জা দেখিয়া তুমি নিশ্চয় তাহা বুঝিতে পার, মুখে কিছু বল না, সেটা কেবল ভয়ে। তোমার মেয়েমানুষ ওপাড়ার রামকালীর সঙ্গে রোজ সন্ধ্যা-কালে মদ খায়। রামকালীর টাকা আছে, তোমার মেয়েমানুষ রোজ রোজ টাকা পায়। রামকালী উহাকে কুলের বাহির করিবার পরামর্শ করিতেছে! কেন তুমি বিয়ে করিলে? কেন তুমি বাড়ী বন্ধক দিলে? বাড়ী বন্ধক দিবার তুমি কে? কিসের বাবা তুমি? তোমার মেয়েমানুষের গায়ে অত গহনা, ভয়ে তাহার একখানিতেও তুমি হস্তার্পণ করিতে পারিলে না। আমি বালক, কেবল আমাকে বঞ্চনা করিবার জন্য তুমি এই বাঘিনীকে বিবাহ করিয়াছ। গণ্ডা গণ্ডা ছেলে হইতেছে। পাছে আমি দাবিদার হই, সেই ভয়ে বাড়ীখানা আগে ভাগে বন্ধক দিয়াছ! গণ্ডা গণ্ডা ছেলে একটাও রাখিব না! সব গুলাকে গলা টিপিয়া মারিব, কেন তুমি বিয়ে করিলে? কেন তুমি বাড়ী বন্ধক দিলে? কেন তোমার মেয়েমানুষ পরের সঙ্গে মদ খায়! ছি বাবা! ছি ছি! ধিক্ তোমাকে! বাবা কি এই রকম? ছি বাবা! তোমাকে বাবা বলিতে নাই; আর আমি তোমাকে বাবা বলিব না; কি বলিয়া ডাকিব, তোমার মেয়েমানুষ মদ খাইয়া শিখাইয়া দিবে। মেয়েমানুষ কেন বলি,—আমি বলি না,—

একটা মেয়েমানুষ রাখা ভাল, তুমিও আনরপুর হইতে এই মেয়েমানুষ আনিয়াছ, মেয়েমানুষ লইয়া থাক, আমি বাহির হইলাম; না হয় মেয়েমানুষ লইয়া তুমি বাহির হও, আমি এই বন্ধকী বাড়ীতে থাকি। যেমন করিয়া পারি, মহাজনের হাতে পায়ে ধরিয়া, এ বাড়ী আমি উদ্ধার করিব, তোমার নূতন ছেলেদের গলা টিপিয়া মারিব! যাও, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম! বাবা তুমি নও! আর একদিন—যদি কোন দিন মোনার মাকে কাটিয়া ফেলিতে পারি, তবে আর একদিন তোমাকে বাবা বলিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিব। প্রতিজ্ঞা যদি ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে তোমার মত গাধাকে বাবা বলা আমার এই পর্য্যন্ত শেষ। হয় তুমি যাও, সব যাও; না হয় তোমরা থাক, আমি যাই। দেখ বাবা—এখনও বলি বাবা। দেখ বাবা! তোমার মুখ দেখিতে নাই। নূতন বিবাহের পর হইতে এতদিন আমি তোমাকে বাবা বলিয়াছি,—ধিক্ আমাকে! বড়ই পাপ করিয়াছি, প্রায়শ্চিত্ত করিব! আমার মা নাই, স্বচ্ছন্দে খুঁজিয়া লইব, আর একটি নূতন বাবা! কেন না, সংসারে একটা বাবা থাকা ভাল। ভাল বাবা চাই। তোমার মত বাবা আমি চাই না! যাও, চলিয়া চাও! সহজে যদি না যাও, ঘুসি মারিয়া বাহির করিব।"

একটু বাবাগিরী জানাইয়া, একটু পুরুষত্ব দেখাইয়া, এই কাহিনীর বাবাটী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "কই? কই? ঘুসি কই? মারো দেখি ঘুসি?"

পাকানোই ছিল, তারাপদ ধাঁ করিয়া বাবার নাকে এক ঘুঁসি মারিল, বাবা ঘুরিয়া পড়িলেন, নাক দিয়া হু হু করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে কাদম্বিনীর দিকে চাহিয়া হাত নাড়িয়া তারাপদ বলিল, "মোনার মা! দেখ্, তোর দফা রফা হয়ে গেল! তুই রাঁড় হলি!"

মোনার মা রাঁড় হইল না। বাড়ীখানা ছাড়িতেও চাহিল না। মোনার মার দুই গালে দুই ঠোনা মারিয়া, ছেলেগুলাকে এক এক লাথি মারিয়া, হাসিতে হাসিতে, বকিতে বকিতে তারাপদ বাহির হইয়া গেল। বাবা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। ঘরের ভিতর ক্রন্দনের রোল উঠিল। পাঠক মহাশয়েরা দেখিলেন, এক রকম ছিল পূর্ব্বের বাবা, আর একরম হইল কাদম্বিনীর কর্ত্তা বাবা।

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শকুন্তলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

স্বর শুনিয়া রাজা মনে করিলেন, "এই বৃক্ষবাটিকায় আলাপের ন্যায় কি শুনিলাম না ?" সেই স্বর এত মধুর যে, তাহা মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত কি পক্ষি-কূজিত, রাজা তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কৌতূহলী হইয়া যেদিক হইতে শব্দ আসিয়াছিল, সেই দিকেই চলিলেন।

কিয়দ্দূর গিয়া রাজা যাহা দেখিলেন, তাহা হইতে আর চক্ষু তুলিতে পারিলেন না। দেখিলেন, তিনটি তাপস-বালা। তিনটিই প্রায় সম-বয়স্কা—তিনটিই নবযুবতী। আহা মরি মরি কি রূপ! দেহে যেন ধরে না। কি সৌকুমার্য্য! যৌবনে যেন ঢল ঢল করিতেছে! হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন পুষ্পরাশি থরে থরে সাজান রহিয়াছে। তরু-আলবালে জল-সেচন-কার্য্য ব্যাপৃতা তিনটি রমণীকে দেখিলে মনে হয় যেন, বসন্তানিলচালিতা পল্লবিনী লতা। রাজা অতৃপ্ত লোচনে দেখিতে লাগিলেন।

তাঁহার ঘরে সুন্দরী যুবতীর অভাব নাই; কিন্তু ইহাদের কাছে, তাহাদের রূপ লাগে কোথা ? ইহাদের দেখিয়াই তিনি যেন তাঁহার মহিষী-গণকে একে একে স্মরণ করিয়া তুলনায় সমালোচনা করিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "দেখিলাম আজ উদ্যানলতা বনলতার নিকট পরাজিতা ?"

এদিকে রমণীগণ ক্রমশঃ সেই দিকে আসিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে একজন অপর একজনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ ভাই শকুন্তলা, মহর্ষি তোমার চেয়েও ঐ নবমল্লিকা গাছটিকে ভালবাসেন, এই দেখ না কেন, তোমাকে ইহারি সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন।"

এই "ভাই শকুন্তলা" সম্বোধনেই রাজা বুঝিলেন যে, ইনিই তপস্বী-কথিতা কণ্বদুহিতা শকুন্তলা। কালিদাস অতি সুন্দর উপায়ে রাজাকে শকুন্তলা চিনাইয়া দিলেন। তাঁহার এই নাট্য-চাতুর্য্য (Dramatic Art) সেক্স-পিয়ারের অ্যাণ্টনীর বক্তৃতায় অথবা আয়াগোর বচন-চাতুর্য্যে প্রযুক্ত লিপি-কৌশল অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

রাজা কন্যার অবিবেচনা দেখিয়া মনে মনে তাঁহার নিন্দা করিয়া বলি-লেন, "মহর্ষি দেখিতেছি নীলোৎপল পত্রদ্বারা শমীবৃক্ষ ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। স্ত্রীলোকের কোমলতার যদি কিছু উপমা থাকে, তবে তাহা পদ্মের

পাতা। মহাকবি কালিদাস ঐ উপমা প্রয়োগ করিয়া কবিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। পদ্মপাতাটি যখন জলের উপর ভাসিয়া থাকে, তখন তাহাকে দেখিতে বড়ই ভারসহ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু জল হইতে তুলিবামাত্র উহা ঢলিয়া পড়ে। কোমলা স্ত্রীও ঠিক্ সেইরূপ; তাহার সুগোল, সুঠাম দেহ-যষ্টি-খানি দেখিলে মনে হয় যেন, কত শ্রমসহিষ্ণু, কিন্তু সামান্যমাত্র শ্রম করিলে তাহার দেহ যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে।"

তাহাদের সামান্য ক্ষণ দেখিয়া রাজার তৃপ্তি হইল না। দর্শনেচ্ছা আরও বলবতী হইয়া উঠিল। তাহাদিগকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য এবং তাহাদের বিশ্রাম্ভালাপ শুনিবার জন্য তিনি এক সন্নিহিত বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। আর সহসা তাহাদের সম্মুখে যাওয়াও উচিত নহে,—তাহাদের কার্য্যে ব্যাঘাত হইবে। সাত পাঁচ ভাবিয়া তিনি লুকাইলেন।

কাজটা বড় ভাল হইল না। যিনি সসাগরা পৃথিবীর রাজা, কুলকামিনীর সম্ভ্রম রক্ষা করা যাঁহার কর্ত্তব্য, তাঁহার পক্ষে এরূপে লুকাইয়া যুবতীগণের গতিবিধি লক্ষ্য করাটা ভাল দেখাইবে কি? তাহারা হয় ত কত মনের কথা বলিবে, কোনও পুরুষ নিকটে নাই দেখিয়া পরিহিত বস্ত্রাদি একটু আধটু "অসামাল" করিয়া দিবে? সে গুলা শুনা বা দেখা কি কোন ভদ্রলোকের উচিত? বিশেষ তিনি হিন্দু। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র মনুসংহিতায় উক্ত আছে যে, যদি কোনও পুরুষ কোনও স্ত্রীলোকের অজ্ঞাতসারে তাহার নগ্ন বা প্রায়-নগ্ন দেহে দৃষ্টিপাত করে, তবে তাহার অনন্ত নরক বাস হয়। ঋষিবাক্য প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল দুষ্যন্তের কি এরূপ করা উচিত? আমরা বলি, কোনমতে উচিত নহে। রাজা হয়ত আমাদের এই অনুযোগ শুনিলে বলিবেন যে, "আমি সব বুঝি, সব জানি; কিন্তু তবু পারি না। সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিবার লোভটুকু আমি ত্যাগ করিতে পারি না। ঋষিবাক্যে শ্রদ্ধা আছে—বলিয়া এক কথায় মৃগয়ার লোভ সামলাইতে পারি, অধর্ম্মে ভয় আছে বলিয়া—পত্নী বলিয়া উক্ত হইলেও অসামান্যা সুন্দরীকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু ঐটি পারি না, দেখিবার লোভটুকু সামলাইতে পারি না।

বলিতে পারি না, এ লোভ সামলাইতে পারেন, পৃথিবীতে এমন বীর কয়জন আছেন। রাজার এইরূপ প্রকৃতি দিয়া কবি আমাদিগকে এক

হইলেই, মানুষ অপদার্থ হয় না—অসচ্চরিত্রতার ইহা একমাত্র নিদর্শন নহে। পক্ষান্তরে কেবল ইহা হইতে বিরত হইলেই সচ্চরিত্র হওয়া যায় না।

রাজা লুকাইয়া দেখিতে শুনিতে লাগিলেন। আমরাও রাজার পাশে দাঁড়াইয়া সাধু সঙ্গের মহিমা বুঝিতে পারিলাম, আমাদের ভাগ্যেও দেখা শুনা ঘটিল।

যে সখীটি শকুন্তলাকে নবমল্লিকার গাছ উপলক্ষ করিয়া কন্যার ভালবাসার তুলনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম অনসূয়া। শকুন্তলা তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা বল্কলটা আমার বুকে বড় আঁট করিয়া পরাইয়া দিয়াছে, একটু আল্গা করিয়া দাও ত।" সখী দুইটির কাহার কি নাম, রাজা জানিতে পারিলেন।

এতক্ষণ রাজার খেয়াল হয় নাই যে, ইহাঁরা বল্কল পরিয়া আছেন; ইা করিয়া তাহাদের রূপই দেখিতেছিলেন, পরিহিত বস্ত্রের প্রতি অত লক্ষ্য করেন নাই; এতক্ষণে "হুঁস" হইল। শকুন্তলার কথা শুনিয়াই মনে করিলেন; "এ যে বল্কল দেখিতেছি, বল্কলের পরিবর্ত্তে ইহাঁকে বস্ত্রালঙ্কার পরাইলে আরও মানায়! পরক্ষণেই আবার ভাবিলেন না, 'যা'র যা'—তা'র তা'—ইহাঁকে বল্কলেই বেশ মানাইতেছে, গহনা গাঁটি পরিলে কুৎসিৎ দেখাইত।* সুন্দরী স্ত্রীলোক হইলেই যে তাহাকে বস্ত্রালঙ্কার পরিতে হয়, স্বীয় মহিষীদিগকে দেখিয়া রাজার এতদিন সেই ধারণাই ছিল—আজ তাহা ঘুচিল।

অনসূয়া বল্কল শিথিল করিতে আসিল; প্রিয়ংবদা বল্কল অত কষা হওয়ার কারণ লক্ষ্য করিয়া একটু ঠাট্টা করিল। প্রিয়ংবদা উহাদের সকলের অপেক্ষা একটু বয়োজ্যেষ্ঠা এবং পরিহাস-রসিকা। সে কথায় কথায় শকুন্তলাকে এমন ক্ষেপাইত যে. শকুন্তলা মনে মনে তাহাকে প্রশংসা করিয়া মুখে ক্রোধ প্রকাশ করিতেন; কখনও বা তাহারই কথার দ্বারা তাহাকে পরিহাস করিতেন। আমরা সে মনোহর কলহ অল্পে অল্পে দেখিতে পাইব।

শকুন্তলা নবমল্লিকা, গাছটির নাম দিয়াছেন 'বনজ্যোৎস্না'। এই নাম করণেও কবির যথেষ্ট কবিত্ব আছে। জানালার ভিতর দিয়া অন্ধকার ঘরে যখন জ্যোৎস্না প্রবেশ করে, তখন জ্যোৎস্না রেখাটিকে বড়ই সমুজ্জ্বল দেখায়। আর নবমল্লিকা গাছটিও কালো যেন অন্ধকার ঘর। তাহার

ভিতর একটি সাদাফুল ফুটিলে ফুলটি ফুট ফুট করে—সমস্ত লতাটিকে যেন আলো করিয়া থাকে।

শকুন্তলা এইবার নবমল্লিকা লতার নিকট গিয়া দাঁড়াইলে প্রিয়ংবদা অনসূয়াকে বলিলেন, "অনসূয়া, শকুন্তলা বনজ্যোৎস্নাকে কেন এত ভাল বাসে জান?" সরলা অনসূয়া বলিল, "না—কেন?" প্রিয়ংবদা "বনজ্যোৎস্না কেমন সহকারকে বর পাইয়াছে; শকুন্তলারও ঐরূপ একটি উপযুক্ত বর পাইতে ইচ্ছা করে কিনা, তাই।" শকুন্তলা তাহা শুনিয়া আপনার সুন্দর মুখখানি নাড়িয়া বলিলেন, "তার চেয়ে স্পষ্ট বল না কেন, তাই, তোমার নিজের বরের দরকার হইয়াছে, অত "ফেরাফিরি তাঁড়াতাঁড়িতে" কায কি? প্রিয়ংবদা কথাটা গায়ে মাখিলেন না।

রাজা এতক্ষণ শকুন্তলাকে দেখিতেছিলেন—দেখিয়া মজিতেছিলেন, এখন তাঁহাকে পাইতে বাসনা হইল। তাঁহার গৃহে যে বহুমহিষী আছেন, তাঁহারা সকলে যে সপত্নীসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ব্যথিত হইবেন, সে কথাটা তিনি একবারও ভাবিলেন না। শকুন্তলার রূপ, তাঁহার চলন বলনের ভঙ্গী, তাঁহার সারল্য দেখিয়া একবারে তাঁহাকে পাইয়া বসিতে চাহিলেন। কথাই আছে, "যার ছেলে যত পায়, তার ছেলে তত চায়।"

আমাদের মনে হয়, রাজা তাঁহার মহিষীগণের মধ্যে একজনকেও পূর্ব্ব-রাগের বশবর্ত্তী হইয়া বিবাহ করেন নাই। স্বয়ংবরের নিমন্ত্রণ পাইয়া কন্যালয়ে যাইতেন এবং কন্যা তাঁহার রূপ দেখিয়া এবং বেত্রবতীর নিকট তাঁহার গুণ ও পদমর্য্যাদা শ্রবণ করিয়া তাঁহার গলে বরমাল্য দিতেন; যথারীতি বিবাহান্তে কন্যা রাজান্তঃপুরে গিয়া মহিষী সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেন। এখন, শকুন্তলায় তাঁহার চিরাগত প্রথার বিরুদ্ধাচরণ হইল, বিবাহের পূর্ব্বেই তিনি শকুন্তলাকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছেন,—নূতনত্ব জন্মিয়াছে, সুতরাং তাঁহাকে না পাইয়া থাকিতে পারেন না। পুরাতনে বিরক্ত হইয়া লঙ্কার দশানন একদিন দুঃখিতচিত্তে বলিয়াছিলেন, "নাহি রমণী ভূতলে, প্রেম আশে সাধি যারে, দেবকন্যা ইঙ্গিতে আমায় ভজে।" যাহারা চিরকাল অযাচিত প্রেম লাভ করিয়াছে, যাহাদের পদে সুন্দরীকুল বিক্রীত, তাহারা মাঝে মাঝে মুখ বদলাইবার আকাঙ্ক্ষায় সাধাসাধি, কাঁদাকাঁদি, মান, মান-ভঞ্জনের আস্বাদ পাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকে। যে কারণেই হউক, রাজা শকুন্তলাকে পাইতে বাসনা করিলেন।

শ্রীদেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

উমা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পুস্তক পাঠ করিয়া প্রাণের উচ্ছ্বাসে অনেক কথা বলিয়াছি, তবু কিছুই বলা হইল না। সমাজের প্রত্যেক গৃহে অধিকারী ভেদে কর্ত্তব্য; ধর্ম্ম, আচার শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতা যে কতদূর তাহার কিছুই বলা হইল না। পাঁচকড়ি বাবু তাঁহার পুস্তকে তাহা সুবিধা মত দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই! মোট কথা, বিনোদিনীর জন্য দায়ী উমার পিতা এবং কতক পরিমাণে উমার শাশুড়ী! যোগেশ্বরেরও কোন দোষ নাই গ্রন্থকার বলিতেছেন,—তাহারও কারণ বিনোদিনীর মতই! ব্রাহ্মণোচিত শিক্ষা তাহার হয় নাই। বিনোদিনী যেমন সাদা কাপড় পরিয়াই হবিষ্যাশিনী হইয়াই বিধবা ব্রহ্মচারিণী, যোগেশ্বরও তেমনি গলায় পৈতা ঝুলাইয়াই ব্রাহ্মণ! যোগেশ্বর উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছেন বটে, সে কেবল পুঁথিগত, তাহা কেবল পাশ করিবার ও বড় চাকরীর আশায়, জীবনে যে তাহা খাটাইতে হইবে, তাহা একদিনও তিনি ভাবেন নাই বা তাহার চেষ্টা করেন নাই। মাতাও বাল্যকাল হইতে সে শিক্ষা কিছুই দেন নাই, সুতরাং সংযম শিক্ষা কিরূপে হইবে? কিন্তু তথাপি যোগেশ্বরের উপর আমার রাগ যায় না, তার উপর আমার ক্ষমাবৃত্তি তেমন চালনা করিতে পারি না। বিনোদিনীর চোকের জল দেখিলে আমারও সহানুভূতির অশ্রু আসে, কিন্তু যোগেশ্বরের চোকের জলে আমার ততটা হয় না, কারণ সে কেবল রূপের লালসায়, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় উমার ন্যায় সতীকে অবহেলা করিয়াছে। বাস্তবিক সে যদি উমাকে অবহেলা না করিয়া, হতাদর না করিয়া, বিনোদের প্রতি আসক্ত হইত, তাহা হইলে হয়ত আমার এত রাগ হইত না; উমাও এত কষ্ট পাইত না; সে যদি উমাকে নিজ মনের ভাব খুলিয়া বলিত, তবে উমা যেরূপ স্বামী প্রেমবতী; তাহাতে সে হয়ত স্বয়ং স্বামীর প্রবৃত্তির সন্তোষ বিধান করিতে যাইত এবং তখন হয় ত ভগবদনুগ্রহে বিল্বমঙ্গলের মত যোগেশ্বরের চৈতন্য হইতে পারিত, সব দিক রক্ষা পাইত, কিন্তু পাপিষ্ঠ তাহা করে নাই—সে অবজ্ঞা করিয়া সতীর মনে কষ্ট দিয়াছে, তাহাকে লুকাইয়া তাহার বস্তু অন্যকে দিয়াছে, তবুও সতী একদিনের জন্যও স্বামী

প্রেম হইতে চ্যুতা হয় নাই, স্বামীর প্রতি ভক্তি হারায় নাই! বিনোদিনী পুরুষান্তরে কখনও নিজ দেহ অর্পণ করে নাই, সে যোগেশ্বরে রীতিমত আত্ম সমর্পণ করিয়াছিল, অকৃত্রিম ভালবাসার সহিত স্বামীভাবে যোগেশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিল। এইখানে বিনোদিনী কুন্দ অপেক্ষা অনেক কম দোষী, কারণ কুন্দ স্বামীসঙ্গতা হইয়াও পুরুষান্তরে প্রেমবতী হইয়াছিল। অন্যান্য বিষয়ে উভয়েই প্রায় তুল্য বলিয়া বোধ হয়। তবে বিনোদিনীর একেবারে যে দোষ নাই, তাহা নহে, তাহার এরূপ করাও যে মহাপাপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। যোগেশ্বরকে সে অন্যের স্বামী জানিয়া সেই রমণীর বিনা আদেশে ও ধর্ম্মসঙ্গত কোন বন্ধনে বদ্ধ না হইয়া তাহার এরূপ করা কর্ত্তব্য হয় নাই, সে কথা তাহার মৃত্যুকালে তাহার মাতুল তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তার পর সেও তাহা বুঝিয়াছিল এবং মৃত্যুকালের প্রলাপের সময় সে যোগেশ্বরকে স্বামী ভাবিতে ভাবিতে নিজ স্বামীর ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকেই তখন ক্ষমা করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল এবং তখন তাঁহারই প্রশংসা ও যোগেশ্বরের নিন্দা করিয়াছিল।

কিন্তু যোগেশ্বরের ভালবাসা অকৃত্রিম নহে, সে কেবল একটা লালসার তাড়না মাত্র, ইন্দ্রিয়ের নিয়োগ মাত্র; তাহাতে নরকের অগ্নি দপ্ দপ্ জ্বলিতেছে কিন্তু স্বর্গের অমৃতের স্নিগ্ধতা ও পবিত্রতা একটুও নাই। যোগেশ্বরের কেবল বিনোদের গর্ভ লক্ষণ দর্শনে এবং মায়ের বাটী পরিত্যাগে তথা উমার আগমনে চেতনা হইয়াছে, এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন; এরূপ চেতনা অনেকেরই হইতে পারে! তার পর উমার চেষ্টায় যখন যোগেশ্বর বিনোদের সহিত দেখা করেন, তখনকার কথাবার্ত্তাতেই তাঁহার মনের ভাবের সঙ্কীর্ণতা ও নীচতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং উমার মধুর তিরস্কারেও তাহা বুঝিতে পারা যায়। মোট কথা, যোগেশ্বরের প্রতি আমার একটুও সহানুভূতি নাই। কিন্তু একথাও স্বীকার করিতে লজ্জা করি না যে, আমরা নব্যশিক্ষিত, অনেকেই এক এক যোগেশ্বর; আমরা মিল, কোম্‌ত্, মাটসিনি, বেদান্ত-দর্শন, গীতা পড়িয়াও প্রায়শঃই সংযম শিখি না, জীবনের উন্নতির পথ দেখি না, কেবল উদ্গীরণ করি এইমাত্র, বিদ্যা প্রকাশ করি এই মাত্র—নতুবা আমরা নীতি বিজ্ঞানের উচ্চ পরীক্ষা দিতে গিয়া জুয়াচুরী অপরাধে তাড়িত হইব কেন? উচ্চ শিক্ষিতের শত শত অসদাচরণে সমাজবক্ষঃ কলঙ্কিত হইবে কেন? তাই বলি, যোগেশ্বর

বর্ত্তমানকালের অসংযত চিত্তবৃত্তি উচ্চ শিক্ষিত যুবকের একখানি অতি স্বাভাবিক চিত্র মাত্র।

এই প্রথম প্রলোভনের কালের অবস্থা তুলনা করিলে আমরা গোবিন্দ লালকে যোগেশ্বর অপেক্ষা খুব উচ্চ স্থান দিতে প্রস্তুত। গোবিন্দলাল "রোহিণী তাহার প্রতি আসক্ত" জানিয়াও কাল ভ্রমরকে ভুলে নাই—স্বামী-কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয় নাই; তাহার নিজ-মন জয় করিবার জন্য সে বিদেশগামী পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তার পর যে সে খারাপ হইল, সে ভ্রমরের ভুল বশতঃ ভ্রমরের প্রতি রাগ করিয়া, অভিমান করিয়া। ভ্রমর যদি উমা হইত, আর যোগেশ্বর যদি গোবিন্দলাল হইত, তাহা হইলে সব দিক রক্ষা পাইত, কিন্তু তাহা হইল না, তাই যোগেশ্বর পড়িল, আর উমা আসিয়া হাত ধরিয়া তুলিল, মরলা মাটি ঝড়িয়া ফেলিয়া নিজ কণ্ঠরত্ন কণ্ঠে পরিধান করিল।

এ বিষয় উমার তুলনা নাই। উমার দেবী চরিত্র এখানেই পরিস্ফুট, ভ্রমরের অপেক্ষা উমার স্থান অতি উচ্চে। ভ্রমরের সন্দেহেই তার সর্ব্বনাশ ঘটিল, অভিমানেই তার সুখের প্রাসাদ ধূলায় মিশাইল; আর উমা স্বামীকে অন্যাসক্তা জানিয়াও তখন শাশুড়ীর পত্র পাইয়াই স্বামীর উদ্ধারের জন্য ছুটিল; স্বামীর এ বিপদে তাঁহার মুক্তিপদ দেখাইতে না পারিলে পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী কিসে? যে ভাল, তাহাকে সকলেই ভাল বাসিতে পারে, যে ভাল বাসে, তাহাকে ভালবাসায় মহত্ব কি? কিন্তু যে ভাল না বাসে, যে মন্দ, ঘৃণিত, তাহাকে যে ভালবাসে, সেই ত দেবহৃদয়ের লোক; উমার সে দেব হৃদয় ছিল? তার উপর তাহার ইহ পরকালের দেবতা স্বামীর এই পাপে তাহার হৃদয় কেমন করিয়া স্থির থাকিবে? তাই সে ছুটিয়া গেল। উমা এত দিনের বিরহে স্বামীর মর্ম্ম স্বামীর প্রেমের গভীরতা, তাহার লৌকিকত্ব বুঝিয়াছে—স্বামীর দেবত্ব তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, স্বামী খেলার জিনিস নহে তাহা সে জানিয়াছে। বিরহই প্রকৃত প্রেমের পরীক্ষা, সে পরীক্ষার ফল সে পাইয়াছে—তাই সে ফল দেবচরণে অর্পণ করিতে সে ছুটিল; স্বামীর এ পতনও যে তাহারই ভুলবশতঃ তাহা শতবার স্বীকার করিয়াছে, দেবতা লইয়া খেলা করা যে ভাল নহে, তাহা সে বুঝিয়াছে! উমা আসিল, নিজ সংসার নিজে বুঝিয়া লইল, নিজ দেব-সেবা নিজে করিতে ব্যাপৃতা হইল। স্বামীর সহিত যখন দেখা হইত, তখন সেই লজ্জালিপ্ত, অবনত মুখ, স্বামীর সহিত সেরূপ প্রফুল্লভাবে সে কথা বলিল, ব্যবহার করিল, তাহাতে বস্তুতঃই আমি

বিস্মিত হইলাম, আমার চক্ষে জল আসিল, দেহে রোমাঞ্চ হইল। যোগেশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বলিলাম, "এ যে দেবতার মত কথা! এমন স্বর্গীয় কথা কোথায় শিখিলে উমা?" আমাদের স্থান সংক্ষিপ্ত, উমার ঐর্ব্ব কথা তুলিয়া দিবার ও ইহা লইয়া উপযুক্ত আলোচনা সম্ভব হইবে না, কিন্তু উমা যেরূপ ভাবে এই পতিত স্বামীকে আদর করিয়াছে, তাঁহার অশ্রু মুছাইয়াছে, স্বীয় হৃদয়ের ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, এরূপ কথা, এরূপ দৃশ্য আমরা বড় বেশী দেখিতে পাই নাই। এ দৃশ্য দেখিলেও পুণ্য হয়, হৃদয় উন্নত হয়, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, পুণ্যের জ্যোতিতে পূত হৃদয়ের সংস্পর্শে মহাপাপও ভস্মীভূত হইতে পারে। হৃদয়ে নির্ম্মলতা আসিতে পারে! সাধ্বী পতিব্রতা নিজগুণে যে পতিতের উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, সংসারে প্রত্যক্ষ করিয়াছি! স্বামী যে দোষ করিয়াছেন, জানিয়া শুনিয়া উমা তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না, তাহা শুনিতে চাহে না। "তাহার স্বামী তাহারই আছে, স্বামীর অন্য কিছু খোঁজে তাহার আবশ্যক কি?" এই তাহার মত—এই তাহার ধারণা! "তাহার কলসী মাটির নহে, তাহার সোণার কলসী, ফুটো হইলেও তাহা আবার নূতন করা যায়, সে ফুটো বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, আর তাহার চিহ্নও থাকে না,"—এই তাহার মত! ধন্য উমা! ধন্য তোমার হৃদয়! ভগবতী সাবিত্রী অরুন্ধতী প্রভৃতি সতীগণ উমার পবিত্র হৃদয়ে এই নিরভিমানের, এই আত্ম নির্ভরের ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাই বিষবৃক্ষে অমৃত ফল ফলিল; নতুবা প্রাকৃত রমণীর ন্যায় উমা এ অবস্থায় অভিমান করিলে, স্বামীকে অবজ্ঞা করিলে অতি বিষময় ফল ফলিত, সংসার উচ্ছন্ন যাইত, যোগেশ্বর নরকের কীট হইয়া পড়িত, আর উমাও শেষে প্রাণ হারাইত, অকালে সংসার-সুখ ফুরাইত। স্বামী সকল অবস্থাতেই পূজ্য, ত্যাজ্য নহেন, তাঁহার পতন হইলে সতী নিজ ধর্ম্মবলে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া নিজ সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন, উমা এই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়াই এ সাধনা করিয়াছিল, এবং ভগবদিচ্ছায় তাহাতে সিদ্ধিলাভও করিতে পারিল।

স্বামী যাহা ভালবাসেন, উমা তাহা ঘৃণা করিতে পারে না; স্বামীর হৃদয় যে হরণ করিয়াছিল, সেই বিনোদিনীকেও উমা স্নেহ করিতে।

পশ্চাৎপদ হয় নাই, সে বাহিরের স্নেহ নহে, পবিত্র স্নেহ; সে বিনোদিনীকে কটু বলে নাই, অবজ্ঞা করে নাই, দেবীর ন্যায় সেই কলঙ্কিতাকে বক্ষে ধারণ করিয়াছে, তাহার অশ্রু মুছাইয়াছে! তার উপর তাহার চিত্তবিনোদনের জন্য স্বয়ং উদ্যোগ করিয়া স্বামীর গৃহে তাহাকে দিয়া আসিয়াছে, স্বামীর আপত্তি এমন করিয়া খণ্ডন করিয়াছে যে, পড়িলে চোকে জল আইসে! আন্তরিক ভাবে প্রফুল্লতার সহিত এই স্বার্থ ত্যাগ করা কতদূর কঠিন, কতদূর মনের বলের পরিচায়ক, তাহা রমণীগণ আমা অপেক্ষা অনেক বেশী বুঝিতে পারেন। বিনোদিনীর গর্ভে স্বামীর ঔরসজাত সন্তান, সেই বিনোদকে উমা দেখিতে পারে? কখনও নহে; সে জন্য সে সমাজ-নির্য্যাতনও সহিতে প্রস্তুত? জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনোদের বিরুদ্ধে বলিতে গেলে, উমা তার মুখ চাপিয়া ধরে, "ছি! সে তোমার মাসী মা!" পরলোকগামিনী বিনোদের অবস্থায় উমার কি কষ্ট! কি শুশ্রূষা! আবার এদিকে স্বামীর প্রতি কি গভীর প্রেম, কি ভালবাসা, কি দৃষ্টি!

এই সব গুণেই উমা রমণীর আদর্শস্থানীয়া, পতিব্রতাগণের মধ্যে আসন পাইবার যোগ্যা; স্বামীতে সে মিশিয়া গিয়াছে, পৃথক অভিমান, দ্বেষ, হিংসার অস্তিত্ব সে হৃদয়ে নাই।

এই জন্যই উমাকে আমাদের এত ভাল লাগিয়াছে। যোগেশ্বর উমার ন্যায় সতীর গুণেই উদ্ধার পাইয়াছেন, একথা বাহুল্য!

যোগেশ্বরের মাতায় গৃহিণীর কার্য্যকুশলতার অভাবে সংসারে কিরূপে পাপ প্রবেশ করে, তাহা সুন্দর পরিস্ফুট! গ্রন্থকার একথা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন, যে তাঁহার গৃহিণীপণার যোগ্যতা থাকিলে এরূপ হইতে পারিত না; আমরাও তাঁহার সে দোষ ভুলিতে পারি না। তিনি খরদৃষ্টি রাখিলে, চারিদিক্ দেখিয়া শুনিয়া কাজ করিলে এরূপ ঘটিত না তাহা নিশ্চয়; তবে তিনি কোন দিন গৃহিণীপণা করেন নাই, ঈশ্বর সে সুযোগ তাঁহাকে দেন নাই, সুতরাং তিনি সে সবে দক্ষা হইতে পারেন নাই; ছেলে কি করিতেছে, তাহা বড় খোঁজ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মানুরাগের প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। পুত্রের দোষ দেখিয়া সে পাপসংসারে তিনি একদণ্ডও থাকেন নাই, পুত্রের সে দোষ গোপনের চেষ্টা করেন নাই, এমন সাধের, আদরের পুত্র ও পৌত্র অনায়াসে ত্যাগ

করিয়া তিনি কাশী চলিয়া গিয়াছেন, এবং পুত্রবধূকেই উপযুক্ত পাত্রী জানিয়া তাহাকে যাইতে পত্র দিয়াছেন। এটা অবশ্য তাঁর প্রশংসার বিষয়; কিন্তু তথাপি তিনি রমণী, তাঁর এসব দিকে একটু সাবধানতা আমরা খুব প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা না পাইয়া দুঃখিত হইয়াছি।

পুস্তকের শেষভাগে যে সব উপদেশগুলি যোগেশ্বরের শ্বশুর ও পিতা যোগেশ্বরকে দিয়াছেন, সেগুলি পাঠকবর্গের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাহাতে অনেক উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মতত্ত্ব এবং দার্শনিক সত্যের আলোচনা আছে।

উমা একাধারে প্রকৃত ও আদর্শ (real and ideal) উপন্যাস; যোগেশ্বর! বিনোদিনী প্রভৃতি প্রকৃত আর মহামহিমাময়ী 'উমা' সকলের মধ্যে আদর্শস্থলে দাঁড়াইয়া স্বীয় চরিত্রপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিতেছে!

তাহার চরিত্রের আদর্শে, মাধুর্য্যে হৃদয় মুগ্ধ হয়, প্রাণ পুলকিত হয়। পাঠক-পাঠিকাগণ পুস্তকখানি কিনিয়া পাঠ করুন, স্বীয় স্বীয় প্রিয়-জনকে পাঠ করিতে দিন এবং ইহা হইতে শিক্ষালাভ করিয়া সমাজ উন্নত করিতে চেষ্টা করুন; ইহা পাঠে অনেক স্বকর্ত্তব্য অবহেলার কথা মনে হইবে, ইহাতে পাপের চিত্র আছে, কিন্তু তাহার সহিত লেখকের হৃদয়ের বেদনা, কাতরতা, অশ্রু এবং উপদেশজড়িত—সে চিত্রে হৃদয় প্রলুব্ধ হয় না, হৃদয় সংস্কৃত হয়—ইহাতে পুণ্যের আদর্শ আছে, তাহাতে হৃদয় ভক্তিভারাবনত হয়; ইহা পাঠে রুচি বিকৃত হইবে না, সংস্কৃত হইবে, মন উন্নত হইবে; রমণীগণ হিন্দুনারীর পতিব্রতার উচ্চ আদর্শ, তাঁহার ক্ষমতা এবং তেজ দেখিতে পাইয়া তাহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টিতা হইবেন।

তাই বলি, এ গ্রন্থ আমাদের রমণীগণের হস্তে দিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, পুরুষের পাঠেরও সম্পূর্ণ উপযোগী; ইহাতে কুরুচি নাই, হৃদয় অবনত-কারী কোন চিত্র নাই! এ পুস্তকের যদি আদর না হয়, এ আদর্শ যদি মনোনীত না হয়, তবে জানিব, হিন্দু-সাহিত্য অধঃপতিত হইয়াছে, হিন্দু-সমাজ প্রকৃত লক্ষ্য হইতে চ্যুত হইয়া বহুদূরে পড়িয়াছে।

আমি প্রার্থনা করি, গৃহে গৃহে উমার ন্যায় পতিব্রতা শোভিতা হইয়া সংসার শান্তিময় করুক, এইরূপে পতিতগণের উদ্ধার সাধন করুক, তাহাদিগকে স্বর্গের পথে লইয়া যাউক।

পাঁচকড়ি বাবু, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বিজ্ঞতায়, বয়সে, সর্ব্ববিষয়েই আমার অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ, তিনি আমার প্রণম্য, বিশেষ ভক্তির পাত্র!

তাঁহাকে আর কি বলিব! এই নবীন গ্রন্থকাররূপে তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার জ্যোতিতে জনগণ মুগ্ধ হউক, যে আদর্শ নিজে একদিন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং যাহার ছায়ায় উমার গৌরবের চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই আদর্শের বিকাশ নিজ পরিবারে দেখিয়া তিনি সুখ ও শান্তি লাভ করুন, আর গৃহে গৃহে এই আদর্শ স্বর্গীয়া দেবীগণের কৃপায় প্রতিফলিত হইয়া সংসারকে স্বর্গের সিংহাসনের দিকে লইয়া যাউক!

পাঁচকড়ি বাবুর লেখনী হইতে যেন সুর তরঙ্গিণীর অনাবিল পূতঃঅমৃতধারা পরিপুষ্ট, এইরূপ উচ্চ আদর্শ আরও প্রসূত হইয়া সাহিত্যের ও সমাজের মহদুপকার সাধন করে!

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের মৃত্যু উপলক্ষে

হৃদয়োচ্ছ্বাস—শোক।

একি একি একি শুনিনু আজ।
নাহি এ জগতে ভায়াল রাজ॥
এই কি বিধির বিহিত বিধি।
হারানু অকালে অমূল্যনিধি॥
এই কি বিধাতা তোমার কাজ।
অকালে কপালে হানিলে বাজ॥
আঁধারি আকাশ আঁধারি পুরী।
রাজেন্দ্র-মাণিক করিলে চুরি।
বঙ্গ-গগনের গৌরব-রবি।
সাহিত্য-কমল-কানন-কবি॥
জগত জুড়িয়া সুযশ যাঁর।
হেরিব না তাঁরে জগতে আর॥
হেরিব না তাঁর সহাস মুখ।
স্মরিতে এ কথা বিদরে বুক॥

শুনিব না তাঁর মধুর ভাষ।
হেরিব না তাঁর মধুর হাস॥
উদার স্বভাব মধুর ভাব।
উদার হৃদয় মধুর হাব॥
মধুর মূরতি সুষমা সার।
হেরিব না কভু জগতে আর॥
ত্যজিয়া তনয়া-তনয়-মায়া।
জয়ন্তী জননী যুবতী জায়া॥
যত্ন-সুলালিত ললিত কায়া।
রাজ-সমাদৃত রাজত্ব-পায়া॥
আত্মীয় স্বজন সুহৃদ্‌গণ।
পরম-আত্মীয় 'বান্ধব-জন'॥
গেলেন চলিয়া সকলি ছাড়ি।
দেহ হ'তে প্রাণ লইয়া কাড়ি॥

অতুল বৈভব অতুল ধন।
রম্য উপবন সুরম্য বন॥
সুরম্য প্রাসাদ সুরম্য বাড়ী।
হাতী ঘোড়া গাড়ী সুরম্য যুড়ী॥
ত্যজিয়া এ সব জানি অসার।
গেলেন চলিয়া ছাড়ি সংসার॥
জননী ধরণী আত্মীয়জন।
শোকে অচেতন ব্যাকুল মন॥
বালক-বালিকা জননী সনে।
আছাড়-কাছাড় খেতেছে ক্ষণে॥
রাজা প্রজা বন্ধু-বান্ধবজন।
না কাঁদে না হেরি এ হেন জন॥
জানি এ জগতে কেহ না রবে।
সকলেরি ক্রমে যাইতে হবে॥
কিন্তু যিনি বহু জনের পতি।
অকারণ তাঁহার কেন এ গতি॥
শত শত লোক জগতে আছে।
যাতনা-অস্থির মরিলে বাঁচে॥
তাদেরে ফেলিয়া হে কাল আজ।
কেমনে এমন করিলে কাজ॥
কিছু কি তোমার না হ'ল দয়া।
কিছু কি হৃদয়ে নাহিক মায়া॥
যাহোক করিলে যাহা ফিরিবে না আর
দীর্ঘজীবী করি রাখ রাজপরিবার॥
সুকবি বিদ্বান বাগ্মী অমাত্য-প্রধান।
জগত জুড়িয়া যাঁর যশের বাখান॥
যাঁর গুণে বিমোহিত সাহিত্য-সংসার
বিদ্যার সাগর যিনি বুদ্ধির আগার॥
যিনি কাজে রাজা, রাজা উপাধিতে রাজা
যাঁর সুশাসনে সুখে আছে যত প্রজা॥
কালীর প্রসাদে যাঁর নাম অনুরূপ।
যাঁর গুণে অনুরক্ত ছিলা মৃত ভূপ॥
শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ যাঁহার আখ্যান।
রায় বাহাদুর যাঁর উপাধি-সম্মান॥
তাঁরে দীর্ঘজীবী করি, রাজপরিবার।
রাখ সুখে সদা এই প্রার্থনা আমার॥

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত।

কবিকেশরী।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের এক পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এই বৎসর শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এষ্টেটে তাঁহার সুসংস্কৃত ব্রাহ্মবিধান মতে পুণ্যাহের কার্য্য প্রথম আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের জমিদারী নদীয়ার অন্তর্গত বিরাহিমপুর পরগণায় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অতি সমারোহের সহিত শুভ পুণ্যাহ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ২৩শে আষাঢ় এই শুভ পুণাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ অনুবাদক এবং "তত্ত্ব-

বোধিনী" পত্রিকার বর্ত্তমান সহকারী সম্পাদক,—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় শুভ পুণ্যাহ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

আচার্য্যের কর্ম্ম সমাধান হইলে বিদ্যারত্ন মহাশয় কিছু অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। পীড়া সহসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলতঃ পীড়ার ভীষণ যন্ত্রণায় বিদ্যারত্ন মহাশয় জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তিম দশা উপস্থিত হইয়াছিল। অন্তিমকাল ব্রাহ্মণের অতি প্রিয় পুঁথি-গুলির কথা স্মরণ হইল। তিনি অতি কষ্টে বলিলেন, "রবি দাদা! আমি তো চলিলাম, আমার সকলই তোমরা জান। তবে আমার একটী প্রার্থনা এই যে, আমার কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি ও পুস্তক আছে; সেইগুলি যাহাতে আমার ছাত্র ও পুত্রপ্রতিমের হস্তগত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিও।"

এই কথা বলিতে বলিতে বিদ্যারত্ন মহাশয় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। রবীন্দ্রনাথ ভাল ডাক্তার-বৈদ্যহীন দেশে তাঁহাকে লইয়া বিষম বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণের জন্য তাঁহার কিছু অধৈর্য্য দেখা গেল। নিজের প্রাণাধিক পুত্রের কি পরিবারস্থ অন্য কাহারো ব্যারাম হইলে, তিনি বিচলিত হয়েন না। সে সময় তাঁহার ধীর ও শান্ত প্রকৃতি অতুলনীয়। কিন্তু অপর কোন আশ্রিত ব্যক্তির পীড়া হইলে তাহার অস্থিরতা লক্ষণ প্রকাশ পায়। উদ্যম ও অধ্যবসায় রবীন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তিনি সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া আহার্য্য থাকিয়া মনে প্রাণে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সেবাশুশ্রূষা ও চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। এবং ভাল ডাক্তার আনিবার জন্য কুমার-খালিতে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসাগুণে বিদ্যারত্নের ক্রমশঃ রোগের উপশম হইতে লাগিল। শেষে তিনি রোগমুক্ত হইলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন, "রবি দাদার অসামান্য গুণপণা সন্দর্শন করিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। তিনি চাকর-মুনিব-সম্পর্ক ভুলিয়া আমার যেরূপ সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। অধিক কি, রবিদাদা সেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম না করিলে, বৃদ্ধের হাড় কয়খানা পদ্মাতেই রাখিয়া আসিতে হইত। রবিদাদা আমাকে যমের দক্ষিণ দ্বার হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন।" রবীন্দ্রনাথের এই মহত্ত্ব তাঁহার ন্যায় বড় লোকের পক্ষে অসাধারণ, আমরা দেখিয়াছি, তিনি সামান্য ভৃত্যটীরও যে কোন পীড়া হউক না কেন, স্বয়ং তাহার চিকিৎসা সেবা শুশ্রূষার রীতিমত বন্দোবস্ত

করিয়া থাকেন। বত দিন না রোগী সুস্থ ও কার্য্যক্ষম হন, তত দিন পর্য্যন্ত তাহার চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষাদির ত্রুটী লক্ষিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ যে সকল অলোক সাধারণ সদ্গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে এ মহত্ত্ব তাঁহাতেই সম্ভবে। প্রতি পাদবিক্ষেপে তাঁহার অনন্যসাধারণ মহত্ত্ব যেন আপনি বিকাশিত হয়।

লরেন্সের জন্মোৎসব—লরেন্সের নাম শুনিয়া পাঠকগণ চমকিত হইবেন না। ইনি চন্দ্রশেখরের Lowrence Foster বা শৈবলিনী ওরফে ধর্ম্মের প্রণয়ভিখারী ফষ্টার নহেন—অথবা রবীন্দ্রনাথের স্বকপোলকল্পিত জুওলাজিক্যাল গার্ডেনের উপযুক্ত কোন প্রকার কিম্ভূত-কিমাকার জীব নহেন। ইনি রবীন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক। ইনি এখনো সশরীরে বর্ত্তমান। বয়স কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ পঞ্চাশৎ বর্ষ। সাহেবপুঙ্গব বড় সরল,—কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং মিষ্টভাষী। সাহেবের কোন কোন দোষ থাকিলেও তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার গুণে রবীন্দ্রনাথ তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করেন; অধিকন্তু তাহার সকল আব্দার রক্ষা করিয়া থাকেন। এই বৎসর ২৯শে শনিবার সাহেবের জন্মোৎসব পর্ব্ব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। সাহেব রবীন্দ্রনাথের নিকট আব্দার জ্ঞাপন করিলেন যে, মিঃ ঠাকুর, আজ আমার জন্ম দিন; আজ আমাকে ছুটী দিতে হইবে। আমার পিতা মাতা থাকিলে আমার জন্মোৎসব করিত। সাহেবের আব্দার হৃদয়বানের হৃদয়ে বড় লাগিয়াছিল। তিনি বিশেষ আয়োজন করিয়া সাহেবের জন্মোৎসব পর্ব্ব সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্থানীয় স্কুলের ছাত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। শিলাইদহ বাস ভবনের সম্মুখের ময়দান, বালকদিগের খেলিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। সাহেব বালকদিগকে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া তাহাদের দেশের নানাপ্রকার খেলা দেখাইলেন, Huddle Race, Long run, Bong jump, High jump. প্রভৃতি নানাপ্রকার খেলা হইয়াছিল। এই সকল ক্রীড়াতে যাহারা ১ম, ২য় ও ৩য় হইয়াছিল—সেই সকল বালকদিগকে রবীন্দ্রনাথ নানাপ্রকার পুস্তক, দোয়াত, ছুরী, ছবির বহি ইত্যাদি পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এবং পরিশেষে সকল বালকদিগকে প্রচুর পরিমাণে সন্দেশ ভোজন করাইয়া সম্যক্ প্রকারে বালকদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

বাঙ্গালা ভাষার লেখক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দেব-দ্বিজে ভক্তির ন্যায়, ইঁহাদের গুরুভক্তিও অচলা। গুরুবল,—ইঁহাদের পরম বল। এই গুরুভক্তি-বলেই ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ—অতি মলিন অবস্থা হইতে বিপুল বিত্তের অধিকারী হইয়াছিলেন। গুরুদত্ত অতি সামান্য টাকা অবলম্বন করিয়া,—ইঁহারা ভক্তি, বিশ্বাস ও বুদ্ধিবলে জমিদারী অবধি করিয়া যান। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত শক্তিপুর পোষ্টের অধীন মণিকাহারের "ঠাকুর"-বংশ আমাদের গুরুবংশ। মদীয় গুরুদেবের নাম শ্রীল শ্রীযুক্ত কংসারিলাল ঠাকুর। পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, গুরুদেবদিগের কৃপাদৃষ্টি ও সদয় ব্যবহার,—আমাদের প্রতি আজিও সমভাবেই আছে। আমাদের স্বর্গীয় পিতামহ ও প্রপিতামহ,—নিত্যানন্দ ও বৈষ্ণবচরণ,—পূর্ব্বপুরুষগণের সেই জমিদারীর আয় আরও বাড়াইয়াছিলেন। বিশেষ স্বর্গীয় ঠাকুরদাদা মহাশয়ের ধর্ম্মবলের সহিত বুদ্ধিবল অসাধারণ ছিল। পিতামহও এ বিষয়ে কম ছিলেন না; তবে পুত্রের নিকট তাঁহাকে হারি মানিতে হইত বটে। ইঁহাদেরও ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে। প্রতিবাসীগণ অভুক্ত থাকিতে ইঁহারা জলগ্রহণও করিতেন না।

মদীয় প্রপিতামহের এক সহোদর ছিলেন; তাঁহার নাম গোরাচাঁদ রক্ষিত। তিনি আমরণ ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার ঈশ্বরভক্তি অতি আশ্চর্য্যরূপ ছিল। স্বপ্নে একদিন তিনি দর্শন করেন যে, শ্রীবৃন্দাবনের অমুক কুঞ্জে এক রাধিকামূর্ত্তি আছেন,—সেই রাধিকার সহিত আমাদের পৈতৃক রাসধারী ঠাকুরের বিবাহ দিতে হইবে।—ঠাকুর যেন স্বপ্নে তাহাকে এইরূপ প্রত্যাদেশ করেন। ভগদ্ভক্ত গোরাচাঁদ অবিলম্বে বৃন্দাবন-যাত্রা করিলেন, এবং নির্দ্দিষ্ট কুঞ্জে উপস্থিত হইয়া, সেই কুঞ্জের অধিকারী "ব্রজবাসীকে" আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে বহুযত্নে সেই রাধিকামূর্ত্তি দেশে আনিয়া, মহা সমারোহে পৈতৃক দেবতা রাসধারী ঠাকুরের সহিত বিবাহ দিলেন। আজিও আমাদের বাটীতে সেই রাধিকামূর্ত্তি আছেন, এবং আজিও পূর্ব্বপ্রথা অনুসারে তিনিই রাসধারী ঠাকুরের বামে বিরাজ করেন, আর পূর্ব্ব রাধিকা ঠাকুরের

দক্ষিণে শোভা পান। তাই বলিয়াছি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই পরম ধার্ম্মিক ও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন;—দুর্ভাগা আমরা,—তাঁহাদের সেই উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিতে সক্ষম হই নাই।

লোকের পিতৃদায়, মাতৃদায়, কন্যাদায়,—সকল দায়েই আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ মুক্তহস্ত ছিলেন। বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ—সম্বৎসরে শ্রদ্ধা-সহকারে, অন্ততঃ সর্ব্বপ্রকারে পঞ্চাশবার ব্রাহ্মণ-ভোজন ইহাঁরা করাইতেন। ইদানী অবস্থা অতিমলিন হওয়ায়,—দোল-দুর্গোৎসবাদি সকলই বন্ধ হইয়া যাওয়ায়,—মদীয় পিতৃদেব ও জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় একরূপ জীবন্মৃত অবস্থায় ছিলেন।—তাঁহাদের ইহলোকের কর্ম্মভোগ ফুরাইয়াছিল; তাই যথাদিনে তাঁহারা সাধনোচিত পুণ্যলোকে চলিয়া গিয়াছেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত গোকুলনগর, গরাণকাটী, রাণাঘাট, ঘাড়ী প্রভৃতি স্থানে আমাদের মহাল ও চক্ ছিল;—তাহা সকলই এখন পরহস্তগত হইয়াছে। মদীয় পিতামহ মহাশয়,—আমাদের দেশস্থ সমস্ত কায়স্থসমাজ একত্র করিয়া তিনবার "একজাই" করিয়াছিলেন। ৭২ ঘরের মৌলিক কায়স্থ হইলেও, প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রমবলে, অনেক মুখ্য কুলীনের সহিত আমাদের বংশের করণকারণ চলিয়া আসিতেছে। জয়নগরের মিত্র জমিদারগণ আমাদের মাতুলবংশীয়। মদীয় মাতামহের নাম ঈশ্বর পার্ব্বতীচরণ মিত্র। মাতুল মহাশয়দ্বয়ের নাম শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র। উপস্থিত আমরা তিন সহোদর; আমাদের অগ্রজের নাম শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত। গ্রন্থকার ও লেখক না হইলেও, অগ্রজ মহাশয় সাহিত্যামোদী ও কাব্যানুরাগী; সদাশয়, সচ্চরিত্র ও শান্তস্বভাব। দুর্ভাগ্যবশতঃ, আমাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, উদারচেতা মহেন্দ্রনাথ রক্ষিত ও আমাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর প্রাণাধিক পূর্ণচন্দ্র এবং জাস্তুতো ভাই,—কীর্ত্তিমান্ উপেন্দ্রনাথ রক্ষিত অকালে আমাদিগকে কাঁদাইয়া গিয়াছেন।

এই আমাদের সংক্ষিপ্ত বংশপরিচয়। এই বংশেই শ্রীমান্ বিপিনবিহারীর জন্ম। তিনি অনেকাংশে পৈতৃকগুণ পাইয়াছেন;—সচ্চরিত্র, উন্নতমনা, পরদুঃখকাতর ও পরোপকারী বলিয়া, বিপিনবিহারী, অনেকেরই স্নেহ এবং ভালবাসা পান। বিপিনবিহারীর দুই পুত্র,—শ্রীমান্ বিকাশচন্দ্র ও শ্রীমান্ প্রভাসচন্দ্র। আশীর্ব্বাদ করি, প্রাণাধিক বাবাজীউদ্বয় দীর্ঘজীবী হইয়া, ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব অর্জ্জনপূর্ব্বক, কালে আমাদের বংশোজ্জ্বল করিবেন।

এই জন্মভূমিতে, বিপিনবিহারীর বাঙ্গালা লেখার একরূপ হাতে খড়ি হয়। আমিই তাহাকে বিশেষ উৎসাহ দিয়া, বহুযত্নে বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে নামাইয়াছি। প্রতিভার কি আশ্চর্য্য শক্তি!—জন্মভূমিতে এক প্রবন্ধ লিখিয়াই—বিপিনবিহারী সর্ব্বত্র সুপরিচিত হন। এক বাণভট্ট-রচিত সংস্কৃত কাদম্বরী গ্রন্থোক্ত মহাশ্বেতা চিত্রের অবতারণা করিয়াই,—সুকবি বিপিনবিহারী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। তখন কেহ কেহ আমাকেই সেই অপূর্ব্ব সমালোচনপূর্ণ প্রবন্ধের লেখক স্থির করিয়াছিলেন। সমধিক প্রশংসার বিষয় হইলেও সে প্রশংসার অধিকারী আমি নাহি,—আমার কনিষ্ঠ সহোদর—সুকবি শ্রীমান্ বিপিনবিহারী লিখিয়াছেন অল্প; কিন্তু যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই সারবান্, চিন্তাপূর্ণ ও সাহিত্যের পুষ্টিকারক।

জন্মভূমিতে প্রকাশিত "মহাশ্বেতা", "চিত্রদর্শন", "ছায়া", "প্রেমের পরীক্ষা", "মলিনা", "আক্ষেপ", "সমর্পণ", "বিকাশ", রাজা ও রাণী", "উদ্বোধন" প্রভৃতি বহু গদ্য পদ্য প্রবন্ধ এবং সমালোচনা,—শ্রীমান্ বিপিন-বিহারীর অপূর্ব্ব লিপি-কুশলতার উজ্জ্বল নিদর্শন। তাঁহার লিখন-ভঙ্গিমা, তাঁহার সদ্যুক্তি এবং তাঁহার চিন্তা ও ভাব-সমাবেশ,—অতি অপূর্ব্ব। তাঁহার ভাষা এত মিষ্ট ও কোমল যে, পড়িতে পড়িতে প্রাণ গলিয়া যায়। ফলতঃ এরূপ কবিত্বময়ী ভাষা এবং গভীর চিন্তা ও সুভাবপূর্ণ লিপি-কুশলতা,—বাঙ্গালা সাহিত্যে অতিঅল্পই পরিদৃষ্ট হয়। বিপিনবিহারীর লেখা, যে পড়িয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে। নব্যভারতে প্রকাশিত তাঁহার রচিত, "বর্ষার বিরহগাথা" শীর্ষক,—মেঘ-দূতের সমালোচনা এবং "সঞ্জীবনী" ও "আরতি" শীর্ষক কবিতাদ্বয় ও অনুসন্ধানে "ঘোম্‌টা" নামে প্রবন্ধ,—তাঁহার কবি-প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। এখন, সাহিত্যের বাজারে কেহ কাহাকে মানে না; কেহ কাহাকে সহজে উচ্চাসন দিতে চাহে না; তাই বিপিনবিহারীর তেমন আদর ও সম্মান হয় নাই; কিন্তু উত্তর-কালে যিনি নিরপেক্ষভাবে সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবেন, আশা আছে, এই অপূর্ব্ব মৌলিক প্রতিভা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবেন, এবং সাহিত্যে বিপিনবিহারীর অদ্ভুত শক্তির কথা, মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিবেন।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

9 SEP. 18